৫ম বর্ষ। শ্রাবণ। ৪র্থ সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

:0.

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেছে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

[illegible] মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। | প্রতি সংখ্যার [illegible]।

আর্য্য-দর্পণের নিয়মাবলী।

"আর্য্য-দর্পণ" প্রধানতঃ ধর্ম্ম-ও-নীতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বটে। সময় সময় তাহাতে তদনুসঙ্গিক বিষয়াদিও বিবৃত হইতে পারিবে।

সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের জন্যই আর্য্য-দর্পণের বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা, অগ্রিম দেয়। নমুনার প্রয়োজন হইলে ।৴০ সাড়ে চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইতে হইবে।

প্রতি মাসের প্রথমেই "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়া সেই মাস মধ্যে গ্রাহকগণের সমীপে প্রেরিত হইবে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা সেই সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী নহি।

গ্রাহকগণ পত্রাদি লেখার সময় বা মূল্য প্রেরণের সময় স্বীয় স্বীয় নম্বর লিখিয়া দিবেন। নূতন গ্রাহক 'নূতন" এই কথাটী লিখিয়া দিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন যথাকালে কার্য্যাধ্যক্ষকে না জানাইলে, পত্রিকার অপ্রাপ্তি জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এক পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাক টিকেট পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা আর্য্য-দর্পণের উন্নতি ও স্থিতির অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ১ম বর্ষের ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যার মলাটে বিজ্ঞাপিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী অবশ্য পাঠ করিবেন।

শান্তি-আশ্রমের স্থিতি ও উন্নতি কল্পে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা, কি এককালীন দান— যিনি যাহা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেন, তাহা যতই অল্প হউক না কেন, সাদরে গৃহীত ও আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা স্তম্ভে স্বীকৃত হইবে। "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিবেতন" সম্বন্ধেও এতদ্রূপ।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

কেহ ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রকাশিত হইবেনা। কেন না কাহারও কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে কিম্বা কাহারও দোষ অন্বেষণ করিতে আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন। অনর্থক বাজে বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ করার অত্র পত্রিকায় স্থানাভাব।

ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অত্র পত্রিকায় সমালোচিত হয় না। সমাজের বা গ্রন্থকারের বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে গুণগ্রাহিতা ব্যতীত অন্য বিষয় সমালোচনা বাহুল্য বিবেচনা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে বা মূল্য পাঠাইতে হইলে আমার নামে পাঠাইবেন।

আর্য্য-দর্পণ—কার্য্যালয়।
পোঃ কোকিলামুখ
শান্তি-আশ্রম, (যোরহাট।)

বিনীত—
শ্রীকুমার চিদানন্দ।
কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"।

আর্য্য-দর্পণ-২

আর্য্য-দর্পণের সহৃদয় গ্রাহক বর্গের সমীপে

নিবেদন।

—:0:—

অচিন্ত্যাব্যক্তরূপায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।
সমস্ত জগদাধার মূর্ত্তয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥
সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশায় সর্ব্বমঙ্গল হেতবে।
সর্ব্বাজ্ঞানতমোভেদায় গুরুব্রহ্ম নমাম্যহম্ ॥

শ্রীশ্রীগুরুদেবের মঙ্গলাশীর্ব্বাদে সঞ্জীবিত হইয়া বহুদিন পরে "আর্য্য-দর্পণ" পাঠক বর্গের সন্নিকটে সমুপস্থিত হইতেছে। এই অনিবার্য্য ও অনিচ্ছাকৃত ক্রুটীর জন্য আমরা পাঠক গণের নিকট লজ্জিত। আশা করি আমাদের সহৃদয় পাঠকগণ আমাদের সর্ব্বপ্রকার ক্রুটী মার্জ্জনা করতঃ "আর্য্য-দর্পণ" কে স্নেহ চক্ষে দর্শন করিয়া পূর্ব্বেরমত সগৌরবে ও সমাদরে স্থান দান করিবেন। এখন হইতে "আর্য্য-দর্পণ" পূর্ব্বের ন্যায় দেশ সেবায় ব্রতী থাকিয়া আপনাদের চিত্ত বিনোদন করিতে ঔদাস্য করিবেনা।

শান্তি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংসদেব আর্য্য-দর্পণের ২য় বৎসর শেষ হইলে শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ সরস্বতী মহারাজকে পত্রিকা সম্পাদনের ভারার্পণ করিয়া অন্তরঙ্গ ভক্তগণ সঙ্গে তীর্থ ভ্রমণে বাহির হন, একথা আমাদের পাঠক বর্গের অবিদিত নহে। তাঁহার অনুপস্থিত কালে আমরা ৩য় বর্ষের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা মুদ্রিত করিয়া যথা সময়ে পাঠকগণের নিকট প্রেরণ করি, এবং ৩য় বর্ষের অগ্রিম মূল্য আদায় করি। তৎপরে তিনি তীর্থ ভ্রমনান্তে ঢাকা সহরে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া কুমিল্লা হইতে "শান্তি-আশ্রম" ঢাকা স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি তথায় আশ্রম স্থাপনান্তে যে মহান্ কার্য্যের সূত্র পাত করিলেন, তাহাতে আমরা স্তম্ভিত হইলাম। ঢাকার মহামান্য ম্যাজিষ্ট্রেট বাহাদুরের নিকট হইতে আইনানুসারে "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত করিবার অনুমতি পাইয়াও শ্রীমৎ পরম হংস দেবের উপদিষ্ট প্রচুর অর্থ ও শ্রম-সাধ্যব্রতে দেহ, মন ও বাক্য নিয়োজিত করিতে হইল। আর "আর্য্য-দর্পণের" কার্য্য চালাইতে সক্ষম হইলামনা। আমরা বাধ্য হইয়া গ্রাহকগণকে তাঁহাদিগের পত্রিকার দেয় মূল্য ফেরত দিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু কোন গ্রাহকই (৩।৪ জন ব্যতীত) মূল্য ফেরৎ লইতে স্বীকৃত হইলেন না। উপরন্তু ধর্ম্ম-বিষয়ক-পত্রিকা খানি পরিচালনের জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তৎসময়ে বিষয়ান্তরে আমরা এতই বিব্রত ছিলাম যে, কিছুতেই তাঁহাদিগের অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলামনা।

অতঃপর বিগত ১৩১৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ (ইংরাজি ১২ই ডিসেম্বর) পৃথিবীর একতৃতীয়াংশের অধিপতি আমাদের ভারত সম্রাট্ শ্রীল শ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর ও তদীয় মহিষী শ্রীযুক্তেশ্বরী মেরীমাতার দিল্লীর সিংহাসন অধিরোহনের দিনটী অনাথ প্রজাগণের মধ্যে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্য, শান্তি আশ্রমে "শ্রীগৌরাঙ্গ—অনাথ নিকেতন" স্থাপিত হয়। তাহার উদ্দেশ্য ও কার্য্য-বিবরণ আমাদের পাঠক বর্গকে ক্রমশঃ জানাইব। আমাদিগের ন্যায় গৃহাশ্রমশূন্য ভিখারী সন্ন্যাসিগণের বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়া একমাত্র ভগবৎ কৃপা সাপেক্ষ। এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়া আমরা আর বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করিতে পারিনাই। তাই যথা সময়ে পাঠক বর্গের অনুরোধ রক্ষিত হয় নাই।

যাহা হউক, যাঁহার কৃপায় মূক বাচাল হয়, পঙ্গু গিরি উলঙ্ঘন করে, তাঁহার অনাথ শরণ ও পতিত পাবন শ্রীগৌরাঙ্গ-নামের গুণে ঢাকায় "শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতন" স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তদুপযুক্ত বিস্তৃত-স্থান প্রাপ্ত হইলামনা। তাই আসাম গবর্ণমেণ্ট হইতে ব্রহ্মপুত্রনদের তীরে একশত বিঘা ভূমি বন্দোবস্ত লইয়া ঢাকা হইতে আশ্রম এই স্থানে স্থাপিত করা হইয়াছে। এক্ষণে সুচারুরূপে আশ্রম ও অনাথ সেবার কার্য্য চলিতেছে। তাই শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের পক্ষহইতে পুনঃ "আর্য্য-দর্পণ" পরিচালনে ব্রতী হওয়া গেল। ভগবান্ আমাদের সহায় হউন।

এবার আমরা এরূপ সুবন্দোবস্ত করিতে সক্ষম হইয়াছি যে, প্রতি মাসের প্রথমেই আমরা গ্রাহক সমীপে পত্রিকা প্রেরণ করিতে পারিব। বৈশাখ মাস হইতে আর্য্য-দর্পণের বর্ষ গণনা করায়, ৫ম বর্ষের কার্য্য আরম্ভ হইল। সুতরাং যাঁহারা ১৩১৭ সালের অর্থাৎ ৩য় বৎসরের ১ম ও ২য় সংখ্যা ভিঃ পিঃ তে গ্রহণ করিয়া, গ্রাহক হইয়া ছিলেন, এবং পরে ৩য় সংখ্যা পাইয়াছিলেন, তাঁহারা এই নূতন বর্ষের ৪র্থ অর্থাৎ শ্রাবণ সংখ্যা হইতে পাইবেন। ৩য় বর্ষের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যাই ৫ম বর্ষের বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় সংখ্যা বলিয়া গণ্য হইবে। ৫ম বর্ষের নূতন গ্রাহকগণের পক্ষেও এই নিয়ম। কারণ নাম ও নম্বরের ব্যতিক্রম ব্যতীত প্রবন্ধাদির কোন রূপ ভিন্নতা হইবেনা; যে সকল বিষয় পূর্ব্বে বাহির হইয়া পত্রিকা বন্ধ ছিল, তাহার সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়াই নূতন বর্ষে কার্য্যারম্ভ করা হইল। যাঁহারা নূতন গ্রাহক হইবেন, সুতরাং তাহাদিগকে প্রথম সংখ্যা হইতেই লইতে হইবে। যাঁহারা অগ্রিম মূল্য দিয়া ৩য় বর্ষের গ্রাহক হইয়াছিলেন, ৫ম বর্ষের শ্রাবণ হইতে চৈত্র সংখ্যা পর্য্যন্ত তাঁহারা পত্রিকা পাইবেন।

আগামী ৬ষ্ঠ বর্ষের জন্য ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে টাকা জমা দিতে হইবে।

পাঠকগণ! আমাদিগের সর্ব্বপ্রকার ক্রটী মার্জ্জনা করতঃ "আর্য্য-দর্পণ" কে পূর্ব্বের ন্যায় স্নেহ চক্ষে দেখিবেন, ইহাই সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ। নিশ্চয় জানিবেন-স্মরণ রাখিবেন কোন সময়ে পত্রিকা পরিচালনে অক্ষম হইলেও গ্রাহক গণের টাকা ফেরৎ দিতে আমরা

কুণ্ঠিত হইবনা। শান্তি-আশ্রমের সেবক সম্প্রদায় কর্ত্তৃক এই পত্রিকা পরিচালিত, সুতরাং ইহাতে কাহারও ব্যক্তিগত স্বার্থ নাই। ইহার সমস্ত আয় অনাথ নারায়ণগণের সেবায় ব্যয়িত হইবে। তাই সহৃদয় পাঠক গণের নিকট নিবেদন, এই পত্রিকার চিরজীবন আপনারা'ত গ্রাহক থাকিবেনই, উপরন্তু যথাসাধ্য ইহার প্রচার ও গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না। আমাদের বিজ্ঞাপন বা এজেন্ট নাই, ধর্ম্মপ্রাণ গ্রাহক ও পাঠক গণই, এক মাত্র ভরসা স্থল। তাঁহাদিগের অনুগ্রহেই এপর্য্যন্ত এই পত্রিকা প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। সুতরাং অনাথ ও দরিদ্রগণের সেবায় সাহায্য কল্পে ২৲ টাকা ভিক্ষা স্বরূপ দান করিয়া এই পত্রিকার গ্রাহক হইতে, আশা করি কুণ্ঠিত হইবেননা।

পুরাতন সহৃদয় গ্রাহকগণের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে ৩য় বর্ষের ৩য় সংখ্যা (পৌষ) পান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক এক খানি "কার্ড" লিখিয়া জানাইলে, অগৌণে তাহা প্রেরিত হইবে।

পরিশেষে সর্ব্বসাধারণকে জানাইতেছি যে, এখন হইতে যে কোন কারণে আমাদের নিকট পত্র লিখিবার, টাকা পাঠাইবার, পুস্তকের অর্ডার দিবার কিম্বা পরমারাধ্য শ্রীমৎ পরমহংস দেবের ঠিকানা জানিবার প্রয়োজন হইলে নিম্নলিখিত ঠিকানা ব্যবহার করিবেন। ১৩১৯ সালের পূর্ব্বের সম্পাদিত পত্রিকা ও পুস্তকাদির লিখিত কুমিল্লা বা ঢাকার ঠিকানায় পত্রাদি কিম্বা প্রেরিত টাকার জন্য আমরা দায়ী নহি। নিবেদনেতি:—

বিনীত
সেবক—সম্প্রদায়।
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন।
পোঃ কোকিলামুখ।
শান্তি আশ্রম (যোরহাট)

পুনঃ—আমাদের পরিচিত কুমিল্লা ও অন্যান্য স্থানের অনেক গ্রাহককে আমরা ভিঃ পিঃ তে পত্রিকা প্রেরণ করিতামনা, তাঁহারা হাতে হাতে মূল্য দিতেন। এখন হইতে সকলের নিকটই ভিঃ পিঃ তে মূল্য আদায় করিব। যদি কাহারও আপত্তি থাকে, পত্র দ্বারা জানাইবেন। যাঁহারা ৩য় বর্ষের ১২শ সংখ্যা লইয়া গ্রাহক হইয়াছিলেন অথচ টাকা দেন নাই, সত্বর তাঁহারা টাকা পাঠাইবেন। নতুবা আগামী মাসে আমরা ভিঃ পিঃ তে পাঠাইতে বাধ্য হইব।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতন।

আমাদের ভারত সম্রাট্ শ্রীলশ্রীযুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর ও তদীয় মহিষী শ্রীযুক্তেশ্বরী মেরী মাতার ভারত সিংহাসন অধিরোহণের দিনটী অনাথ প্রজাগণের মধ্যে চিরস্মরণীয় রাখিবার জন্যে ১২ই ডিসেম্বর (১৯১১ খৃঃ) শান্তি-আশ্রমে "শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতন" স্থাপিত হইয়াছে।

যাহাতে এখানে হিন্দু অনাথ বালক বালিকাগণ ও অনাথা বিধবাগণ নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, আর্য্য নর নারীর

আদর্শে শিক্ষালাভ করতঃ জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে পরার্থে আত্মোৎসর্গ শিক্ষালাভ করিতে পারে, তজ্জন্য যথা বিধি যত্ন ও চেষ্টা করা হইবে। এই উদ্দেশ্যে কয়েকটী অনাথ বালক বালিকা ও অনাথা স্ত্রীলোককে আশ্রমে স্থান দান করা হইয়াছে; দরিদ্র ও অনাথ গণকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করার জন্য একটী এলোপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন ও তৎসঙ্গে একজন গবর্ণমেণ্ট ডিপ্লোমা প্রাপ্ত ডাক্তার রাখা হইয়াছে; বলা বাহুল্য, তিনি, ও (ডাক্তার) আশ্রমের সেবক সম্প্রদায়ের অন্যতম একজন। সেবকগণ দুর্ভিক্ষ মহামারী প্রপীড়িত প্রজাগণ ও অনাথ রোগিগণের সেবা শুশ্রুষা করিবে। লোকাভাবে রোগিগণের সেবা শুশ্রূষার ত্রুটী হইলে, সংবাদ পাওয়া মাত্র আশ্রমের সেবকগণ অম্লান বদনে তাহাদের সেবা শুশ্রূষা করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত। আশ্রমে একটী টোল স্থাপন করা হইবে, তাহাতে শিক্ষার্থী দিগকে সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হইবে এবং তজ্জন্য একজন উপযুক্ত পণ্ডিত রাখা হইবে। আশ্রমের সেবক ও সেবিকাগণের সর্ব্ব প্রকার ব্যয় ভার আশ্রম বহন করিবেন। ধর্ম্মকে মুখ্য উদ্দেশ্য করিয়া হিন্দু আদর্শে সকল প্রকার শিক্ষাদান ও শিক্ষা বিস্তার ও নারায়ন জ্ঞানে অনাথ দরিদ্র ও রোগিগণের সেবা শুশ্রূষা করাই এই "শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতন" প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য। যদি কেহ আপন সন্তানগণকে এই আশ্রমে রাখিয়া উপরোক্ত নিয়মে সুশিক্ষিত করিতে ইচ্ছা করেন তাহারও ব্যবস্থা করা হইবে; বলা বাহুল্য, অভিভাবকগণই তাহাদের সমস্ত ব্যয় ভার বহন করিবেন।

গৃহে গৃহে রোগ, শোক, দারিদ্র ও ও অশান্তি বিরাজ করিতেছে; তাই শ্রীশ্রীগুরু দেবের অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়াই পতিত পাবন অনাথ বন্ধু শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ দেবের পবিত্র নামে এই অনাথ নিকেতনের কার্য্যে ব্রতী হওয়া গিয়াছে! আশা করি দেশের মহানুভবগণ এই আরব্ধ সৎকার্য্য সম্পাদনে যত্নবান্ হইবেন। ইহার ব্যয়-ভার ধর্ম্ম প্রাণ সৎকার্য্যের সহায় ও সদনুষ্ঠানের সাহায্যদাতাদিগের কৃপার উপর ন্যস্ত করিলাম। আশা করি সহৃদয় মহোদয় গণের উৎসাহ ও সাহায্যে এই "অনাথ-নিকেতন" ক্রমোন্নতি লাভ করিয়া দেশের ও ধর্ম্মের মহৎ কল্যান সাধন করিবে। যিনি যাহা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেন, নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পাঠাইলে তাহা যতই অল্প হউক না কেন—সাদরে গৃহীত হইবে। নিবেদন ইতি।

শান্তি-আশ্রম
পোঃ কোকিলা মুখ
(যোরহাট)

বিনয়াবনত
দীন স্বরূপানন্দ
ম্যানেজার, "শ্রীগৌরাঙ্গ অনাথ নিকেতন"।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা।	শ্রাবণ।	বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

তীর্থ-ভ্রমণ।

(৩য় সংখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিতেরপর।)

বাদসাহ নন্দিনীর এই প্রকার কঠোর প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আর কেহ বিবাহের জন্য অনুরোধ করিলেন না। সুতরাং তিনি নিরুপদ্রবে প্রিয়তমের শ্রীমূর্ত্তি আরাধনা করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীরঙ্গনাথ জীর অভাবে শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে মহা হাহাকার পড়িয়া গেল। নগর দিন দিন শ্রীহীন হইয়া উঠিল। চারি দিকে নানারূপ অশান্তি উপস্থিত হইল। তখন সকলেই স্থির করিলেন, শ্রীরঙ্গনাথ জীকে এখানে আনিতেই হইবেক; নতুবা এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবার আর কিছুতেই উপায় নাই। তাঁহারা নানা রূপ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া দিল্লী উপস্থিত হইলেন। এবং বাদসাহ দরবারে যাইয়া নিজেদের দুঃখের কথা নিবেদন করিলেন। তাঁহাদের কাতরোক্তি পূর্ণ বিনয় বচনে সম্রাটের করুণা হইল, তিনি তাঁহাদিগকে শ্রীমূর্ত্তি লইয়া যাইবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। আগত ব্রাহ্মণগণ নির্দ্দিষ্ট স্থানে গিয়া দেখিলেন যে, তাঁহাদের বড় যত্নের শ্রীরঙ্গজী তথায় নাই। তাঁহাদের হরিষে বিষাদ হইল। ইতি মধ্যে জনৈক ভৃত্য মুখে সন্ধান পাইয়া তাঁহারা চুপে চুপে সাহাজাদীর নিভৃত কক্ষ হইতে শ্রীরঙ্গনাথজীকে লইয়া প্রস্থান করিলেন। সেই সময় সাহাজাদী শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন সে কক্ষে উপস্থিত ছিলেননা। তাঁহার উপস্থিতিতে শ্রীমূর্ত্তি লইয়া যাইবার কাহারও সাধ্য ছিল না।

বাদসাহ নন্দিনী সুস্থ হইয়া সেই নিভৃত কক্ষে গমন করিয়া দেখিলেন, তাঁহার প্রিয় মূর্ত্তি অপহৃত হইয়াছে। স্বীয় পরিচারিকার নিকট সমস্ত বৃতান্ত অবগত হইয়া তিনি

উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং সহসা মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। অনেক সেবা সুশ্রূসায় চৈতন্য লাভ হইল; কিন্তু তিনি আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরঙ্গজীর উদ্দেশে দিবা রাত্রি রোদন করিতে লাগিলেন। যথা সময়ে এ সংবাদ সম্রাটের কর্ণে পৌছিল। তিনি সত্বরে কন্যার মহলে আসিয়া আদরের কন্যার দুর্দ্দশা স্বচক্ষে দর্শন করিলেন। বাদসাহ কন্যার এতাদৃশী অবস্থা দর্শনে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া নানারূপ প্রবোধ বাক্যে তাঁহাকে আশ্বস্ত করিলেন। পরে অল্প-সংখ্যক সৈন্য ও দুহিতাকে লইয়া শ্রীরঙ্গ-ক্ষেত্রাভিমুখে রওনা হইলেন। শ্রীমূর্ত্তিবাহী ব্রাহ্মণগণ তখনও রঙ্গক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে পারেন নাই। পথি মধ্যে তাঁহারা বাদসাহের আগমন বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া মর্ম্মাহত হইলেন। তাঁহারা শ্রীমূর্ত্তি রক্ষার আর কোন উপায় নাই ভাবিয়া একটী পর্ব্বতের দুর্গম গুহা-মধ্যে বিগ্রহ সহ লুকাইয়া রহিলেন। কিন্তু সম্রাটের নিকট তাহা গোপণ রহিলনা। তিনি সসৈন্যে উক্ত পর্ব্বতের নানা স্থান অনুসন্ধান করিয়াও শ্রীমূর্ত্তির কোন উদ্দেশই পাইলেননা। তখন বাধ্য হইয়া কাতরা কন্যাকে লইয়া পুনরায় দিল্লীতে ফিরিয়া আসিলেন। সম্রাটের ভয়ে শ্রীমূর্ত্তি বাহী ব্রাহ্মণগণ ক্ষুৎ পিপাসায় কাতর হইয়া একে একে তাঁহারা প্রায় সকলেই প্রাণ ত্যাগ করিলেন, তথাপি কেহ পর্ব্বত হইতে বাহির হইলেননা। পরে বাদসাহের দিল্লী প্রত্যাগমন বার্ত্তা অবগত হইয়া অবশিষ্ট মাত্র দুই জন ব্রাহ্মণে লোকজন ডাকাইলেন এবং শ্রীবিগ্রহ মূর্ত্তি লইয়া গিয়া মন্দিরে যথা বিধি প্রতিষ্ঠিত করিলেন। সেই দুই জনের বংশই এক্ষণে সেবার কার্য্য সম্পন্ন করেন।

শ্রীরঙ্গজীর শুভাগমনে দেশের সমস্ত উৎ-পাত দূরীভূত হইল। বাদসাহের নিকট ও যথা সময়ে এই সংবাদ প্রেরিত হইল। তিনি আবার কন্যা সহ শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে আসিয়া মন্দিরের দ্বারে শিবির সন্নিবেশ করিলেন। তথাকার অধিবাসী আর কেহ ভয়ে গৃহের বাহির হইলনা। সন্ধ্যার সময় সম্রাট্-দুহিতা একাকিনী মন্দির মধ্যে প্রবেশ করিলেন; সমস্ত রাত্রি অতি বাহিত হইল আর তিনি বাহির হইলেননা। বাদসাহ বিচলিত হইলেন, সশঙ্কচিত্তে পূজক গণকে ডাকাইয়া মন্দিরে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু তাঁহারা মন্দিরে যাইয়া তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান করিয়া সাহাজাদী কিম্বা অন্য কাহাকেও দেখিতে পাইলেননা। বাদসাহ বিস্মিত ও ব্যথিত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে মন্দিরের প্রধান পূজারী আসিয়া সম্রাট্‌কে বলিলেন; "হে যবনরাজ! আপনার কন্যা সামান্যা মানবী নন, তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণু প্রণয়িণী লক্ষ্মী, মহর্ষি ভৃগুর শাপে আপনার গৃহে জন্ম হইয়াছিল। অদ্য তিনি ব্রহ্ম শাপ হইতে মুক্ত-হইয়া বিষ্ণুলোকে চলিয়া গিয়াছেন। আপনি ধন্য! কন্যার জন্য আর বৃথা শোক করিবেননা।"

পূজকের কথা শুনিয়া বাদসাহের শোক দুঃখ বিদূরীত হইল—অপূর্ব্ব আনন্দে তিনি বিভোর হইলেন। তিনি শ্রীরঙ্গজীর মন্দির দ্বারে অনেক বহু মূল্য দ্রব্য উপঢৌকোন প্রদান করিয়া পরমানন্দে দিল্লী চলিয়া গেলেন। সেই অবধি মুসলমানগণ শ্রীমন্দিরে উপহার

দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। আমরা তথায় একরাত্রি বাস করিয়া পরদিন সমস্ত দর্শন ও অন্যান্য কার্য্য সমাধান্তে বৈকালে চারিটার সময় ফোর্ট ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। তথা হইতে আমরা পঞ্চ তীর্থ দর্শন মানসে প্রত্যেকে ২৸৶ দিয়া চেঙ্গল পুটের টিকেট্ করিলাম।

আমরা রাত্রি ৯½টার সময় ত্রিচিনপল্লী ফোর্ট ষ্টেশন হইতে রওনা হইয়া পরদিন রাত্রি চারি টার সময় চেঙ্গল পুট ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। তৎপর রজনী প্রভাত হইলে প্রাতঃ ক্রিয়াদি সম্পন্ন করিয়া একটাকায় একখানা ঘোড়ার গাড়ী ভাঁড়া করিয়া রওনা হইলাম। ষ্টেশন হইতে পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে ছয় মাইল দূরে পঞ্চতীর্থ অবস্থিত। রাস্তায় যাইতে যাইতে দুই পার্শ্বে নারিকেল গাছে বিস্তর নারিকেল ধরিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। সে দৃশ্য অতীব সুন্দর। বেলা ৯ টার সময় তীর্থে উপনীত হইয়া পাণ্ডা ঠিক করিয়া তাঁহার বাড়ীতে গেলাম। এবং দ্রব্যাদি রাখিয়া স্নানে যাইবার বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন সময় পঞ্চতীর্থের পূজারী আসিয়া পূজার বন্দোবস্ত করিলেন। এখানে পূজা ও ভোগের নিয়ম যথা,—উত্তম, মধ্যম ও অধাম ভেদে ১২৲, ৫৲, ও ২৷৷০ টাকা লাগিয়া থাকে। আমরা পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া ইন্দ্র কুণ্ডে স্নান করিতে গেলাম। স্নানান্তে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া পঞ্চতীর্থ পাহাড়ে উঠিলাম। এই পাহাড়ে উঠিতে প্রায় চারি শত সোপান আছে। মধ্যে মধ্যে বিশ্রামের জন্য স্থানও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিয়দ্দূর উঠিয়া বৈদ্যলিঙ্গেশ্বর মহাদেবকে দর্শন করিলাম। তৎপরে যে স্থানে হর পার্ব্বতী রূপী পক্ষী দ্বয়ের পূজা হয় তথায় উপস্থিত হইলাম। এই স্থানে যাত্রীদিগের বিশ্রামের একটী খোলা একতালা দালান (চাঁদনীর মত) আছে। তথায় প্রায় ৩০।৪০ জন গুজরাটী, মাদ্রাজীও পাঞ্জাবী যাত্রী বসিয়া আছেন। ঐ দালানের- ৭।৮ হাত দূরে একটা টীলার উপর পূজা ও ভোগের স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। আমরা তথায় যাইয়া বিশ্রাম করিতেছে, ইতি মধ্যে পূজারী ব্রাহ্মণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং উক্ত টিলার উপর একখানা পিঁড়ী পাতিয়া তদুপরি বসিয়া মালাজপ করিতে লাগিলেন। ভোগের বন্দোবস্ত দেখিলাম, একটী পিত্তলের ছোট ডেগের ভিতর বাদাম, কিস্মিস ও অন্যান্য ছোট ছোট ফল সংযুক্ত খেচরান্ন এবং চারিটী ছোট বাটীর মধ্যে একটীতে তৈল, একটীতে জল, একটীতে ইটভিজান জল ও অন্যটীতে চিনির সরবৎ। এই সমস্ত উপকরণ লইয়া পূজক মহাশয় স্থির চিত্তে জপ করিতে লাগিলেন। আমরা পক্ষী আগমনের প্রতিক্ষায় বসিয়া রহিলাম। বেলা সাড়ে দশটার সময় একটী অতি উচ্চ পর্ব্বতে একটী পক্ষী আসিয়া বসিল। যাত্রী মহাশয়গণ উক্ত পক্ষী দেখিবা মাত্র সকলে আনন্দ ধ্বনি করিতে করিতে উদ্দেশে ভক্তি ভরে প্রণাম করিলেন। পাঁচ-ছয় মিনিট পরে পক্ষীটী পূজকের মস্তকের উপর দিয়া উড়িয়া গিয়া লিঙ্গেশ্বর মহাদেবের মন্দির প্রদক্ষিণ করতঃ পূজকের নিকট আসিয়া বসিল। অন্য পক্ষীটী আর আইসেনা। আমরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম। কারণ আমাদের দেশে শিবাভোগে যেমন শিবাভোগ গৃহিত না হইলে ভোগ দাতার অমঙ্গলহয়, তদ্রূপ এখানেও

যদি পক্ষী ভোগ গ্রহন না করেন, তবে যাত্রীর অকুশল হইয়া থাকে। সুতরাং স্ত্রী লোক যাত্রীর মধ্যে রোদনের পালা পড়িয়া গেল। উক্ত টীলার নাতি দূরে একটী কুণ্ড আছে,—প্রবাদআছে, ঐ দেবরূপী পক্ষী কখনও কখনও ঐ কুণ্ড হইতে সহসা বহির্গত হয়। কিন্তু কলিকালে তাহা প্রায় দেখা যায়না। আমি যখন সংকল্প দিলাম তখন কোন পক্ষী তথায় ছিলনা। কুণ্ডটী আমাদের সম্মুখেই অবস্থিত ছিল। আমরা পাণ্ডার নিকট ঐরূপ গল্প শুনিতেছি, এমন সময় বাজিকরের ভেল্কির ন্যায় অন্য পক্ষীটী কুণ্ড হইতে বহির্গত হইয়া পূজকের নিকট বসিল, পূজক ও বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভক্তি গদ্গদ চিত্তে পক্ষীকে প্রণাম ও মনে মনে স্তব স্তুতি করিতে লাগিলাম। পক্ষী দুইটী দেখিতে আমাদের দেশের চিলের মত—কিন্তু আকারে অপেক্ষাকৃত বড়। পক্ষীর নাম ধর্ম্ম এবং পক্ষীনীর নাম উষামায়ী; ইহারা চারি যুগে অমর। তৎপরে হর-পার্ব্বতী রূপী পক্ষীদ্বয় কিছু কাল বিশ্রাম করিয়া চঞ্চু দ্বারা তৈল লইয়া সর্ব্বাঙ্গে মাখিয়া প্রথমে ইট ভিজান জলে, পরে ভাল জলে স্নান করিয়া সরবৎ পান করতঃ ভোগ গ্রহন করিয়া তথা হইতে উড়িয়া গেল। এই সমস্ত কার্য্য আমি স্বচক্ষে দর্শন করিলাম, আর মনে মনে চিন্তা করিলাম, "মা তুমি কত রূপই ধারণ করিয়াছ, আবার পক্ষী রূপী দেবতা হইয়া ভক্তি-প্রেম শিক্ষা দিতেছ; ধন্য! তোমার লীলা"। পাণ্ডার নিকট শুনিলাম, উক্ত পক্ষীদ্বয় ভোগ গ্রহনান্তে রামেশ্বর ধাম গমন করেন, আবার সন্ধ্যার সময় কাশিধাম যান, তথায় রজনী অতিবাহিত করিয়া পুনরায় পরদিন দশ এগারটার সময় চেঙ্গলপুট আইসেন। প্রত্যহ এই রূপ হইয়া থাকে। আমরা পক্ষীরূপী হর-পার্ব্বতী মাকে পূজা দিয়া প্রসাদ গ্রহনান্তে পূজারী মহাশয়কে দক্ষিণা দিয়া বাসায় আসিলাম। এখানে আরও জানিতে পারিলাম, পূজকগণের কোনও পুরুষে একাধিক সন্তান জন্ম গ্রহন করেনা। আমরা বাসায় আসিয়া আহারাদি সমাপনান্তে বেলা চারিটার সময় চেঙ্গলপুট ষ্টেশনাভিমুখে যাত্রা করিয়া সন্ধ্যাকালে ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। এবং প্রত্যেকে ২৸৴ আনা ভাড়া দিয়া কাঞ্চিপুর দর্শন মানসে অর্কনম ষ্টেশনের টিকেট করিলাম।

রাত্রি নয়টার সময় চেঙ্গল পুট হইতে রওনা হইয়া পরদিন রাত্রি সাড়ে দশট র সময় অর্কনম ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। তথায় পাণ্ডা আসিয়া আমাদিগকে তাঁহার বাসায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। পাণ্ডাটী গুজরাটী ব্রাহ্মণ, অতিশয় ভদ্রলোক, তাঁহার শিষ্টাচারে আমরা তাঁহার বাটীতে যাইতে বাধ্য হইলাম। ইংরাজী ভাষায় তাহার সহিত কথোপকথন চলিতে লাগিল। পাণ্ডাটী হিন্দি ভাষাও অবগত আছেন। আমরা তাঁহার বাসায় আসিয়া নিদ্রায় রজনী অতিবাহিত করিলাম।

কাঞ্চীপুর অতি প্রাচীন নগর। আর্য্যাবর্ত্তে যেমন কাশী মোক্ষদায়ক তীর্থ, দাক্ষিণাত্যে কাঞ্চীও সেইরূপ। দক্ষিণ দেশীয় স্মার্ত্ত দিগের মতে শিবকাঞ্চী বারানসীর ন্যায় মহাতীর্থ, স্থল পুরাণ মতে বারানসী, রামেশ্বর

ও শ্রীক্ষেত্র ইত্যাদি পুণ্যতীর্থ অপেক্ষা কাঞ্চীপুর উৎকৃষ্টতর তীর্থ। এখানকার পশুপক্ষী পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ করে। কাঞ্চীপুর পুরাণোক্ত সাতটী মোক্ষদায়িকা তীর্থের অন্যতম তীর্থ। যথা :—

অযোধ্যা মথুরা মায়া কাশী কাঞ্চী অবন্তিকা।
পুরিদ্বারাবতী চৈব সপ্তৈতা মোক্ষদায়িকা॥

কাঞ্চীপুর দুইভাগে বিভক্ত। শিবকাঞ্চী ও বিষ্ণু কাঞ্চী। শিবকাঞ্চী হইতে প্রায় দুই ক্রোশ দূরে বিষ্ণু কাঞ্চী অবস্থিত। শিবকাঞ্চীতে মহাদেবের "একাম্রনাথ" নামক মূর্ত্তি বিরাজিত। ইহা পাঞ্চভৌতিক মূর্ত্তির মধ্যে ক্ষিতি মূর্ত্তি। দেববিগ্রহ মৃত্তিকা নির্ম্মিত বলিয়া, এখানে অন্যান্য দেবালয়ের ন্যায় জলাভিষেক হয়না। মন্দিরের প্রাঙ্গনে একটী অতি প্রাচীন আম্রবৃক্ষ আছে। উহার চারিটী শাখায় মিষ্ট, তিক্ত, কটু ও অম্ল এই চারি রস যুক্ত চারি প্রকার আম হইয়া থাকে। আর একটি দৃশ্য আমরা চক্ষে দেখিলাম যে, এক শাখায় মুকুল হইয়াছে, অন্য শাখায় ছোট ছোট গুটি ধরিয়াছে, অন্য শাখায় বড় বড় আম রহিয়াছে এবং অপর শাখাটীতে আম পাকিয়াছে। এখানে জন শ্রুতি আছে যে, পূর্ব্বে এই আম্র বৃক্ষ হইতে প্রতিদিন একটী করিয়া পাকা আম পাওয়া যাইত; সেই আম্রটীতে বিগ্রহের ভোগ হইত, সেই জন্য বিগ্রহের নাম একাম্রনাথ। আজকাল প্রত্যহ আর পাকা আম পাওয়া যায়না। একাম্রনাথের কতক গুলি প্রিয় শুক পক্ষী আছে।

একাম্র নাথের মন্দিরের নিকট কামাক্ষী দেবীর মন্দির। এই মন্দির একাম্রনাথের মন্দিরাপেক্ষা ক্ষুদ্র। দেবীর মন্দির প্রাঙ্গনে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের সমাধি এবং তদুপরি শঙ্করাচার্য্যের প্রস্তরময়ী মূর্ত্তী রহিয়াছে। ফাল্গুণ মাসে এই স্থানে পনর দিবস ব্যাপী মহোৎসব হইয়া থাকে। এখানে পার্ব্বণ শ্রাদ্ধ করিতে হয়। অশক্ত পক্ষে ভোজ্য উৎসর্গকরা নিতান্ত প্রয়োজন। পাণ্ডাগণও যদৃচ্ছা লাভে সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল; খাদ্য দ্রব্যও যথা সম্ভব পাওয়া যায়।

আমরা শিব কাঞ্চীর কার্য্য সমাধান্তে পাঁচ সিকায় এক খানি ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া বেলা আট্‌টার সময় রওনা হইয়া বেলা সাড়ে নয়টার সময় বিষ্ণু কাঞ্চীতে উপনীত হইলাম। বিষ্ণু কাঞ্চীতে শ্রীবদররাজ স্বামীর মন্দির ও চতুর্ভুজ দণ্ডায় মান বিষ্ণু মূর্ত্তি আছে। এই মন্দির একাম্র নাথের মন্দিরাপেক্ষা সৌন্দর্য্য ও আড়ম্বরে শ্রেষ্ঠ। ভারতের ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ডক্লাইব বাহাদুর এই বিষ্ণু মূর্ত্তিকে ৩,৬৬১৲ টাকা মূল্যের এক খানি কণ্ঠাভরণ প্রদান করেন। উক্ত হার অদ্যাপিও শ্রীমূর্ত্তির গলদেশে শোভা পাইতেছে, আমারা দেখিলাম উৎকৃষ্ট স্বর্ণহার; তাহার মধ্যে মূল্যবান্ মণি মুক্তা আছে। বৈশাখ মাসে ঐ স্থানে দশ দিন ব্যাপী মহামহোৎসব হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন এই স্থানে আরও অনেক তীর্থ আছে। তন্মধ্যে সোম, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি তীর্থ এবং সোমধারা তীর্থ সর্ব্ব প্রধান। ইহা ভিন্ন কাঞ্চীপুরের সন্নিকটে কেদারেশ্বর ও বালুকারণ্য নামে দুইটী পুণ্যতীর্থ আছে। এই বিষ্ণু মূর্ত্তির গল দেশে এক শত নারায়ণ শীলার মালা আছে। তদ্ব্যতীত

নানারূপ স্বর্ণালঙ্কার ও পুষ্পমালা শোভা পাইতেছে। তাঁহাকে দর্শন মাত্রেই মনঃ প্রাণ ভক্তিরসে আপ্লুত হয়। এই মূর্ত্তির পার্শ্বে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত হইয়া আরও একটী বিগ্রহ বিরাজিত আছেন।

আমরা বিষ্ণুকাঞ্চী উপনীত হইয়া এক জন পাণ্ডার সহিত একটি পুষ্করিণীতে স্নানাহ্নিক সমাপ্ত করিয়া বিষ্ণু মন্দিরে প্রবেশ করিলাম। আমাদের কিছুক্ষণ মন্দিরের প্রাঙ্গন মধ্যে অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল। কারণ তখন পর্য্যন্ত পূজারী পাণ্ডা আসেন নাই। আমি উক্ত সময় দাড়াইয়া মন্দিরগাত্রে নানা রূপ অতি প্রাচীন চারু কারু কার্য্য দেখিতে লাগিলাম। কালের পরিবর্ত্তন শীল আশ্চর্য্য মহিমা দর্শনে হৃদয়ে যুগপৎ বিস্ময়, ক্ষোভ ও ভক্তির উদয়ে আত্মহারা হইতে ছিলাম। ইতি মধ্যে পূজারী পাণ্ডা আসিয়া উপস্থিত হইলেন, আমরা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিতে লাগিলাম। প্রথম প্রবেশ করিয়াই দালানের ছাদের সহিত একটী স্বর্ণ নির্ম্মিত টিক্‌টিকী দেখিলাম। উক্ত টিক্‌টিকীকে বস্ত্রের দ্বারা প্রত্যেক যাত্রীকে এক একটী আঘাত করিতে হয়। পাণ্ডা বলিলেন, "তাহাহইলে যাত্রা কালে বা অন্য কোন শুভ কার্য্যে টিক্‌টিকী ধ্বনি জনিত কোন অমঙ্গল সাধিত হয়না।" আমরা ক্রমে দশ বারটা দরজা অতিক্রম করিয়া মূল মন্দিরে উপনীত হইলাম। প্রত্যেক দরজা খুব শক্ত ও উত্তম তালাদ্বারা বন্ধ ছিল। আমরা বিগ্রহ সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দর্শন ও প্রণাম করিলাম। তৎপরে ভোগের জন্য পাঁচসিকা প্রদান করিয়া আশীর্ব্বাদ গ্রহনান্তর বাসায় রওনা হইলাম। বেলা প্রায় দেড়টার সময় শিবকাঞ্চীর সেই গুজরাটী পাণ্ডার বাটীতে আসিয়া উপনীত হইলাম।

তৎপর দিবস বেলা সাড়ে নয়টার সময় অর্কনম্ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া বোম্বে রওনার জন্য টিকেট্ করিলাম। অর্কনম্ হইতে বোম্বের রেল ভাড়া (থ্রু টিকেট্) ১৩৸৹ তের টাকা নয় আনা মাত্র। আমরা অর্কনম্ হইতে স্নানাহারের কার্য্য সামাধা করিয়া বেলা সাড়ে নয়টার সময় ট্রেনে আরোহণ করিলাম অল্পক্ষণ পরেই বাষ্পীয় শকট আমাদিগকে বক্ষে করিয়া লক্ষ্যপথে ছুটিল। আমরা দুই পার্শ্বের প্রাকৃতিক শোভা দেখিতে দেখিতে আনন্দ হৃদয়ে চলিতে লাগিলাম।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

মিনতি।

[১]

দিব বলে এসে চাই,
শক্তি মোর যত চাহিবার;
যা-ও আছে কেড়ে প্রভু—
নিঃস্ব করি দিয়ো পুরস্কার!

[২]

বলি শুধু দিয়েছ যা
তার বেশী দাও নি কি আর,
তোমারি পূজার-ছলে
স্বার্থ-পদে করি নমস্কার!

[৩]

চাহি না তোমার দান
লহ মোর যা আছে দিবার,—
রিক্ত মাঝে ধন্য হোক—
স্বপ্ন মোর চির পূর্ণতার !

[৪]

আমি প্রভাতের ফুল,
ছায়াঘন সাঁঝের কাননে
পূর্ণ হব ঝ'রে গিয়া
সুমধুর আত্মবলি দানে।

[৫]

সব নিয়ে, হে সুন্দর !
তোমা পরে দেছ অধিকার
ভাল বাসি বন্ধু তাই—
আর কিছু নাহি চাহিবার।

শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ শর্ম্মা।
ডেঃ মাঃ, নারায়ণগঞ্জ।

———:0:———

আলোচনা। *

আজি এই নববর্ষের প্রথম দিবসে গৃহে গৃহে এক পরিবর্ত্তনের ভাব লক্ষিত হইতেছে। এই পরিবর্ত্তন হর্ষের কি বিষাদের, তাহা কেহ জানেনা; কিন্তু প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়ম বশতঃ সকলেই ইহার বশ্যতাপন্ন হইয়া পড়িতেছে। আজ প্রতি গৃহে, প্রতি মন্দিরে, প্রতি ব্যবসায়িকের বিপণীতে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আবর্জ্জনা রাশির সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে নব প্রভাতের স্নিগ্ধ সমীরণ প্লাবিত করিয়া ধূপ গন্ধ বিস্তৃত হইতেছে, প্রতিপ্রাণে আজ সমস্ত বৎসরের মঙ্গলাকাঙ্খা সূচক ভগবানের মঙ্গলময় নামের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। আজ কেহ কাহাকে আঘাত করেনা, কেহ কাহাকে হিংসা করেনা, শত্রুকেও কেহ আজ পীড়ন করেনা, কেহ ধার করেনা, কেহ ধার দেয়ওনা; আজ কাহারও কিছু অভাব নাই, আজ কাহারও তজ্জনিত সন্তাপ নাই; বাস্তবিকই সকলে আজি শান্তি এবং আনন্দের প্রার্থী ও একমাত্র ভগবানের শরণাপন্ন। হিন্দুর সৌভাগ্য তাহারা এমন দিন পায়, সংসারের ভীষণ আবর্ত্তনের মধ্যে এমন একটি শুভ অবসর পায়, যেদিন ঘোর তমসাবৃত মেঘাচ্ছাদিত জগতে বিদ্যুতের ক্ষণিক আভার ন্যায় এই ভ্রান্তি বিজৃম্ভিত অশান্ত প্রাণ জীবগণের স্বাভাবিক শান্ত আনন্দময় জ্ঞানময় ও প্রেমময় অস্তিত্বের ঈষৎ আভাষ হৃদয়ের মধ্যে আপান আপনি আসিয়া পড়ে। আজি আমি আমাদের সেই সৌভাগ্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে দেখিলাম—মহা সৌভাগ্য আমাদের যে, আমরা হিন্দু; সেই আমাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ, সেই জ্ঞান-গরিষ্ট তেজঃ দীপ্ত ঋষিগণ, সেই মূর্ত্তিমান অগ্নির ন্যায় দেহ বিশিষ্ট মহাত্মাগণ, যাঁহারা সমস্ত জগৎ জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করিয়াছেন, প্রেমের মধুর রসে স্নিগ্ধ করিয়াছেন,

* এই প্রবন্ধটী ঢাকা মানিকগঞ্জের কালীবাড়ীর বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে স্থানীয় উচ্চ ইংরাজী স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু যোগেশ্বর গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক পঠিত।

আমরা তাঁহাদের সন্তান, তাঁহাদের দেশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি। ভ্রাতৃগণ! আজি এই নববর্ষের শুভ প্রথম দিবসে একবার সমস্ত গত বর্ষের আলোচনা করিয়াছ কি? একবার ভাবিয়াছ কি গতবর্ষ তোমাকে কি শিক্ষা প্রদান করিয়াছে? ইন্দ্রিয় বৃত্তির অসংযত ব্যবহারে তোমার মনের সেই সামান্য শক্তিরও অস্তিত্ব লুপ্ত হইয়াছে যদ্দ্বারা তুমি তোমার প্রাণের কথা বুঝিতে পার। তোমার প্রাণ একটী মাত্র মূহুর্ত্তে কত বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কথা ভাবিয়া ফেলে, তুমি কেবল শক্তি হীন বলিয়া তাহা ধারণ করিয়া রাখিতে পারনা, কেবল একটী নিরর্থক দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে হর্ষবিষাদ শূন্য নির্ব্বিকার প্রাণে বলিয়া থাক—'এক বৎসর গেল।' তুমি বুঝিতে পারনা যে এই সামান্য আটটী মাত্র অক্ষর প্রকাশ করিয়া তুমি তোমার গতবর্ষের সমস্ত জীবন কাহিনী চিন্তা করিয়া ফেলিয়াছ, সমস্ত সুখ দুঃখের কথা স্মরণ করিয়াছ। যদি সত্য সত্যই আজ সকলের প্রাণে এই অতীত বর্ষালোচনা প্রসঙ্গে একবার নিজের নিজত্বের মধ্যে তরঙ্গ উত্থিত হইয়া থাকে, তবে এস ভাই! সেই ক্ষুদ্রতরঙ্গের পৃষ্ঠে নূতন তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া সমস্ত হৃদয় সাগর আলোড়িত করিয়াতুলি, একবার উপলব্ধি করি আমরা কি, কাল কি, সৃষ্টি কি, স্থিতি কি আর লয় কি?

নব প্রভাতের ঊষারাগ রঞ্জিত আকাশ মৃদু মধুর গন্ধবাহী শীতল সমীরণ, বনে উপবনে হাস্যময় কুসুম রাশির শোভা, ভ্রমরের গুঞ্জন, বিহঙ্গের কুজন, যেমন একমাত্র সুপ্তোত্থিতেরই নয়ন মন প্রফুল্লিত করিয়া থাকে এবং অলস বিলাসী নিদ্রিত ব্যক্তি যেমন এবম্প্রকার সুন্দর দৃশ্যের অস্তিত্ব ও উপলব্ধি করিতে পারেনা, তদ্রূপ যাহারা বিষয়ভোগে অত্যধিক লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, ইন্দ্রিয় লালসায় মুগ্ধ হইয়া দানবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা এই ভাস্কর দেবের মীন রাশির সংক্রমনে যে কালের ভেরী দিগ্ দিগন্ত নিনাদিত করিয়া অনন্তকাল ব্যাপী বিরাট্ বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয় ব্যাপার প্রচার করিতেছে, তাহার মর্ম্ম কিছু মাত্র উপলব্ধি করিতেছেনা। ভ্রাতৃগণ! অঘটন-ঘটন-পটিয়সী প্রকৃতির ঐন্দ্রজালিক মায়ায় মুগ্ধ হইয়াই কি কেবল জীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। এই চৈত্রমাস চলিয়া গেল, এই চৈত্র মাস মধুমাস। তোমার আমার মত দেহপ্রাণ-বিশিষ্ট আমাদের পূর্ব্ব পুরুষ মহর্ষিগণ সুষুম্না মধ্যস্থ চিত্রানী নাড়ীর অন্তর্গত ব্রহ্মনাড়ী মধ্যে শক্তি স্বরূপিনী কুল-কুণ্ডলিনী সঞ্চালিত করিয়া পরম পুরুষ সঙ্গমে ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করিতেন, আজি এই অধঃ পতনের দিনে এই চিত্রা নক্ষত্র প্রধান চৈত্র মাসের চিত্রিত আকাশনিম্নে তাঁহাদের সন্তানগণ, কৌপীন সম্বল বেদান্তরসরমণ সন্ন্যাসীর অভিনয় প্রদর্শন করিয়া থাকে। সেই পুণ্যাত্মা মহর্ষিগণ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিস্থিতিলয় ব্যাপারকে মহাকালী প্রকৃতির লীলানর্ত্তন বলিয়া উপলব্ধি করিয়া ছিলেন, আর আজি তাঁহাদের সন্তানগণ সেই মহা কালীর নর্ত্তনের অভিনয় করিয়া থাকে মাত্র; কেউ একবার প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে চেষ্টা করেনা। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বর্ষের পর বর্ষ, যুগের পর যুগ করিয়া কাল প্রবা-

হিত হইয়া যাইতেছে, ত্রিকালদর্শী মহর্ষিগণ ইহার সমস্ত ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়া এই মধুমাস চৈত্রমাসে মায়ামুগ্ধ জীবের উদ্বোধনার্থ যে ভক্তি ও জ্ঞান সম্বলিত ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন এবং যে মহান্ শান্তিপ্রদ শিক্ষা দান করিয়াছেন, তাহা আজ কেহই লক্ষ্য করিতেছে না। কাল চক্রের অনন্ত আবর্ত্তনে মহা প্রলয় সংঘটিত হইয়া এক মাত্র নিত্য পরমাত্মার অস্তিত্ব থাকে ইহা যাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহারাই বর্ষশেষে চড়ক পূজার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সুখ দুঃখ পূর্ণ সাংসারিক নানাবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া সমস্ত বৎসরের জীবন কর্ত্তন করিয়া, বর্ষতিরোধানে, সংসারের সকল জ্বালা যন্ত্রনা এড়াইয়া, সন্ন্যাসী হইয়া ভগবান্-লীলা কীর্ত্তনে আনন্দে নর্ত্তন কি মধুর—কি শান্তিপ্রদ তাহা যিনি একবার সমাহিত চিত্তে ভাবিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন। হায়! হায়!! এই অধঃ পতনের দিনে, বঙ্গদেশের এইযে সামান্ত সংখ্যক কয়েকটী ক্ষুদ্র পল্লীতে ভগবান্মুখী জীবনের প্রধানতম চরম আশ্রয় সন্ন্যাস মন্ত্রের প্রচার হয়, তাহা আজ পশ্চাত্য শিক্ষা,-বিকৃত-মস্তিষ্ক গর্ব্বিত দেশবাসিগণের কাছে ভূত-প্রেতের তাণ্ডব নর্ত্তন নামে অভিহিত হয়। হায়! হায়!! মদান্ধ হইয়া আমরা বুঝিতে পারিতেছি না যে, এই বর্ষ পরিবর্ত্তনের মত যুগপরিবর্ত্তনের সময় পুণ্যাত্মা ঋষিগণের আহ্বানে কোটী কোটী প্রাণ বিষয়-ভোগ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহন করিয়া ভগবান প্রসঙ্গে ভগবানের লীলা-কীর্ত্তনে আনন্দ-বিভোর হইয়া যায় এবং প্রেম ভক্তির আধার ঐ সকল তপ্ত কাঞ্চন নিভ দেহবান্ পুণ্যাত্মা, তপস্বী ও মহর্ষিগণ লইয়া নববর্ষের প্রথম মাসের ন্যায় নবযুগের প্রথমে অক্ষয়তৃতীয়ার শুভ তিথিতে সত্যযুগের আবির্ভাব হয়। আজ যেমন বর্ষ পরিবর্ত্তনের সময় চর্ম্মকার ঋষির ঢক্কা নিনাদে অভিনেতৃ সন্ন্যাসিগণ উৎফুল্ল হৃদয়ে সংসারের সকল চিন্তা দূরে রাখিয়া নৃত্যগীতে মগ্ন হয়, তেমনই যুগ পরিবর্ত্তনের সময় ধর্ম্মকার ঋষিগণের বেদের গম্ভীরবাণী শ্রবণ করিয়া কোটী কোটী জীব-জীবনের চরমলক্ষ্য মোক্ষের প্রার্থী হইয়া প্রেমভক্তিরসে ডুবিয়া যায়। সেই সময় হইতে জগতে সত্য যুগের আবির্ভাব হয়—সমস্ত জগতে শান্তির শত প্রবাহ বহিয়া যায়। তখন সেইভাবে বিভোর আপনাভোলা মহর্ষি গণের শ্রীমুখ হইতে জীব-জগৎ-ব্রহ্মতত্ব প্রকাশিকা বেদ বাণী গম্ভীর হুঙ্কারে বহির্গত হয়, আর সেই প্রাণারাম পরম মঙ্গল বাণী সমূহ শ্রুতি পরম্পরা রক্ষিত হইয়া জীব জগৎ কৃতার্থ ও ধন্য করিয়া দেয়। তত্ব পিপাসু মহাত্মাগণ সেই বেদবাণী সমূহ ব্যাখ্যা করিয়া ত্রেতাযুগে যোগ বাশিষ্ঠ রামায়ণ, দ্বাপরে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এবং কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবত সৃষ্টি করিয়া থাকেন। সত্যযুগের প্রেম মত্ত জীব সেই চির সনাতন অব্যয় পুরুষের সঙ্গলাভ করিয়া বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের অনুপরমানুব্যাপী তাঁহার বিকাশের কথা প্রচার করে; ত্রেতা যুগে সেই সর্ব্ব নিয়ন্তার অলঙ্ঘ্য নিয়মে এক পাদ ধর্ম্ম অপহৃত হয়, আর জীব সকল জড় জগতের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যোগ বাশিষ্ঠর মহাবাণী 'পুরুষকার' 'পুরুষকার' বলিয়া উত্তেজিত হইয়া উঠে এবং সেই চক্রধারীর কালচক্রে এক দ্বিতীয় অধ্যায়ে

জগতে জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম্ম মিশ্রিত হয়। এই যুগে জীব ব্রহ্মনাড়ী ত্যাগ করিয়া সূর্য্য ও চন্দ্র নাড়ীর আশ্রয় গ্রহণ করে বলিয়া, জগতে সূর্য্য ও চন্দ্র বংশের সৃষ্টি হয় এবং প্রেম ময় ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র রূপে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরে দুই পাদ ধর্ম্ম তিরোহিত হয়, তাই কর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপিত করিয়া প্রাণ কর্ম্মের অবতার বলরাম ও মন কর্ম্মের অবতার বুদ্ধ অবতীর্ণ হন এবং ভবিষ্যতের একমাত্র নিয়ন্তা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্ব শেষ যুগ কলি যুগের আশ্রয় স্বরূপ প্রেমের রাজ্য জগতে গুপ্তভাবে প্রচার করিয়া যান। আর কলিযুগে কর্ম্মের প্রাবল্যে তিনপাদ ধর্ম্ম অপসৃত হয়; তখন ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যরূপে অবতীর্ণ হন। দ্বাপরে কর্ম্মের প্রাবল্যে জীবের কথ্য ভাষা লেখ্য ভাষায় বিকশিত হইয়া বেদ হইতে পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্র গ্রন্থরূপে প্রকাশিত হয়; কলিযুগের প্রথম অবতার শঙ্করাচার্য্য ঐ সকল পবিত্র গ্রন্থ সাহায্যে কর্ম্মাপেক্ষা জ্ঞানের প্রাধান্য স্থাপন. করিয়া ভবিষ্যৎ প্রেম-সঞ্চারের ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া যান। ধর্ম্ম একপাদীভূত হইলে জগৎ পাপান্ধকারের রাজ্য হয়, সেই অন্ধতমসা ভেদ করিয়া ভগবান্ শঙ্কর জ্ঞানের বিমল জ্যোতি বিকীরণ করেন. জগৎ তাহার পাপ-পুণ্য জনক কর্ম্মের মধ্যে বিরাট্ সমষ্টি পুরুষের ব্যষ্টি ভাব লক্ষ্য করে, ব্রহ্মাণ্ড কম্পিত করিয়া গম্ভীর বাণী উত্থিত হয়—সোঽহং,—সোঽহং—সেই আমি—সেই আমি। জগৎ এই সোঽহং উপলব্ধি করিয়া প্রেম লাভের উপযুক্ততার পরিচয় স্বরূপ মহা-শক্তির কৃপালাভ করে, অরুণ-রাগ-রঞ্জিতকৌপিন-পরিহিত করঙ্গধারী মহাবীর্য্যবান্ সন্ন্যাসিগণ তাহার বক্ষে বীরদর্পে বিচরণ করিয়া থাকেন; আর একদিন ফাল্গুনী পূর্ণিমার শুভ তিথিতে চন্দ্র গ্রহণ যুক্ত শুভ গোধুলী লগ্নে প্রেমের মহা-প্লাবন পূর্ণ ভগবান্ মহা-প্রভূ শ্রীগৌরাঙ্গ অবতীর্ণ হইয়া শঙ্কর প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস আশ্রম-যোগে সোঽহং তত্ত্ব প্রেম-মধুররসে স্নিগ্ধ করিয়া দেন। আবার জগতে প্রচারিত হয়——সোঽহং অর্থাৎ সেই আর আমি। আবার জীব উপলব্ধি করে সেই আর আমি——সেই তিনি আর আমি——জগতে আর কিছুর অস্তিত্ব নাই, কেবল তিনি আর আমি——জগতে একমাত্র আমরা দুইজন, এক তিনি আর আমি। জগৎ তখন জানিতে পারে, তিনি আমারই, আমিও তাঁহারই। জগৎ হৃদয়ে প্রেম সাগর উথলিয়া উঠে দ্বাপরের গুপ্ত প্রেমের রাজ্য অনন্ত কোটী স্নিগ্ধ সূর্য্যের কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া একমাত্র হলাদিনী রূপিনী শ্রীরাধিকা ও নিত্য পুরুষ শ্রীকৃষ্ণের প্রেম মধুর যুগল-মূর্ত্তি আপন বক্ষে আপন স্বরূপে উপলব্ধি করে। কলির পাপ প্রবাহের মধ্যে, পূতিগন্ধময় অজ্ঞানতার ঘন ঘোর তমসার মধ্যে, মোহ মায়ার পূর্ণ আধিপত্যের মধ্যে, ভবিষ্যৎ সত্য যুগের বীজ বপিত হয়; জীবনের জীবন, হৃদয়ের ধন, শান্তির আধার, একমাত্র প্রিয়তমকে লাভের প্রবল পিপাসায় জীব আবার সত্য যুগের অভিমুখী হয়, আবার আনন্দের শত ধারা প্রবাহিত করিয়া সত্যের বিমল-স্রোত স্নিগ্ধোজ্জ্বল কিরণে প্রতিভাত হয়। আজি এই বর্ষালোচনার গম্ভীর তত্ত্ব টঙ্কা নিনাদে দিগ্‌দিগন্তে প্রচারিত হইতেছে, আজি

উপলব্ধি কর মানব জীবন কুহেলিকা মাত্র। আজি তোমার নয়নের সম্মুখে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট্ ইতিহাস উন্মুক্ত রহিয়াছে; যদি একবার বুঝিয়া থাক জীবনান্তে মরণের রাজ্য অজ্ঞানমগ্নের ভ্রান্তিমত্ততা লইয়া তোমার অপেক্ষা করিতেছে; যদি একবার বুঝিয়া থাক সংসারের শত বন্ধন ছিন্ন করিয়া আকুল প্রাণে শান্তি ও আনন্দ ময় আশ্রয়ের অন্বেষণ করিতে হইবে, যদি আজি এই বর্ষতিরোধানের পর নব বর্ষের প্রথম দিবসে নূতন জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া কাল চক্রের ভীষণ আবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া থাক, তবে আজি এই পরম পুণ্যপ্রদ নির্ম্মল জ্ঞানালোকে জ্যোতিষ্মান হও, তবে আজি এই মহান্ শিক্ষায় শিক্ষিত হও যে, ত্রিতাপ ক্লিষ্ট মানব একদিন না একদিন সর্ব্ব ত্যাগময় সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করিয়া ভগবান্ লীলা প্রসঙ্গে ভগবান্ নাম কীর্ত্তনে আত্মোৎসর্গ করিবেই করিবে। একদিন মানব 'কোথায় প্রাণনাথ' 'কোথায় হৃদয় সর্ব্বস্ব' বলিয়া আকুলতায় উন্মত্ত হইয়া যাইবে। তবে আর বিলম্ব করিয়া ফল কি? তবে আর অসাধনে জীবন পণ্ড করিয়া দীর্ঘ কাল ব্যাপী জ্বালা যন্ত্রনা ভোগ করিবার প্রয়োজন কি? সুখান্বেষী হইয়া দুঃখকে নিমন্ত্রণ করিতেছি কেন? শান্তির প্রত্যাশী আমরা অশান্তির ক্রোড়ে জীবন অতিবাহিত করিতেছি কেন? প্রেম বন্যায় জগৎ ভাসাইয়া নবদ্বীপের শ্রীঅঙ্গন হইতে সাধনার বীজ হরিনাম মহামন্ত্র বিঘোষিত হইয়াছে। আজি সেই মহা মন্ত্রে দীক্ষিত হও, প্রেমাকুলকণ্ঠে "হরিবোল" "হরিবোল" রবে জগৎ মুখরিত করিয়া তোল। আর কত কাল মোহমদিরায় উন্মত্ত হইয়া জীবনের চরমলক্ষ্যের কথা বিস্মৃত হইয়া থাকিবে? আমরা না ভাই তাঁহাদের সন্তান, যাঁহাদের তেজঃপুঞ্জ কলেবর ব্রহ্মচারী সন্তানগণ ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষার্থী হইয়া সমিধকুশ হস্তে গুরু গৃহের আশ্রয় লইত, যাঁহাদের ধর্ম্মনিষ্ঠ পুণ্যাত্মা গৃহস্থ-সন্তান জগতের হিতার্থে মঙ্গলময় কর্ম্মের স্রোতে সমস্ত শক্তি ব্যয়িত করিত, যাঁহাদের সন্ন্যাসী সন্তান অসত্য বিষয় ভোগ বর্জ্জিত হইয়া আকুল পিপাসায় তীর্থে তীর্থে শান্তির অন্বেষণ করিত, যাঁহাদের বানপ্রস্থী সন্তান জীবন্মুক্ত হইয়া মহাপ্রেমের মধুররসে স্নিগ্ধ হইত। তবে আমরা তাঁহাদের সন্তান হইয়া অলস বিলাসে দুঃখ শোক পূর্ণ হৃদয়ে রসহীনতায় ডুবিয়া যাইতেছি কেন? ব্রহ্মাণ্ড জাগাইয়া আবার সত্যের বাণী উত্থিত হইয়াছে, আবার সত্য যুগের মঙ্গলময় লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, এই পাপ মলিন ঘোর কলির কোটী কোটী অমঙ্গলের মধ্য দিয়া আবার মঙ্গলের আবির্ভাব হইবে। প্রাণের পিপাসা একবার জাগাইয়া দাও, শক্তির শত দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দাও, পূর্ণ আশায় গর্ব্বিত বক্ষে সাধনার পথে অগ্রসর হও, ভগবানের নাম কীর্ত্তনে সমাহিত চিত্তে মগ্ন হও। আবার প্রতি গৃহে, প্রতি মন্দিরে, প্রতি চত্বরে, প্রতি অঙ্গনে, হরি নামের মধুর ধ্বনি উত্থিত হউক; কলুষ নাশন, তাপহরণ, শমনদমন, মধুসূদনের নামে জীবন ধন্য হইয়া যাক্; আকুল প্রাণে কাতর কণ্ঠে একবার বল হরিবোল; প্রাণ ভরিয়া বল হরিবোল, বদন ভরিয়া বল হরি বোল,

উর্দ্ধবাহু হইয়া বল হরিবোল, আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে বল হরিবোল, ভাবে বিভোর হইয়া বল হরিবোল, করুণ ক্রন্দনে বল হরিবোল, সরস হইয়া বল হরিবোল, প্রেমিক হইয়া বল হরিবোল। আজ কে কোথায় আছ শান্তির প্রয়াসী. আনন্দের প্রত্যাশী, প্রেমের পিপাসী; আজ কে কোথায় আছ জীবনের আকাঙ্ক্ষী, কে কোথায় আছ মরণের আকাঙ্ক্ষী, কে কোথায় আছ জীবন্মৃতের আকাঙ্ক্ষী, সকলে মিলিয়া বল হরিবোল, নির্ম্মল হইয়া বল হরিবোল, সাত্ত্বিক হইয়া বল হরিবোল। আবার মৃদঙ্গের গম্ভীর হুঙ্কারে, করতালের আনন্দ ময় ঝঙ্কারে, মৃত প্রাণ সঞ্জীবিত করিয়া আনন্দে বল হরিবোল। হরিবোল হরিবোল রবে জগৎ ভাসিয়া যাক্, হরিবোল হরিবোল রবে প্রাণ শীতল হইয়া যাক্, হরিবোল হরিবোল রবে শ্রবণ পবিত্র হইয়া যাক্, হরিবোল হরিবোল রবে এই রক্ত মাংসের দেহ ধর্ম্মময় হইয়া যাক্, সকলে মিলিয়া প্রাণ খুলিয়া বল হরিবোল! হরি-বোল!! হরিবোল!!!

———:0:———

বেহুলা।

চম্পক নগরপতি চাঁদ সদাগর,
শিব ভক্ত, ধর্ম্মরত, সুখী নিরন্তর।
ধনে জনে পরি পূর্ণ ছিল তাঁর ঘর,
ঘাটেতে থাকিত বাঁধা ডিঙ্গা মধুকর।
মনসা আপন পূজা করিতে প্রচার,
স্বপ্ন ছলে এসে চাঁদে বলে বার বার।
কর সাধু মোর পূজা ধন জন পাবে,
নতুবা কোপেতে মম সকল হারাবে।
ইহা শুনি সদাগর উপহাসে কয়
"মনসা দেবীর ভয়ে চাঁদ ভীত নয়;
যেই হাতে পূজে চাঁদ, শঙ্কর ভবানী,
সে হাতে পূজিতে নারে বেঙ খাওয়া কাণি"
ইহাতে মনসা দেবী হইয়া কুপিত,
একে একে ছয় পুত্রে করিল নিহত।
নানা মতে দুঃখ দিল চাঁদ সদাগরে,
সাত ডিঙ্গা মধুকর ডুবাল সাগরে।
যত দুঃখ দেয় দেবী, তত সদাগর
মনসার সনে বাদ সাধে নিরন্তর।
দুঃখ দিয়ে চাঁদে দেবী টলাতে, না পারে॥
কৌশলে সাধিবে কাজ ভাবিল অন্তরে।
আশীর্ব্বাদ ক'রে তাই তাকে দিল বর
অপরূপ ছেলে হ'ল নাম লক্ষ্মীন্দর।
শশি কলা সম শিশু দিনে দিনে বাড়ে।
লক্ষ্মীন্দরে পেয়ে চাঁদ সকল পাশরে।
ছেলের বিবাহ দিবে; বড় আশা মনে
নানা দেশে যায় চাঁদ পাত্রী অন্বেষণে।
রূপে গুণে সতী লক্ষ্মী বেহুলা নামেতে
অনুপমা কন্যামিলে দেবীর দয়াতে।
করি নানা ধুম ধাম ছেলের দিল বিয়া,
বাসর ঘরে ছেলে বউ শুয়ে র'ল গিয়া।
রাত্রি কালে লক্ষ্মীন্দরে সাপে গেল কাটি
ভোরে উঠে সকল লোক করে কাঁদা কাটি,
কত শত ওঝা এল কত মন্ত্র পড়ে
তথাপি বাঁচাতে কেহ নারে লক্ষ্মীন্দরে।
পতি কোলে করে সতী কাঁদিয়া আকুল,
কি করিবে কোথা যাবে নাহি দেখে কুল।

"সতীর তপস্যা বলে পতি প্রাণ পায়"
এই ভেবে মৃত পতি ভেলায় উঠায়।
নদী জলে ভেসে সতী পতিসনে যায়
যেই দেখে সেই জন করে হায় হায়!
দিনে দিনে মাসে মাসে বর্ষা যায় চলে
সাধনায় আছে সতী পতি করি কোলে।
এমন সতীর পতি কে হরিবে বল?
স্বরগেতে দেবতার আসন টলিল।
সহসা আকাশ খানি উজল হইল,
আসিয়া মনসা দেবী তাঁকে দেখা দিল।
দেবীর আশীষে উঠে লক্ষীন্দর জীয়ে,
পতিকে প্রণমে সতী মাথা নোয়াইয়ে।
দেব বালা পুষ্প বৃষ্টি করে বরিষণ
ধন্য মেয়ে সতী লক্ষ্মী বলে সর্ব্বজন।
তৎপর দেবী পাশে যুড়ি দুই কর
ছয় ভাসুরের প্রাণ মাগে সতী বর।
মনসা হইয়া তুষ্টা সতীর উপরে,
প্রাণ দান দিল মৃত ছয় সহোদরে।
সাত ডিঙ্গা মধুকর উঠিল ভাসিয়া
চলিল দেশেতে সবে তাহাতে চড়িয়া,
পতিসনে সতী লক্ষ্মী ফিরে এল দেশে
মনসারে পূজে চাঁদ মনের হরষে।

শ্রীমতি ননী বালা বসু।

—————:0:—————

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

পরিচয় জানা না থাকিলেও প্রাচীন বাঙ্গালার জন সাধারণই মালসী গান প্রণেতা সাধক-শিরোমণি "দ্বিজ রাম প্রসাদের" নাম অবিদিত নহেন।

সঙ্গীত লালসা সহৃদয় মানুষ মাত্রেরই আছে; শ্যামা বিষয়ক গীতাবলী শাক্ত-সম্প্রদায়ের চিত্ত-রঞ্জনের, ভজন-সাধনের প্রকৃষ্ট উপায়। এ সকল আদর্শ সঙ্গীত অন্যান্য সম্প্রদায়েরও প্রমোদপ্রদ।

মালসী গান প্রণেতা প্রাচীন সঙ্গীত রচয়িতা গণ মধ্যে "দ্বিজ রাম প্রসাদ" নাম সর্ব্বাগ্রে সবিশেষ উল্লেখ যোগ্য। তাঁহার রচিত গানগুলি অতীব মধুর এবং মনোহর; গভীর ভাবে মনোহরণও করিয়া থাকে।

এ দ্বিজ রামপ্রসাদ কে?

প্রসাদ প্রসঙ্গ প্রণেতা ৺ দয়াল চন্দ্র ঘোষ রাম প্রসাদের জীবন বৃত্তান্ত বর্ণনে লিখিয়া গিয়াছেন "যদিচ কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ ভিন্ন দ্বিজ রাম প্রসাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে স্থির মীমাংসায় উপনীত হইতে পারিলাম না, তথাপি পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রাম প্রসাদ ভিন্ন পূর্ব্ব বাঙ্গালায় একজন যে দ্বিজ রাম প্রসাদ ছিলেন, আমার এ সংস্কার দূর হইলনা।"

সাধক সঙ্গীত প্রকাশক বাবু কৈলাস চন্দ্র সিংহ লিখিয়াছেন, "বঙ্গদেশে যে সকল সঙ্গীত রচয়িতা রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে তিন জনের নাম উল্লেখ যোগ্য। প্রথম—রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারী,

উদাসীন, প্রকৃত সাধক; তিনি কালীর নামে ঝুলি, কাঁথা সার করিয়াছিলেন। দ্বিতীয়—রাম প্রসাদ, কবিরঞ্জন রাম প্রসাদ সেন, ইনি গৃহী, সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও সাধক শ্রেণীতে স্থান পাইতে পারেন। ইঁহার সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইঁহার মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ব্যবসাদারী ছিল, নচেৎ তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তন রচনা করিতে পারিতেন না। আমরা সাধক-সঙ্গীতের প্রথম সংস্করণে তাঁহার সুদীর্ঘ জীবন-চরিত ও ধর্ম্মমতের সমালোচনা করিয়াছিলাম; কিন্তু নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে, এবার তাহা পারিলামনা। কারণ রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারীর যশের মুকুট রাম প্রসাদ সেনের শিরে সংস্থাপন করিয়া আমরা নিতান্ত গর্হিত কার্য্য করিয়াছি বলিয়া আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস হইয়াছে, এবং এজন্য আমরা সেই স্বর্গীয় সাধু পুরুষের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। যিনি সংসারকে পদে ঠেলিয়া সমস্ত জীবন কালী সাধনায় অতিবাহিত করিয়াছেন; কালীতে আহার, কালীতে বিহার, কালীতে মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন; সেই রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারীর সহিত কি, "ইচ্ছা সুখে ফেলে পাশা পাকায়েছ কাঁচা গুটী" বলিয়াছেন, সেই রাম প্রসাদ সেনের তুলনা হইতে পারে?

তৃতীয়—রাম প্রসাদ, কবিওয়ালা। ইনি নীলু কবিওয়ালার সহচর ছিলেন। ইঁহাদের দলকে সাধারণতঃ লোকে "নীলু রামপ্রসাদের দল" বলিত।

আমরা গ্রন্থমধ্যে যে সকল গীত "রাম প্রসাদী সঙ্গীত" বলিয়া প্রকাশ করিয়াছি, তাহার অধিকাংশ রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ও রাম প্রসাদ সেনের রচনা হইলেও কবিওয়ালা রামপ্রসাদ ও অন্যান্য ব্যক্তির রচিত গীতও তাহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াছে এরূপ অনুমান বোধ হয় নিতান্ত অসঙ্গত নহে।

ব্রাহ্মণ কুলজাত সাধক চূড়ামণি রাম প্রসাদ ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মপুত্রতীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চৌদ্দশ পুর নামক স্থানে যে কালীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীতে তিনি জীবন যাপন করিয়াছেন। তাঁহার জন্ম মৃত্যুর সময় নির্ণয় করা সুকঠিন। তিনি কবিতা প্রকাশের জন্য সঙ্গীত রচনা করিতেন না, মানব সমাজে যশোলাভ করিবার অভিলাষী ছিলেন না। তিনি স্বাধীন বন-বিহঙ্গের ন্যায় স্বীয় মনের ভাব সঙ্গীতে প্রকাশ করিয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইতেন। কখন বা মায়ের নিকট আব্দার করিতেন, কখন বা অভিমানের সহিত মায়ের সঙ্গে কলহ করিতেন, কখন বা গালা গালি করিয়া মায়ের বাপান্ত করিতেন, কখন বা মায়ের বলে বলীয়ান হইয়া শমন কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন করিতেন।"

প্রসাদ পদাবলী প্রকাশক লিখিয়াছেন, "কোবিদ বৈদ্য ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত মাসিক প্রভাকরে প্রাচীন কবি গণের বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া অনেক তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার অনুসন্ধিৎসা বলেই ভারত চন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিগণের বৃত্তান্ত ইদানিন্তন লোক প্রথমে অবগত হইতে পারিয়াছেন, একথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। পরিশেষে সেই বৃত্তান্তে নির্ভর করিয়া অনেকেই প্রসাদের জীবন চরিত বর্ণনে প্রবৃত্ত

হন; কিন্তু প্রসাদ প্রসঙ্গ-কার ভিন্ন অন্য কেহ যে এজন্য কিছুমাত্র পরিশ্রম করিয়াছেন বা নূতন কথা সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা বোধ হইলনা। সুতরং আমরা প্রধানতর এই দুই জনের আখ্যায়িকা হইতেই প্রসাদ কবির জীবন বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিলাম।”

ক্রমশঃ।

———:0:———

সাধক-সঙ্গীত।

ল’য়ে চল নাথ সেইখানে মোরে যথা এ ভবের বিরতি।
চন্দ্র সূর্য্য বিহনে যেখানে পূর্ণ পরম জ্যোতি॥
জীবাত্মা বিহনে চৈতন্য যেখানে আঁধার বিহনে স্থিতি,
মন বিনা জ্ঞান আনন্দ নিয়ত যেখানে এহেন রীতি;
অভাব হইয়ে পূর্ণ যেখানে পুণ্য পাপে পায় বিকৃতি॥
যেখানে লাগে না দুঃখের তরঙ্গ বহেনা সুখের বায়ু,
কাল স্রোত বহে অনিবার তবু কমেনা সেখানে আয়ু;
প্রকৃতি পুরুষ অভেদ যেখানে অভেদ যেখানে জাতি,
যথা নাই ঋতু তিথি সংক্রমন বর্ষ মাস দিবা রাতি,
সাধন সমাধি বিহনে যেখানে বিরাজে নিত্য মুকতি॥
শব্দ লিঙ্গ সন্ধি প্রত্যয় বিহনে পদ সিদ্ধি যথা হয়,
সর্ব্বনাম সংজ্ঞা বিদ্যমানে যথা উপাধি কিছু না রয়;
ক্রিয়া বিনা যথা কারক প্রধান অথচ অব্যয় খ্যাতি,
ব্যাপক হইয়া সমান সেখানে কর্ম্ম অভাবে কৃতি,
যথা উপসর্গ বিসর্গ বিরল কেবল অনুস্বার প্রবল কহে শ্রুতি॥
অনন্ত হইয়া অদ্বৈত যেখানে যোগ বিয়োগ ভিন,
শরীর অভাবে স্বরূপ যেখানে স্বরূপে আরোপ হীন;
আঁখির বিহনে দেখা যায় যথা শুনা যায় বিনা শ্রুতি,
কর বিনা করা যায়হে গ্রহন চরণ বিহনে গতি,
যথা গেলে যায় দ্বিজ গোবিন্দের জনম-মরণ ভীতি॥

———:0:———

অন্তর্যাগ বা মানস পূজা।

দীক্ষা গ্রহণ করিয়া প্রতিদিনই ইষ্ট-দেবতার পূজাও করিতে হয়। ইহাতে ইষ্ট নিষ্ঠা ও ভক্তি বৃদ্ধি হইয়া ভগবানে তন্ময়তা জন্মে। কিন্তু এই পূজা পদ্ধতি মন্ত্র ও দেবতাভেদে ভিন্ন ভিন্ন, সুতরাং সর্ব্ব প্রকার দেবতার বাহ্য পূজা-পদ্ধতি লিপিবদ্ধ করা এই সামান্য প্রবন্ধে সাধ্যায়ত্ত নহে। আপন আপন কল্পোক্ত বিধানে সকলেই বাহ্য পূজা সম্পাদন করিবেন। অস্মদ্দেশে পটল গুরু শিষ্যকে বাহ্য পূজার পদ্ধতি প্রদান করেন। তদ্ভিন্ন পদ্ধতি গ্রন্থাদি-তেও পূজা-প্রণালী লিখিত আছে। অতএব আমরা বাহ্য পূজা সম্বন্ধে কিছু লিখিলামনা।

সর্ব্ববিধ বাহ্য পূজাতেই অন্তঃপূজার বিধান আছে অর্থাৎ বাহ্য পূজা করিতে হইলেই অন্তঃ-পূজাও করিতে হইবে। মানস পূজাই সর্ব্ব-প্রকার পূজা হইতে শ্রেষ্ঠ; একমাত্র মানস পূজাতেই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে। তবে সকলেই মানস পূজার অধিকারী নহে, কাজেই অগ্রে বাহ্য পূজার অনুষ্ঠান করিবে, বাহ্য-পূজার সঙ্গে ও মানস পূজা করিতে হয়। এই রূপে কিছু দিন বাহ্য পূজার অনুষ্ঠানে যখন অন্তঃ পূজা সুন্দর রূপ অভ্যস্ত হইবে, তখন আর বাহ্য পূজার কিছুমাত্র প্রয়োজন নাই; কেবল মানস পূজা করিলেই ইষ্টসিদ্ধি হইবে। যথা:—

অন্তঃপূজা মহেশানি বাহ্য কোটি ফলং লভেৎ।
সর্ব্ব পূজা ফলং দেবী প্রাপ্নোতি সাধকঃ প্রিয়ে।

ভূত শুদ্ধি তন্ত্র।

অর্থাৎ একবার কৃত অন্তঃপূজা কোটি-বাহ্য পূজার ফল প্রদান করে। একমাত্র বাহ্য (অন্তঃ) পূজাতেই সাধক সকল পূজার ফল লাভ করিতে পারিবেন। যেহেতু উপচারের প্রাচুর্য্য ব্যতীত বাহ্য পূজা নিস্ফলা হয়, সুতরাং অন্তঃ-পূজাধিকারীর পক্ষে বাহ্য পূজা বিড়ম্বনা মাত্র। তাই জগদ্‌গুরু যোগীশ্বর বলিয়াছেন,—

মহাসাপি মহাদেব্যৈ নৈবেদ্যং দীয়তে যদি।
যো নরোভক্তি সংযুক্তো দীর্ঘায়ুঃ সঃ সুখী ভবেৎ॥
মাল্যং পদ্ম সহস্রস্য মনসা যঃ প্রযচ্ছতি।
কল্প কোটি সহস্রানি কল্প কোটি শতানি চ।
স্থিতা দেবী পুরে শ্রীমান্ সার্ব্বভৌম ভবেৎ ক্ষিতৌ॥
মনসাপি মহাদেব্যৈ যস্তুকুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং।
স দক্ষিণে যমগৃহে নরকানি ন পশ্যতি॥
মনসাপি মহাদেব্যা যো ভক্ত্যা কুরুতে নতিং।
সোঽপি লোকান্ বিনির্জ্জিত দেবী লোকে মহীয়তে॥

গন্ধর্ব্ব তন্ত্র।

যে মনুষ্য ভক্তিযুক্ত হইয়া মহাদেবীকে মনঃকল্পিত নৈবেদ্য দ্বারা পূজা করে, সে দীর্ঘায়ু এবং সুখীহয়। যে ব্যক্তি মনঃকল্পিত সহস্রপদ্মের মাল্য দেবীকে প্রদান করে, সে শত-সহস্রকোটি কল্পকাল দেবীপুরে বাস করিয়া পৃথিবীর সার্ব্বভৌমত্ব প্রাপ্ত হয়। যে দেবীকে মানস প্রদক্ষিণ করে, সে যম গৃহে নরক দর্শন করেনা। যে ব্যক্তি ভক্তির সহিত দেবীকে মানস নমস্কার করে, সে সকল লোক জয় করিয়া দেবীলোকে গমন করে।

পাঠক! মানস পূজার শ্রেষ্ঠতা ও উপকারিতা বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন। তান্ত্রিক সাধক প্রতিদিন যথাবিধি একমাত্র

অন্তর্যাগ বা মানস পূজার অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্ব-সিদ্ধিলাভ করিতে পারিবেন। মানস পূজার ক্রম যথা :—

শুভ আসনে পূর্ব্বাস্য কিম্বা উত্তরাস্য হইয়া উপবেশন পূর্ব্বক স্ব-হৃদয়ে সুধাসমুদ্রের ধ্যান করিবে, এবং তন্মধ্যে সুবর্ণ বালুকাময়, বিকসিত কুসুমান্বিত, মন্দার ও পারিজাতাদি পুষ্প-বৃক্ষ পরিশোভিত, সর্ব্বদাই যে বৃক্ষের পুষ্প ও ফল জন্মে এবম্বিধ বৃক্ষযুক্ত রত্নদ্বীপ, যাহার চতুর্দ্দিক্ নানাবিধ কুসুম গন্ধে আমোদিত, যে স্থানে ভ্রমরকুল বিকশিত কসুমামোদে প্রহৃষ্ট, যে স্থান সুমধুর কোকিল-গানে প্রতি-ধ্বনিত, বিকশিত স্বর্গীয় সুবর্ণ পঙ্কজ সকল যাহার শোভাবর্দ্ধন করিতেছে এবং যে স্থান মনোহর বস্ত্র, মৌক্তিক মালা ও কুসুম মাল্যা-লঙ্কৃত তোরণ পরিশোভিত, এতাদৃশ রত্ন-দ্বীপের ধ্যান করিবে। তৎপরে সেই রত্ন দ্বীপাভ্যন্তরে চতুর্ব্বেদরূপ চতুঃশাখা বিশিষ্ট, সত্বাদি গুণত্রয় সমন্বিত পীত, কৃষ্ণ, শ্বেত, রক্ত, হরিৎ এবং বিচিত্র বর্ণের পুষ্পবিরাজিত, কোকিল ভ্রমরাদি পক্ষিগণ বিমণ্ডিত কল্পপাদপের ধ্যান করিবে। ঈদৃশ কল্পদ্রুমের ধ্যান করিয়া তদধোভাগে রত্ন বেদীকার ধ্যান করিবে। তদন্তর তদুপরিভাগে বালারুণের ন্যায় রক্তবর্ণ, রত্ননির্ম্মিত সোপানাবলীযুক্ত, ধ্বজযুক্ত চতুর্দ্বা-রান্বিত, নানা রত্নালঙ্কৃত, রত্ন নির্ম্মিত প্রাকার বেষ্টিত, স্ব স্ব স্থানস্থিত লোকপালগণ কর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, ক্রীড়াশীল—সিদ্ধ, চারণ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, মহোরগ, কিন্নর ও অপ্সরাগণ পরিব্যাপ্ত, নৃত্য এবং গীতবাদ্য নিরত সুর-সুন্দরিগণ যুক্ত, কিঙ্কিনী জালযুক্ত, পতাকালঙ্কৃত, মহামাণিক্য, বৈদূর্য্য ও রত্নময় চামরভূষিত, লম্বমান স্থূল মুক্তাফলালঙ্কৃত, চন্দন, অগুরু ও কস্তুরী দ্বারা বিলিপ্ত সুমহৎ রত্নমণ্ডপের ধ্যান করিয়া তন্মধ্যে মহামাণিক্য বেদিকার ধ্যান করিবে, এবং এতদ্বেদিকার অভ্যন্তরে প্রাতঃসূর্য্য-কিরণারুণ প্রভ, চতুষ্কোণ শোভিত ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাত্মক সিংহাসনের ধ্যান করিবে। অনন্তর উক্ত সিংহাসনে প্রসূন তুলিকান্যাস করিবে। তৎপর সঙ্কল্পোক্ত ক্রমে পীঠ পূজা করিয়া প্রেত পদ্মাসনে ইষ্ট-দেবতার ধ্যান করিবে। অনন্তর ইষ্টদেবতাকে রত্নপাদুকা প্রদান করিয়া তাঁহাকে স্নান মন্দিরে আনয়ন করিবে, এবং কর্পূর, অগুরু, কস্তুরী, মৃগমদ, গোরোচনা ও কুঙ্কুমাদি নানা গন্ধদ্রব্য সুবাসিত জলদ্বারা ইষ্টদেবীর সর্ব্ব শরীরোবর্ত্তন করিয়া তাহাতে সুগন্ধ তৈল লেপন করিবে। তৎপরে সহস্র কুম্ভ জলদ্বারা দেবীকে স্নান করাইয়া বস্ত্র দ্বারা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক বস্ত্র যুগল পরিধান করাইবে। পরে চিরুণীদ্বারা কেশসংস্কার করিয়া ললাটে তিলক, কেশ মধ্যে সিন্দূর, হস্তে হস্তীদন্ত বিনির্ম্মিত শঙ্খ, ললাটে কেয়ূর, কঙ্কণ ও বলয়, পাদপদ্মে নানা রত্ন বিনির্ম্মিত অঙ্গুরীয়ক ও নূপুর, নাসিকার অগ্র-ভাগে গজ মুক্তা, কর্ণে রত্ন নির্ম্মিত দুল, কণ্ঠে রত্নহার ও সুগন্ধ পুষ্পমালা প্রদান করিয়া সর্ব্বাঙ্গে গন্ধ চন্দন ও সিহ্লক (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) লেপন রিবে। উরঃস্থলে নানা কারু কার্য্যান্বিত সুবর্ণখচিত কুঞ্চুলী পরিধান করাইবে। এবং নিতম্বে রত্ন মেখলা প্রদান করিবে*।

*পঞ্চ উপাসকের মধ্যে প্রত্যেকেই আপন আপন ইষ্টদেবতার ধ্যানানুযায়ী আসন, বাহনাদি কল্পনা করিয়া লইবেন। আমরা এই প্রবন্ধে দেবীমূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াই সকল বিষয় লিপিবদ্ধ করিলাম।

অনন্তর সমাহিত চিত্তে দেবীর চিন্তা-করতঃ ভূতশুদ্ধি ও নানাবিধ ন্যাস করিয়া ষোড়শোপচারে হৃদয়স্থিতা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। উপবেশনার্থ রত্নসিংহাসন প্রদান করিয়া স্বাগত প্রশ্ন করিবে। পাদ্য পাদ-পদ্মে অর্পণ করিবে। মস্তকে অর্ঘ্যার্পণ এবং পরমামৃতরূপ আচমনীয় মুখ-সরোরুহে প্রদান করিবে। মধুপর্ক ও ত্রিধা আচমনীয় মুখে দান করিবে। সুবর্ণ পাত্রস্থ পরিষ্কৃত পরমান্ন, কপিলা গোর ঘৃতযুক্ত সব্যঞ্জনান্ন, সাগর তুল্য অমেয় মদ্য, পর্ব্বত প্রমাণ মাংস, রাশিকৃত মৎস্য, নানাবিধ ফল, সুবাসিত জল এবং কর্পূরাদি মসল্লাযুক্ত তাম্বুল প্রভৃতি চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় চতুর্ব্বিধ মানসোপচারদ্বারা দেবীর অর্চ্চনা করিবে। অনন্তর আবরণ দেবতার পূজা করিয়া জপ করিতে হয়।

প্রোক্ত মানসপূজা গুরোপদিষ্ট বিধান, তদ্ব্যতীত শাস্ত্রেও মানস-যাগের বিধান আছে। যথা :—

হৃৎপদ্মমাসনং দদ্যাৎ সহস্রারচ্যুতামৃতৈঃ।
পাদ্যং চরণয়োর্দদ্যাৎ মনস্ত্বর্ঘ্যং নিবেদয়েৎ॥
তেনামৃতেনাচমনীয়ং স্নানীয়ং তেন চ স্মৃতং।
আকাশতত্ত্বং বস্ত্রং স্যাৎ গন্ধঃ স্যাৎ গন্ধতত্ত্বকং॥
চিত্তং প্রকল্পয়েৎ পুষ্পং ধূপং প্রাণান্ প্রকল্পয়েৎ।
তেজস্তত্ত্বঞ্চ দীপার্থং নৈবেদ্যং স্যাৎ সুধাম্বুধিঃ॥
অনাহত ধ্বনির্ঘণ্টা বায়ুতত্ত্বঞ্চ চামরং।
সহস্রারং ভবেৎ ছত্রং শব্দতত্ত্বঞ্চ গীতকং।
নৃত্যমিন্দ্রিয় কর্ম্মানি চাঞ্চল্যং মনসস্তথা।
সুমেখলাং পদ্মমালাং পুষ্পং নানাবিধং তথা॥
অমায়াদৈর্ভাব পুষ্পৈরর্চ্চয়েদ্ ভাব গোচরাং।
অমায়ম্ অনহঙ্কারম্ অরাগম্ অমদং তথা॥
অমোহকম্ অদম্ভঞ্চ অদ্বেষাক্ষোভকৌ তথা।
অমাৎসর্য্যম্ অলোভঞ্চ দশপুষ্পং বিদুর্বুধাঃ॥
অহিংসা পরমং পুষ্পং পুষ্পম্ ইন্দ্রিয় নিগ্রহ।
দয়াপুষ্পং ক্ষমাপুষ্পং জ্ঞানপুষ্পঞ্চ পঞ্চমং॥
ইতিপঞ্চ দশৈর্ভাব পুষ্পৈঃ সংপূজয়েৎ শিবাং।
সুধাম্বুধিং মাংস শৈলং মৎস্য শৈলং তথৈব চ॥
মুদ্রারাশিং সুভক্তঞ্চ ঘৃতাক্তং পরমান্নকং।
কুলামৃতঞ্চ তৎপুষ্পং পঞ্চ তৎক্ষালনোদকং॥
কামক্রোধৌ ছাগ বাহৌ বলিং দত্বা প্রপূজয়েৎ।
স্বর্গে মর্ত্ত্যে চ পাতালে গগনে চ জলান্তরে॥
যদ্ যৎ প্রমেয়ং তৎসর্ব্বং নৈবেদ্যার্থং নিবেদয়েৎ।
পাতাল-ভূতল-ব্যোমচারিনো বিঘ্নকারিণঃ।
তাং স্তানপি বলিং দত্বা নির্দ্বন্দো জপমারভেৎ॥

সাধক আপনার হৃদ্‌পদ্মকে আসনরূপে কল্পনা করিয়া তাহাতে অভীষ্ট দেবতাকে বসাইবে। তৎপরে সহস্রার বিগলিত অমৃত-রূপে কল্পনা করিয়া তৎদ্বারা ইষ্ট দেবতার চরণ বিধৌত করিবে। মনকে অর্ঘ্যরূপে প্রদান করিবে। পূর্ব্বোক্ত সহস্রারামৃতকে আচমনীয় ও স্নানীয়, দেহস্থ আকাশ তত্ত্বকে বস্ত্র, পৃথিবীতত্ত্বকে গন্ধ, চিত্তকে পুষ্প, প্রাণকে ধূপ, তেজকে দীপ, সুধাসাগর নৈবেদ্য, অনা-হত ধ্বনি ঘণ্টা শব্দ, শব্দতত্ত্ব গীত, ইন্দ্রিয় চাপল্য নৃত্য, বায়ুতত্ত্ব চামর, সহস্রার পদ্ম ছত্র, হংস মন্ত্র—অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্বাস পাদুকা, পদ্মাকার নাড়ীচক্র পদ্মমালা,—অমায়, অনহঙ্কার, অরাগ, অমদ, অমোহ, অদম্ভ অদ্বেষ, অক্ষোভ, অমাৎসর্য্য এবং অলোভ— এই ভাবময় দশপুষ্প ও অহিংসা, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, জ্ঞান, দয়া এবং ক্ষমা, এই পঞ্চপুষ্প প্রদান করিবে। তৎপরে সাগর তুল্য সুধা (মদ্য) পর্ব্বত তুল্য মৎস্য ও মাংস, নানাবিধ সুভক্ষ্য মুদ্রা, এবং স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল, গগন ও জল, যে যে স্থানে যে যে প্রমেয় বিদ্যমান— সে সমুদয়কে নৈবেদ্য এবং কামকে ছাগ,

ক্রোধকে মহিষ ও বিঘ্নগণকে পৃথক্ পৃথক্ বলি প্রদান করিবে। অনন্তর জপ আরম্ভ করিবে। এই দ্বিবিধ অন্তর্যাগের মধ্যে মন পরিষ্কার রাখিয়া একচিত্তে যে কোন এক প্রকার করিলেই হয়। জপের প্রণালী যথা :—

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

বিগত ৭ই বৈশাখ শনিবার অক্ষয় তৃতীয়ার দিন অত্র শান্তি আশ্রমে। ৫ম বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় যথা-নিয়মে সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে শ্রীশ্রীগুরুপূজা, হোম, শাস্ত্র পাঠ এবং সমস্ত দিবস ব্যাপী শ্রীশ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। হাইলাকান্দি (কাছাড়) দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের সেক্রেটারী শ্রীযুক্তবাবু আনন্দ মোহন রায় উকিল মহাশয়ের নিকট বুভুক্ষু-পীড়িত নারায়ণগণের সহায়তা কল্পে ঐ দিন ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা প্রেরণ করা হয়।

ঐ তারিখে ঢাকা, মাণিক গঞ্জ ও বগুড়ার সেবক ও ভক্তগণ যথাযোগ্য উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, আমরা সংবাদ পাইয়াছি।

—:0:—

হাইলাকান্দি দুর্ভিক্ষ-ভাণ্ডারের কর্তৃপক্ষ আমাদিগকে জানাইয়াছেন যে, "আসামের মহামান্য নূতন চীফ্ কমিশনার শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার আর্কডেল্ আর্ল মহোদয় কাছাড়ের শ্রীযুক্ত ডেপুটী কমিশনার বাহাদুরকে দুর্ভিক্ষ সম্বন্ধে তদন্ত করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। যথারীতি তদন্ত ও হইয়াছে। আমরা আশা-করি সত্বরই আসাম গভর্ণমেণ্ট হইতে দুর্ভিক্ষ প্রতিকারের ব্যবস্থা হইবে।

আসামের মহামান্য গভর্ণমেণ্ট হাইলাকান্দির দুর্ভিক্ষ প্রতিকারে অগ্রসর হইয়াছেন শুনিয়া আমরা আনন্দিত হইলাম। কিন্তু তাই বলিয়া দেশের সু-সন্তানগণ নিরস্ত হইবেননা; রাজার কর্ত্তব্য রাজা করিবেন বলিয়া আপনাদের কর্ত্তব্যে অবহেলা করিবেননা। পূর্ব্বের ন্যায় উৎসাহে সেবকগণ অর্থ সংগ্রহ করিতে থাকুন। দাতাগণকে উৎসাহিত করিয়া—প্রবৃত্তি লওয়াইয়া হাইলাকান্দির উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দমোহন রায়ের নিকট অর্থপ্রেরণ করিতে থাকুন। তাঁহার নিষেধাজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত অর্থসংগ্রহে বিরত হইবেননা।

—:0:—

অত্র আশ্রমের সেবকগণ যথা সাধ্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন। আমরা শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের "যোগমায়া ভাণ্ডার" হইতে ৫০৲ টাকা এবং ব্রহ্মদেশ হইতে (টঙ্গু) সেবকগণের ভিক্ষা লব্ধ-শ্রীযুক্ত মন্মথ নাথ ভাদুড়ীর প্রেরিত ৫০৲ টাকা দুর্ভিক্ষ ভাণ্ডারের সেক্রেটারীর নিকট পাঠাইয়াছি। ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত পিযূষ কিরণ চক্রবর্ত্তীর ও অন্যান্যের সংগৃহিত ১০৲ টাকাও প্রেরিত হইয়াছে। দান-ধর্ম্ম গৌরবদৃপ্ত ভারতবাসী হিন্দুকে দান মাহাত্ম্য

বর্ণনা করিয়া বুভুক্ষুগণের সাহায্যার্থ উত্তেজিত করিতে যাওয়া নিতান্ত লজ্জাকর। কারণ এই দেশের লোক আত্মপ্রাণ বলি দিয়া পরকে রক্ষা করিতে অভ্যস্ত। আশাকরি, সকলেই শ্রদ্ধার সহিত যথাশক্তি দান করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নারায়ণগণের সাহায্যে কুণ্ঠিত হইবেননা। ঐ অর্থ অত্র আশ্রমের কর্ম্ম কর্ত্তার নিকট কিম্বা হাইলাকান্দির উকিল শ্রীযুক্ত আনন্দ মোহন রায় মহাশয়ের নিকট প্রেরণ করিবেন।

——:0:——

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনে এখনও ৪.৫টী অনাথ বালক বালিকার স্থান হইতে পারে। সুতরাং আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, যদি কাহারও সন্ধানে অনাথ বালক বা বালিকা থাকে, তবে অবশ্য তাহার সবিস্তার পরিচয় আমাকে পত্র দ্বারা জানাইবেন। আপন ব্যয়ে যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট কাল মাত্র পুত্র-কন্যাকে এখানে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছাকরেন, তবে এখনও ৪.৫ টী মেয়ে ৩।৪ টী ছেলের বন্দোবস্ত হইতে পারে। আর সাধারণে অনাথ বালক-বালিকার সন্ধান রাখিবেন।

দেশের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা জমি জমা অভাবে মজুরী করিয়া কষ্টে দিন যাপন করে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আসামে আমাদিগের নিকটে বাস করিতে সম্মত আছে, আমরা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি। বলা বাহুল্য স্বহস্তে যাহারা চাষ করিয়া খায়, তাহারা ভিন্ন অন্যের সুবিধা হইবেনা। কারণ চাকর রাখিয়া চাষ করা এখানে পোষাইবেনা। কৃষকগণের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

সহৃদয় পাঠকগণ! দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রচার করিয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিতে আশা করি কেহই ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। আপাততঃ ৮।১০ জন কৃষকের সুবিধা করিয়া দিতে পারিব। প্রয়োজন হইলে ২।৪ জনের হাল গরু ও গৃহাদির যোগাড় করিয়াও দিতে পারি। যদি কোন নিঃস্ব দরিদ্র কৃষক আসিতে উদ্যোগী হয়, স্থানীয় যে কোন ভদ্রলোক আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। দরিদ্র কৃষকগণের এই সামান্য উপকারটুকু করিতে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই কুণ্ঠিত হইবেন না। এসম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ইতি :—

পোঃ কোকিলামুখ।
শান্তি আশ্রম
(যোরহাট)

শ্রীস্বামী বোধানন্দ সরস্বতী।
"সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট"
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন।

বিজ্ঞাপন।

যোগীগুরু ও জ্ঞানী গুরু প্রণেতা—

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরহংস দেবের

তান্ত্রিক গুরু বা তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি।

বাহির হইয়াছে। এতদ্দেশে তন্ত্র মতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। সুতরাং এ পুস্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সূচীগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রথম খণ্ড—যুক্তিকল্প।

তন্ত্র শাস্ত্র, তন্ত্রোক্ত সাধনা, মকার তত্ত্ব, প্রথম তত্ত্ব, অন্যান্য তত্ত্ব, পঞ্চম তত্ত্ব, সপ্ত আচার ভাবত্রয়, তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ, শক্তি উপাসনা দেবী মূর্ত্তির তত্ত্ব এবং সাধনার ক্রম।

দ্বিতীয় খণ্ড—সাধন কল্প।

গুরুকরণ ও দীক্ষা পদ্ধতি, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম, অন্তর্যাগ বা মানস পূজা, মালা নির্ণয় ও জপের কৌশল, স্থান নির্ণয় ও জপের নিয়ম, জপ রহস্য ও সমর্পণ বিধি, মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্য, যোনিমুদ্রাযোগে জপ, অজপা জপের প্রণালী, শ্মশান ও চিতা সাধন, শব সাধন, শিবাভোগ ও কুলাচার কথন, রমণীকে জননীত্বে পরিণত, পঞ্চমকারে কালী সাধনা, চক্রানুষ্ঠান, মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ, তন্ত্রের ব্রহ্ম সাধন এবং তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি।

পরিশিষ্ট—(মাত্র জগদ্ধিতায়)

বিশেষ নিয়ম, যোগিনী সাধন, হনুমদ্দেবের বীর সাধন, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ, অদৃশ্য হইবার উপায়, পাদুকা সাধন, অনাবৃষ্টি হরণ, অগ্নি নিবারণ, সর্প বৃশ্চিকাদির বিষ হরণ, শূলরোগ প্রতিকার, সুখপ্রসব মন্ত্র, মৃতবৎসা দোষ শান্তি, বন্ধ্যা ও কাকবন্ধ্যা প্রতিকার, বালক সংস্কার, জ্বরাদি সর্ব্বরোগ শান্তি, আপদুদ্ধার, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া এবং উপসংহার।

৯৬ পেজী সুপার রয়েল ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থকারের হাপটোন চিত্র সহ মূল্য ১৸৹ এক টাকা বার আনা মাত্র।

যোগী-গুরু বা যোগ ও সাধন পদ্ধতি।

ইহাতে যোগের প্রাথমিক শিক্ষা, শারীরতত্ত্ব, নাড়ী ও বায়ুর বিবরণ, চক্রাদি ও [illegible] যোগের ব্যাখ্যা লিখিত হইয়াছে। সাধনকল্পে মনঃস্থির করিবার উপায়, কুণ্ডলিনী উত্থাপনের কৌশল, সুখসাধ্য ও সহজ করণীয় যোগোক্ত নানারূপ সাধনা মন্ত্রতত্ত্ব প্রভৃতি

অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয় লিখিত হইয়াছে। প্রত্যক্ষ সিদ্ধ শাস্ত্র স্বরোদয়োক্ত নানারূপ কৌশল বিনা ঔষধে রোগ আরোগ্য, সুস্থ ও নীরোগ দেহে দীর্ঘ জীবন—যৌবন লাভের উপায় প্রভৃতি গৃহস্থের নিত্য প্রয়োজনীয় বিষয় সকল বর্ণিত হইয়াছে। মূল্য ১।৹ দেড় টাকা মাত্র। ২য় সংস্করণে অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে।

জ্ঞানী-গুরু বা জ্ঞান ও সাধন পদ্ধতি।

এই গ্রন্থখানিকে যোগীগুরুর দ্বিতীয় খণ্ড বলা যাইতে পারে। ইহাতে হিন্দুর নিত্য নৈমিত্তিক সন্ধ্যাহ্নিক পূজা জপ প্রভৃতির দার্শনিক বিচার ও গুরুতত্ত্ব, হিন্দুধর্ম্ম ও দেবতা তত্ত্ব প্রভৃতির বিশদ ব্যাখ্যা প্রভৃতি গভীর গবেষণার সহিত লেখা হইয়াছে। আত্মতত্ত্ব, ব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি জ্ঞানের বিষয় ও বিচার, মুক্তি কি, মুক্তির উপায় প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। জ্ঞান বা মুক্তি লাভার্থ সাধনার জন্য যোগের উচ্চ উচ্চ স্তরের সাধনা প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। প্রকাণ্ড পুস্তক, সুপার রয়েল ১৬ পেজী ফর্ম্মার ৩০ ফর্ম্মা। গ্রন্থকারের চিত্র সহ মূল্য ২।৹ দুই টাকা চারি আনা মাত্র। প্রায় ফুরাইয়া আসিল, দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ হইয়াছে।

ব্রহ্মচর্য্য সাধন অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়মাবলী।

ইহাতে অনর্থক কতকগুলি বাক্যজাল বিস্তার করা হয় নাই। ব্রহ্মচর্য্য পালনের ধারাবাহিক নিয়মাবলী ও তাহার উপকারিতা বিবৃত হইয়াছে, এবং ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার (বীর্য্য ধারণের) কতকগুলি যোগোক্ত সাধনার প্রণালীও বর্ণিত হইয়াছে। যাহারা শিক্ষাভাবে ও সংসর্গদোষে ধাতুদৌর্ব্বল্য, স্বপ্নদোষ ও প্রমেহাদি রোগে আক্রান্ত হইয়াছে, তাহাদের জন্য স্বর শাস্ত্রোক্ত ও অবধৌতিক ঔষধের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। রোগী ভোগী প্রভৃতি সকল শ্রেণীর লোকের ব্রহ্মচর্য্য রক্ষার উপযোগী করিয়া এই পুস্তকখানি লিখিত হইয়াছে। মূল্য ।।৹ আনা মাত্র।

এই পুস্তক গুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ২২৬ নং নবাবপুর, ঢাকা—আশ্রম-সেবক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়ের নিকটে, চট্টগ্রাম আশুতোষ লাইব্রেরীতে এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যাইবে। কোন স্থানে না পাইলে নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

অত্র আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের হাপটোন ফটো এবং আর্য্য-দর্পণের পুরাতন সংখ্যাগুলিও এখানে পাওয়া যাইবে।

পোঃ কোকিলামুখ
শান্তি-আশ্রম (যোরহাট।)

শ্রীকুমার চিদানন্দ
কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"।

৫ম বর্ষ। ভাদ্র। ৫ম সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ।

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

:0:

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। } { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।০ আনা।

আর্য্য-দর্পণের নিয়মাবলী।

:0:

"আর্য্য-দর্পণ" প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বটে। সময় সময় তাহাতে তদানুসঙ্গিক বিষয়াদিও বিবৃত হইতে পারিবে।

সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের জন্যই আর্য্য-দর্পণের বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সহ ২৲ দুই টাকা, অগ্রিম দেয়। নমুনার প্রয়োজন হইলে।১০ সাড়ে চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইতে হইবে।

প্রতি মাসের প্রথমেই "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়া সেই মাস মধ্যে গ্রাহকগণের সমীপে প্রেরিত হইবে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা সেই সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী নহি।

গ্রাহকগণ পত্রাদি লেখার সময় বা মূল্য প্রেরণের সময় স্বীয় স্বীয় নম্বর লিখিয়া দিবেন। নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটী লিখিয়া দিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন যথাকালে কার্য্যাধ্যক্ষকে না জানাইলে, পত্রিকার অপ্রাপ্তি জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এক পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাক টিকেট্‌ পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা আর্য্য-দর্পণের উন্নতি ও স্থিতির অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ১ম বর্ষের ১ম, ২য়, ও ৩য় সংখ্যার মলাটে বিজ্ঞাপিত আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলী অবশ্য পাঠ করিবেন

শান্তি-আশ্রমের অস্থিতি ও উন্নতি কল্পে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা, কি এককালীন দান—যিনি যাহা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেন, তাহা যতই অল্প হউক না কেন, সাদরে গৃহীত ও আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা স্তম্ভে স্বীকৃত হইবে। "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিবেতন" সম্বন্ধেও এতদ্রূপ।

বিজ্ঞাপন দাতাগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

কেহ ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রকাশিত হইবেনা। কেন না কাহারও কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে কিম্বা কাহারও দোষ অন্বেষণ করিতে আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন। অনর্থক বাজে বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ করার অত্র পত্রিকায় স্থানাভাব।

ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অত্র পত্রিকায় সমালোচিত হয় না। সমাজের বা গ্রন্থকারের বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে গুণাংশ ব্যতীত অন্য বিষয় সমালোচনা বাহুল্য বিবেচনা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে বা মূল্য পাঠাইতে হইলে আমার নামে পাঠাইবেন।

আর্য্য-দর্পণ—কার্য্যালয়।
পোঃ কোকিলামুখ
শান্তি-আশ্রম, (যোরহাট।)

বিনীত—
শ্রীকুমার চিদানন্দ।
কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৫ম সংখ্যা। | ভাদ্র। | বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

অন্তর্যাগ বা মানস পূজা।

(চতুর্থ সখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

মানস জপের মালা পঞ্চাশৎবর্ণ। ইহার গাঁথিবার সূত্র শিব-শক্তি, আর গ্রন্থি কুণ্ডলিনী শক্তি এবং মেরু নাদ-বিন্দু। বর্ণময়ী এই মালা জপ করিবার প্রণালী এই যে,—প্রত্যেক বর্ণ-গুলিকে মন্ত্র ও বিন্দুযুক্ত করিয়া লইবে। যথা—কং বীজমন্ত্র কং। অকারাদি হকারান্ত বর্ণে অনুলোম ও হকারাদি অকারান্ত বর্ণে বিলোম—উভয়ের মিলনে একশত হয়। অ হইতে সমুদয় স্বরবর্ণ এবং ক হইতে সমুদয় ব্যঞ্জনবর্ণ একত্রে বর্ণ পঞ্চাশটী—একবার অ হইতে হ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ আবার হ হইতে অ পর্য্যন্ত পঞ্চাশ, এই এক শত। ক্ষ বর্ণ মেরু—অর্থাৎ মালা পরিবর্ত্তনের বা জপারম্ভের কিম্বা জপ সমাপ্তির সীমা বা সাক্ষী। তাহাতে মন্ত্র যোগ করিবেনা। ঐরূপ শত জপ ও অষ্টবর্গের আদি অং, কং, চং, টং, তং, পং, যং, শং, এই অষ্ট বর্ণে আটজপ,—এই সমুদয়ে একশত আটবার জপ হয়। সাধক ইচ্ছা করিলে এক হাজার আটবারও জপ করিতে পারেন। এই প্রকারে মানস পূজা করিয়া জপ সমর্পণান্তে প্রণাম করিবে;—

সর্ব্বান্তরাত্ম নিলয়ে স্বান্তর্জ্যোতিঃ স্বরূপিণি।
গৃহাণান্তর্জপং মাতরাদ্যে কালি নমোঽস্তুতে॥

তদনন্তর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই পঞ্চ-দেবতা দেবীরপর্য্যঙ্ক, উক্ত পর্য্যঙ্কে নানা পুষ্পবিনির্ম্মিত দুগ্ধফেননিভ শয্যা রচনা করিয়া তাহাতে দেবী সুখশয়ানা চিন্তা পূর্ব্বক দেবীর পাদ সেবন এবং চামর বীজন করিবে। তৎপর নৃত, গীত, এবং বাদ্যদ্বারা দেবীকে পরিতুষ্টা করিয়া পূজার সার্থকতার নিমিত্ত হোম করিবে।

অন্তর্হোম সদ্য সিদ্ধিপ্রদ,—যাহার অনুষ্ঠানে মনুষ্য চিন্ময়তা প্রাপ্ত হয়। আধার পদ্মে চিদগ্নিতে হোম করিবে। অন্তরাত্মা,

পরমাত্মা, জ্ঞানাত্মা এতদাত্ম-ত্রিত্রয়াত্মক, চতুস্কোণ আনন্দরূপ মেখলা ও বিন্দুরূপ ত্রিবলয় যুক্ত, নাদ-বিন্দুরূপ যোনিযুক্ত চিৎকুণ্ডের চিন্তা করিবে। এতৎ কুণ্ডের দক্ষিণে পিঙ্গলা, বাম ভাগে ইড়া এবং মধ্যে সুষুম্না নাড়ীর ধ্যান করিয়া ধর্ম্ম ও অধর্ম্মরূপ কল্পিত ঘৃত দ্বারা যথাবিধি হোম করিবে।

প্রথমে মূলমন্ত্র, তৎপরে-"নাভৌ চৈতন্য রূপাগ্নৌ হবিষা মনসা স্রুচা জ্ঞান প্রদীপিতে নিত্যমক্ষ বৃত্তির্জুহোম্যহং" এই মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, অনন্তর 'স্বাহা', এই মন্ত্রে প্রথমাহুতি দান করিবে।

এইরূপ প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে"ধর্ম্মা-ধর্ম্মৌ হবির্দীপ্তং আত্মাগ্নৌ মনসা স্রুচা, সুষুম্না বর্ত্মনা নিত্যং ব্রহ্মবৃত্তি জুহোম্যহং" এই মন্ত্র, তৎপর চতুর্থ্যন্ত দেবতারনাম, তৎপর 'স্বাহা', এই মন্ত্রে দ্বিতীয়াহুতি প্রদান করিবে।

তৎপর প্রথমে মূলমন্ত্র, পরে-"প্রকাশাকাশ হস্তাভ্যাং অবলম্ব্যাত্মনা স্রুচা, ধর্ম্মাধর্ম্ম কলা স্নেহ পূর্ণমগ্নৌ জুহোম্যহম্" এইমন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে 'স্বাহা', এইমন্ত্রে তৃতীয়াহুতি প্রদান করিবে।

অনন্তর মূলমন্ত্রের পর-"অন্তর্নিরন্তর নিরিন্ধন মেধমানে মায়ান্ধকার পরিপন্থিনি সম্বিদগ্নৌ, কাস্মিংশ্চিদদ্ভুত মরীচি বিকাশ ভুমৌ বিশ্বং জুহোমি বসুধাদি শিবাবসানম্" এইমন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে 'স্বাহা', এই মন্ত্রে চতুর্থাহুতি প্রদান করিবে।

তদনন্তর "ইদন্তু পাত্র ভরিতং মহত্তাপ-পরামৃতং পূর্ণাহুতিময়ে বহ্নৌ পূর্ণহোমং জুহোম্যহং" এই মন্ত্র, পরে চতুর্থ্যন্ত দেবতার নাম, তৎপরে 'স্বাহা', এই মন্ত্রে পূর্ণাহুতি প্রদান করিবে।*

এই প্রকারে অন্তর্যাগ, অর্থাৎ মানস পূজা জপ ও হোম করিলে দেহী ব্রহ্মময় হয়। কিন্তু যে পর্যন্ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ না হয়, সে পর্যন্ত বাহ্য পূজাও করিতে হইবে। যথা:—

বাহ্যপূজা প্রকর্ত্তব্যা গুরু বাক্যানুসারতঃ।
বহিঃ পূজা বিধাতব্যা যাবজ্ জ্ঞানং ন জায়তে॥

বামকেশ্বর তন্ত্র।

যত দিন প্রকৃত জ্ঞান না হয়, ততদিন গুরুরাজ্ঞানুরূপ বাহ্য পূজা করা কর্ত্তব্য। যোগিগণ এবং মুনিগণ কেবল মানস পূজাই করিয়া থাকেন, বাহ্য পূজা করেন না। কিন্তু গৃহী সাধক কেবল মানস পূজা দ্বারা সিদ্ধি

---

* পাঠকের অবগতিরজন্য হোম মন্ত্র কয়টীর বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইল। দেখুন মন্ত্র গুলি কিরূপ ভাব পূর্ণ ও হৃদয় গ্রাহী। ১ম মন্ত্র—আমার নাভিস্থিত চৈতন্য রূপ হুতাশন এখন জ্ঞান দ্বারা প্রদীপ্ত হইয়াছে। আমি মনোময় স্রুক দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম রূপ ঘৃতের সাথে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদয় আহুতি দিলাম।

২য় মন্ত্র—ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ ঘৃত দ্বারা সমুদ্দীপ্ত আত্মরূপ অগ্নিতে সুষুম্না পথদ্বারা মনোময় স্রুক সহকারে ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমুদয় আহুতি প্রদান করিলাম। ৩য় মন্ত্র—আমি প্রকাশ ও আকাশরূপ হস্তদ্বয় দ্বারা উন্মনীরূপ স্রুক সহকারে ধর্ম্মাধর্ম্ম ও স্নেহ বিকাশরূপ ঘৃতে আহুতি দান করিলাম। ৪র্থ মন্ত্র—যাহা হইতে অদ্ভুত দিব্য জ্যোতি প্রকাশ পাইতেছে, যিনি মায়ান্ধকার দূর করিয়া আমার অন্তরে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত ও প্রদীপ্ত রহিয়াছেন, সেই অব্যক্ত সম্বিৎ রূপ অগ্নিতে আমি বসুমতী হইতে শিব পর্য্যন্ত সমস্ত জগৎ ও সমুদয় মায়া প্রপঞ্চ আহুতি দিলাম। পূর্ণাহুতি মন্ত্র—আমার মনোময় পাত্র আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই তাপত্রয় রূপ ঘৃতে পরিপূরিত করিয়া পূর্ণাহুতি প্রদান পূর্ব্বক হোম শেষ করিলাম।

লাভ করিতে পারে না। এই হেতু তাহাদিগের বাহ্য ও মানস এই উভয়বিধ পূজা করা আবশ্যক।

এই খানে সাধককে আর একটী কথা মনে রাখিতে হইবে যে, পূজাকালে নিজ ক্রোড়ে বাম হস্তোপরি দক্ষিণ হস্ত রাখিয়া কার্য্য করিবে। স্ত্রী দেবতার ধ্যান কালে ইহার বিপরীত নিয়ম আচরণীয়। মানসিক জপের নিয়মটা কোন অভিজ্ঞ সাধকের নিকট একবার দেখিয়া লইতে পারিলে ভাল হয়। শাক্ত-বৈষ্ণবাদি পঞ্চোপাসকগণ মানস পূজা কালে পঞ্চদশবিধ ভাব পুষ্পদ্বারা ইষ্টদেবতার অর্চ্চনা করিবে। এই পর্য্যন্ত সাধারণের অধিকার। কেবল পূর্ণাভিষিক্ত শাক্ত ইহার পরের লিখিত উপচার দ্বারা পূজা করিতে পারিবে। আর মানসপূজা ও জপের পর হোম করা একান্ত কর্ত্তব্য। জপ ব্যতীত পূজা যেমন বিফলা, তেমন হোম না করিলেও সেই পূজায় কোন ফল প্রদান করে না। যথা :—

না জপ্তঃ সিধ্যতে মন্ত্রো না হুতশ্চ ফলপ্রদঃ।
বিভূতিঃঞাপ্নি কাম্যেন সর্ব্বসিদ্ধিঞ্চ বিন্দতি॥

হোম না করিলে মন্ত্র কোন ফল প্রদান করে না। হোম করিলে সর্ব্ববিধ সম্পত্তিলাভ ও সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধি হয়। সাধকগণ যথা-রীতি অন্তর্যাগের অনুষ্ঠান করিলে সর্ব্বসিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। অতএব অন্তর্যা-গাত্মিকা পূজা করা সকলেরই কর্ত্তব্য। এবং অন্তর্যাগ সর্ব্ব পূজোত্তমোত্তমা। যথা :—

"অন্তর্যাগাত্মিকা পূজা সর্ব্ব পূজোত্তমোত্তমা।"

—:0:—

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন স্থাপনোপলক্ষে উপহার।

শ্রী— কালীর পদাম্বুজে মজে মন যাঁর।
ম— হৎ ভাবেতে পূর্ণ হৃদয় তাঁহার॥
ত্— ম আদি গুণ ত্রয় বিহীন হইয়া
স্বা— র্থ, অর্থ, ব্যর্থ, জ্ঞানে আনন্দে ছাড়িয়া,
মী— মাংসা, দর্শন, শাস্ত্র করি পরিহার,
নি— য়ত আত্মার সহ করে সে বিহার।
গ— ন্ধ যথা রহে ফুলে কাষ্ঠেতে অনল।
মা— নসে বিরাজে তাঁর ব্রহ্মতেজ বল।
ন— হে সুখী নিজসুখে পরসুখ তরে,
ন্— শ্বর জীবন সেই তুচ্ছ জ্ঞান করে।
দ— য়ার আধার তাঁর হৃদয় কন্দর,

প— রের হিতের তরে কাঁদে নিরন্তর।
র— ত রহে নিশি দিন জ্ঞান বিতরণে,
ম— ঙ্গল হউক জীবে এই ভাব মনে।
হং— যং, রং, বং লং, তত্ত্ব জ্ঞানে,
স— মস্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মময় বলি জানে।
স— ম ভাব সরলতা বালক যেমন,
র— হিতে না পারে কর্ম্ম না করি কখন।
স্ব— ভাব দেবতা জিনি বিকার বিহীন
তী— ব্র বিষয়ের বিষে না হয় মলিন।

শ্রীমতী——দেবী।

——:0:——

পাগলের খেয়াল।*

২য় উচ্ছাস।

[১]

ধর্ম্ম কাহাকে বলে ? যাহা কর্ত্তব্য জ্ঞানে ধারণ করা যায়, তাহাই ধর্ম্ম। এই কর্ত্তব্য অর্থ কি ? সদ্ স্বার্থ সম্পাদনীয় ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞানাত্মক বাধ্যতা।

কর্ত্তব্যজ্ঞানে কাহাকে ধারণ করিতে হইবে ? যে শক্তিতে চন্দ্র, সূর্য্য, পৃথিবী, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু আছে সমস্তই ধৃত হইয়া অবিরাম কালের সাম্যস্রোতে ভাসিয়া স্রোতের অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কর্ম্মরূপে প্রকাশিত হয়; তাহাই ধারণ করিয়া আমাদিগকে বিকশিতাবস্থায় অবস্থান করিতে হইবে। এই সাম্য শক্তি ভূমা, সাম্য ও ভূমা বলিয়া ইহা সর্ব্বস্থানে সমান অবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। আমরা খণ্ডরূপে মানুষ হইয়া এক একটী স্থান ব্যাপিয়া বিকশিত হইতেছি। এই সাম্য অথচ ভূমা শক্তিটী দ্বারাই আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধি, অহংকার ইত্যাদির বিকাশ হইয়া থাকে। অহংকার ব্যক্তাবস্থায় কিঞ্চিৎ স্থূলরূপে প্রকাশিত হইলেই এই শক্তিটীর খণ্ডাংশের সাম্যতা রক্ষিত হইতে পারে না। শক্তিটীর অসাম্য অবস্থা উপস্থিত হইলেই, সাম্যাবস্থাকে অব্যক্তাবস্থায় রক্ষা করিয়া, অসাম্যাবস্থাকে পূর্ণরূপে বিকাশ করিতে আরম্ভ করে।

অসাম্যাবস্থায় আমাদের জ্ঞান বিশুদ্ধাবস্থায় থাকেনা সুতরাং দুষ্কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মাইয়া থাকে। এই প্রকার প্রবৃত্তি হইতে পাপের উদয় হয়, পাপ হইলেই দুঃখ, দুঃখ হইলেই তাহা দূর করনার্থে অসাম্যাবস্থাকে দূর করিয়া সাম্যাবস্থার আশ্রয় গ্রহন করিতে হয়। ইহাকে আশ্রয় করিলেই শান্তিলাভ হইয়া

*৩য় সংখ্যার প্রকাশিত অংশের সহিত মিল করিয়া পড়িবেন।

থাকে। এই প্রকার শান্তিময় অবস্থা প্রদানকারী শক্তির ব্যক্তাবস্থাকেই ধারণ করিতে হইবে এবং ইহাদ্বারাই উন্নতি লাভ করিয়া প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ করিতে হইবে। এই উন্নতিকর সত্য, নিত্য, ভূমা বিষয়টী লাভ করিতে যে কর্ত্তব্য বোধহয় তাহাই লৌকিক আচরণীয় ধর্ম্ম।

ধর্ম্মাচরণে অশুদ্ধজ্ঞান বিশুদ্ধ হইয়া রজঃ ও তমোগুণের বিকাশহেতু অসাম্যাবস্থা বিদূরিত হইয়া শান্তিময় সাম্যাবস্থা লাভ হইয়া থাকে। ঈদৃশ শান্তিময় অবস্থার বিকাশ হইতে আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ হয়। ক্রমে এই অবস্থাটী বিস্তৃতি লাভ করিয়া ভূমায় পরিণত হয় এবং আমিত্বকে ভূমায় লয় করিয়া থাকে। আমিত্ব ভূমায় লয় হইলেই শান্তি ও ভূমাবস্থা প্রাপ্ত হয়। এই ভূমা হইতে অনন্তে, অনন্ত হইতে নিত্যে, নিত্য হইতে সত্যে, সত্যহইতে ব্রহ্মে লয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মাচরণ দ্বারা নির্ম্মল হইলে এই প্রকারেই ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে।

চোরের চুরিকরা ধর্ম্মানুগত নয় কেন? একের বস্তু অন্যে বিনানুমতিতে লইয়া যায়, ইহা মনুষ্য সমাজে বাঞ্ছনীয় নয়। সুতরাং সামাজিক ধর্ম্মানুসারে ইহা অন্যায় কার্য্য। চোর লোভের বশবর্ত্তী হইয়া সামাজিক ধর্ম্মপ্রাচীর উলঙ্ঘন করতঃ শান্তি হরণ করে বলিয়া, পাপগ্রস্ত হয় এবং অশান্তি ভোগ করে। তাহা হইলে চোরের সদ্-স্বার্থ সম্পাদনীয় কর্ম্মাত্মিক জ্ঞান, মনুষ্য সমাজে ভ্রমাত্মক বলিয়া বিবেচিত হইল।

চোরের এই প্রকার ভ্রমজ্ঞানের কারণ কি? চোর লুব্ধ হইয়া, অসদ্-স্বার্থ সম্পাদনীয় কর্ম্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান প্রাপ্ত হয়, এবং ইহা তাহার নিকট ততদূর দূষণীয় বোধ হয়না বলিয়া তাহা করিতে সক্ষম হয়। তাই লোভশূন্য মনুষ্য সমাজে, ইহা চোরের ভ্রমাত্মক জ্ঞান বলিয়া পরিগণিত হয় এবং দোষণীয় হয়।

এইরূপ সামাজিক, শারীরিক, মানসিক, সাংসারিক ও আধ্যাত্মিক প্রভৃতি নানা প্রকার ধর্ম্ম আছে। যে এই সকল ধর্ম্ম প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করে, সে পাপগ্রস্ত হয় এবং নানাপ্রকার দুঃখভোগ করে।

শারীরিক ধর্ম্মপালনে বিমুখ-ব্যক্তি, যে নানা প্রকার রোগ ভোগ করে ইহা আমরা সর্ব্বদা দেখিতে পাই। এইরূপ মানসিক ধর্ম্ম রক্ষা করিতে না পারিলেও নানা প্রকার মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয়। সুতরাং যাবতীয় দুঃখ একমাত্র ধর্ম্ম প্রাচীর লঙ্ঘনের ফল*।

মনুষ্যের বিবেক থাকায় ধর্ম্মাধর্ম্ম বাছিয়া লইতে পারে। কিন্তু পশ্বাদি তাহা পারে না। তাই ইহাদের আহার, নিদ্রা, মৈথুন, ভয় ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্যও দৃষ্ট হয় না। ইহারা প্রকৃতি হইতে এই ধর্ম্ম চতুষ্টয় প্রাপ্ত হয় এবং সমস্ত জীবন ইহাদের অনুশীলনেই কাটাইয়া থাকে। মনুষ্যের জ্ঞান, পশু অপেক্ষা উচ্চ বলিয়া, সুখ দুঃখ ভালরূপ বুঝিতে পারে এবং শান্তির জন্য নানারূপ ধর্ম্মের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

আত্মা স্বাধীন, সচ্চিদানন্দ এবং সকলের আধার বুঝিতে পারিয়া, পরাশান্তি লাভ করিবার জন্য আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের সৃষ্টি হইয়াছে।

---

*দুঃখ সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইবে।

যে মূর্খব্যক্তি এই উচ্চ শান্তিপ্রদ ধর্ম্ম অনুশীলনে বিমুখ, তাহার ন্যায় হতভাগ্য আর কে? তাহার দুঃখ কখনও ঘুচেনা, অমৃত হাতে পাইয়াও স্বাদগ্রহনে সমর্থ হয় না।

ইহারা শান্তির জন্য চতুর্দ্দিকে ছুটাছুটি করিতে থাকে, পশ্বাদির ন্যায় ভোগ দ্বারা শান্তি-লাভ করিবার জন্য, নানা প্রকার দুষ্কার্য্যে রত হয়, এবং পরিণামে অতৃপ্ত বাসনানলে দগ্ধ হইয়া, ভীষণ যন্ত্রনা ভোগ করিতে করিতে, কালের ক্রোড়ে আশ্রয় লয়। ইহাতেও ইহাদের শান্তি নাই। সূক্ষ্ম দেহ প্রাপ্ত হইয়া দ্বিগুণ যন্ত্রনা ভোগ করিতে করিতে, পুনরায় স্থূলদেহ প্রাপ্ত হইয়া, সেই দুঃখ ভোগ করিতে থাকে*। এইরূপে বহুযোনি ভ্রমনান্তর বিবেক চৈতন্য হইলে, আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অনুশীলনের দ্বারা শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হয়। তাই ইহারা সমাজে বড় কৃপার পাত্র।

মনুষ্যজন্ম ভিন্ন অন্য কোন যোনি প্রাপ্ত হইয়া আধ্যাত্মিক ধর্ম্মের অনুশীলন হয়না বলিয়া, মনুষ্যজন্ম শ্রেষ্ঠ। প্রত্যেকেরই, একবার কর্ত্তব্য কি তাহা চিন্তাকরা উচিত এবং তদনুযায়ী কার্য্যাদি করা উচিত।

স্ব স্ব জ্ঞানানুসারে কর্ত্তব্য স্থিরীকৃত হয় বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন কর্ত্তব্য জ্ঞান লক্ষিত হয়। রাজার যাহা কর্ত্তব্য প্রজার তাহা নয়, জ্ঞানীর যাহা কর্ত্তব্য মূর্খের তাহা নয়, এইরূপ অবস্থা-ভেদে সমাজে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট আছে। জ্ঞানের উন্নতি দ্বারা, ক্রমে উচ্চতর কর্ত্তব্য সম্পন্ন অবস্থায় আরোহন করা যায়। এইরূপে ধর্ম্মের চরম ফল অর্থাৎ পরাশান্তি লাভ হইয়া থাকে।

(২)

এই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম কি?—যে কর্ত্তব্য সম্পাদনে আত্মা বিবিধ দুঃখ রূপ পাশ হইতে মুক্ত হইয়া নির্ব্বিকার, নিরঞ্জন, ভূমা অবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাই আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম।

জ্ঞান স্তরের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে এই শান্তিময় অবস্থা লাভ করিবার ভিন্ন ভিন্ন পথ নির্দ্ধারিত আছে। যিনি যাহার উপযোগী তিনি সেই পথই অবলম্বন করিয়া থাকেন।

যদিও পথ ভিন্ন, তথাপি মূল উদ্দেশ্য এক। সকল পথেরই চরমফল পরমানন্দ লাভ ভিন্ন অন্য কিছু নয়। অতএব সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণ করিতে যাওয়া, মূর্খতা ভিন্ন আর কিছু নয়। সরল বিশ্বাসে একটি পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলেই সেই পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে।

এই সরল বিশ্বাস কি?—যে বিশ্বাসে কোন প্রকার ভ্রম নাই বলিয়া বুঝি, কর্ত্তব্যের সহ যুক্ত হইলে যাহা নির্ম্মল অবস্থায় থাকে, অথচ স্বাভাবিক, তাহাই সরল বিশ্বাস, অর্থাৎ শুদ্ধজ্ঞান বিশেষ।

মন নির্ম্মল না হইলে, এই শুদ্ধ জ্ঞানলাভ হয়না। তাই চিত্তশুদ্ধির জন্য এত উপদেশ এবং ক্রিয়াকলাপ। চিত্ত শুদ্ধ হইলে কোন প্রকার দ্বিধা বোধ থাকে না, তখন যাহা করাযায়, তাহাই নির্ম্মল এবং আনন্দপ্রদ।

---

*সূক্ষ্ম শরীরে ভোগ বাসনা থাকা সত্ত্বেও স্থূল ইন্দ্রিয়াদি না থাকায়, স্থূল বিষয় ভোগ করিতে পারেনা। তাই অত্যধিক যন্ত্রনা পায়।

কি সাকারবাদী কি নিরাকারবাদী প্রত্যেকের জন্যই চিত্তশুদ্ধির ভিন্ন ভিন্ন উপায় নির্দ্ধারিত আছে। কর্ত্তব্য জ্ঞানে ধৈর্য্যের সহিত অনুশীলন করিলে, অল্পদিনেই ইহার আনন্দপ্রদ ফল বুঝিতে পারা যায়।

এই সাকারবাদ কি? স্বল্পজ্ঞানী ব্যক্তিগণ, পরমেশ্বরের অনন্তত্ব এবং নিরাকারত্ব ধারণা করিয়া উপাসনাদি করিতে সক্ষম নহ বলিয়া, স্ব স্ব জ্ঞানানুযায়ী প্রতিমাদি দ্বারা সীমাবদ্ধ করিয়া পূজার্চ্চনাদি করিয়া থাকে, ইহাই সাকারবাদ। সরল বিশ্বাসে এই অনুষ্ঠান দ্বারাই, তাহাদের পরমানন্দ লাভ হইয়া থাকে। বস্তুতঃ কি সাকার কি নিরাকারবাদী, প্রত্যেকেরই উদ্দেশ্য সেই একমাত্র পরমানন্দ লাভ করা। যদি তাহাই হয়, তবে সম্প্রদায় বিশেষকে আক্রমণকারিগণ মূর্খ ভিন্ন আর কিছুই নয়। এবম্প্রকার মূর্খগণকে উপদেশচ্ছলে বলা যায় যে, ঈশ্বর জলে, স্থলে, আকাশে সর্ব্বব্যাপকরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া থাকেন। তবে তাহার বুঝা উচিত, গগুরূপ পৃথিবীই তাঁহার সাকার মূর্ত্তি, আকাশই তাঁহার নিরাকারত্ব, তবে এত বাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন কি?

জ্ঞানোদয়ে ভূতাদির অস্তিত্ব লয় করিলে যে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধবিহীন চৈতন্য শক্তি উপলব্ধি হয়, তাহাই নিরাকার—নিরঞ্জন——ভূমা——ব্রহ্ম। এই অবস্থায় উপাসনাদি করাকে নিরাকার ব্রহ্মোপাসনা বলাহয়, ইহাই নিরাকারবাদ।

এই নিরাকার উপাসনার প্রণালী কিরূপ? ইহা দুই প্রকারে সম্পাদিত হইয়া থাকে। প্রথমে সগুণ পরে নির্গুণ ভাবে*। সগুণ অর্থাৎ ঈশ্বরে কোন প্রকার গুণ আরোপিত করিয়া মাতৃভাবে, প্রভুভাবে, সখাভাবে ইত্যাদি রুচি অনুসারে, সকাম এবং নিষ্কাম হইয়া, প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। ইহাই স্থূলরূপে সাধারণ হিন্দুদিগের কালী, দুর্গা, শ্রীকৃষ্ণ ইত্যাদি। আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্ম, মুসলমান ধর্ম্ম, খ্রীষ্ট ধর্ম্ম এই নিরাকার, সগুণ পথাবলম্বী।

যদিও স্থূল দৃষ্টিতে, ইহাদের উপাসনার পদ্ধতি দেখিয়া এবং উপদেশ শুনিয়া ঈশ্বর অসীম বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে তাহা হয়না। গুণ দ্বারা তাহার অসীমত্ব সসীম করিয়া উপাসনাদি করিয়া থাকে। সুতরাং এই অবস্থায় তিনি সূক্ষ্ম সীমাবদ্ধ।

কালী, দুর্গা প্রভৃতি মূর্ত্তির আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা করিলে, যে শক্তি সমূহের অস্তিত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়, তাহা ব্রহ্ম গুণ আরোপিত ভিন্ন অন্য কিছু নয়। তবে পার্থক্য এই যে, মূর্ত্তি প্রভৃতি স্থূল রূপে জড়পদার্থ দ্বারা নির্ম্মিত, আর উহা সূক্ষ্ম সীমাবিশিষ্ট কল্পনাপ্রসূত। উভয়েরই উদ্দেশ্য এক। কেবল জ্ঞানের বিভিন্নতা অনুসারে, ক্রিয়া কলাপের পার্থক্য মাত্র। নির্গুণ অবস্থার উপাসনা সম্ভবে না। একমাত্র সেই হংস জ্ঞানী-যোগী সেই অবস্থার উপযুক্ত এবং উপলব্ধি করিতে সক্ষম।

ঐশ্বর্য্যাদি কামনা করিয়া তাহা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে ঈশ্বরের উপাসনাদি করাকে সকাম উপাসনা কহে। তিনি কল্পতরু বিশেষ, একান্তমনে

---

* নির্গুণ অবস্থায় উপাসনা সম্ভবেনা।

তাঁহার নিকট যাহা যাচ্ঞা করাযায়, তিনি তাহাই প্রদান করিয়া থাকেন। ঐশ্বর্য্যাদি যাচ্ঞা করিয়া, সকাম উপাসক নিজকে সংসার কারাগারে, দৃঢ়রূপে আবদ্ধ করা ভিন্ন আর কিছুই করিতে সক্ষম হয়না। সুতরাং সকাম উপাসনা একমাত্র বন্ধনের কারণ ভিন্ন আর কিছুই নয়। তবে জ্ঞান, ভক্তি ইত্যাদি যাচ্ঞাকরা ভাল, যেহেতু ইহা দ্বারা কালে উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হওয়া যায়।

আমি সুখ চাহিনা, দুঃখ চাহিনা, স্বর্গ চাহিনা. নরক চাহিনা, এমন কি মুক্তিও চাহিনা এইরূপ ভাবে ঈশ্বরে লয় হওয়াকে নিষ্কাম ভাব কহে। এই অবস্থায় কোন অভাব বোধহয়না, তখন সাধক স্বয়ংই অখণ্ড, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মরূপে অবস্থান করিতে সক্ষম হয়।

(৩)

নির্গুণ অবস্থা উপলব্ধি করিবার উপায়কি? চিত্তশুদ্ধি দ্বারা নিষ্কাম ভাবাপন্ন হইলে, নিজকে ব্রহ্মরূপে চিন্তাকরিয়া, স্থূল দেহকে আকাশে লয় করিতে হয় (অর্থাৎ আমার কোন দেহনাই দেহস্থান যেন আকাশে পূর্ণ এবং অখণ্ডরূপে মহাকাশে লয় হইল) লয় হইলেই বুঝা যায়, ইচ্ছাময় চৈতন্য অখণ্ডরূপে বর্ত্তমান আছেন। তখন আকাশ যে চৈতন্যের ইচ্ছায় প্রকাশিত ইহা তখন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। ইহার পর যেন ধীরে ধীরে তাঁহার এই ইচ্ছার অস্তিত্ব লয় হইয়া যায়। তখন সমাধিস্থ হইয়া পঞ্চজ্ঞানের লয় করিয়া যুক্ত হইতে হয়। ইহার পর আর কোন জ্ঞান থাকেনা। সমাধি-ভঙ্গে বুঝাযায় আমিই সে অর্থাৎ ব্রহ্ম, কিছুই করিনা, কিছুরই আবশ্যক নাই, নির্ম্মল, ভূমা চৈতন্য মাত্র, ইহাই নির্গুণ ব্রহ্ম। এই বিষয়টী উপলব্ধি ভিন্ন বুঝান যায় না, ইহা প্রকাশের ভাষা আছে কি না জানি না। তবে বড় আনন্দ লাভ হইয়া থাকে। মোটা-মোটি এই একটি পথ বুঝি তাই লিখিলাম, বস্তুতঃ উপলব্ধি ভিন্ন বুঝা যায় না। যে কখনও চিনির স্বাদ গ্রহণ করে নাই তাহাকে যেমন মিষ্টত্ব বুঝান যায় না, কেবল বলা যায় একটু আস্বাদ করিয়া দেখ, ইহাও সেইরূপ।

এই আনন্দময় অবস্থা লাভের পথ, হিন্দু ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মে দেখা যায় না, অথচ এই ধর্ম্মেই অধিকারী ভেদে প্রতিমাদি দ্বারা পূজা করিবার বিধান রহিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম সর্ব্বপ্রকার অধিকারীকেই আশ্রয় দিতে সক্ষম, তাই বুঝি ইহাকে সনাতন বলিয়া থাকে। সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখা যায় কি ব্রাহ্ম ধর্ম্ম—কি খৃষ্টধর্ম্ম—কি মুসলমান ধর্ম্ম, সকল ধর্ম্মই যেন এই সনাতন ধর্ম্মের অঙ্গ বিশেষ। আমরা এমনি মূর্খ যে হিন্দুধর্ম্মের ভান করিয়া অন্যকে আক্রমণ করিতে একটু লজ্জা বোধ করি না।

যদি পাগলকে একটু স্নেহকর, যদি পাগলের কথা একটু শুন, তবে বলি, মনুষ্য জন্ম বড় দুর্লভ, এই অমূল্য ধন হারাইলে পুনঃ লাভ করা যায় কি না সন্দেহ। বাদ বিসম্বাদ ভুলিয়া যাও, সরল বিশ্বাসে যাহা ভাল বুঝ তাহার একটা ধরিয়া, সেই বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ধ্যানস্থ হও, দেখিবে প্রকৃত সত্যে আসিয়া পৌছিয়াছ। তখন বুঝিবে আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম অনুশীলনে

কি সুখ, কি শান্তি, কি আনন্দ। তাই পুনঃ বলি আত্মচিন্তা করিতে থাক, চিন্তা করিতে করিতে দেখিবে প্রকৃত সত্যে আসিয়া পৌছিয়াছ। কে যেন গাহিয়াছিল—।

অস্ত্রসহ অস্ত্রের ঘর্ষণে বাহিরায়,
দীপ্তি অনলের।
চিন্তা সহ চিন্তার সংগ্রামে,
বাহিরায় স্ফুলিঙ্গ সত্যের।

কস্যচিৎ—পাগলস্য।

—:0:—

উপদেশ-সংগ্রহ।

(তৃতীয় সংখ্যায় পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

২১। নির্ভরই একমাত্র শান্তি। এমনই মনুষ্যের দুর্ভাগ্য যে কিছুতেই নির্ভর হয়না। ঘিরে-ঘুরে নানা কষ্ট পেয়ে কিছুই করিতে পারে না।

২২। বন্ধের মধ্যেও মুক্ত ভাব আছে। যতক্ষণ সুখ-দুঃখ বোধ, সুখ-দুঃখ বন্ধন। যদি সুখ দুঃখ বোধ না থাকে, সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে থাকিতে পারে তবেই মুক্ত।

২৩। যোগ-তন্দ্রার লক্ষণঃ— (১) নাম করিতে করিতে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়া রহিত হইয়া নিদ্রার ন্যায় হইবে। (২) নিদ্রাভাব আসিলে একবার ভাষায় মধ্যে মধ্যে কোন কথা শুনা যাইবে। (৩) ভবিষ্যৎ অবস্থার দর্শন স্বপ্নবৎ হইবে। শরীরে কোন জ্ঞান থাকিবেনা কিন্তু ভিতরে জ্ঞান থাকিবে। সেই রূপ অবস্থায় একরূপ ভাষা শুনা যায়।

২৪। "ভজন কর" "ভোজন ছাড়" কাম কমিয়া যাইবে। যদি যায়, তখন শারীরিক যন্ত্রনা এত অধিক হবে যে তাহা সহ্য করা কঠিন। মেরুদণ্ড যেন করাতে কাটে।

২৫। ঐশ্বর্য্যভাবের উপাসক শাক্ত, মাধুর্য্য ভাবের উপাসক বৈষ্ণব।

২৬। আসন স্থির হইলেই সমস্ত হইল।

২৭। গীতার উপদেশ অতি সুন্দর প্রথম কর্ম্ম। এ প্রবৃত্তি অনুযায়ী কর্ম্ম করিতে করিতে বিবেক-বৈরাগ্য সময়ে সময়ে উদয় হয়: তখন নিষ্কাম কর্ম্ম করিতে ইচ্ছা হয়। নিষ্কাম কর্ম্ম করিলে কর্ম্ম শেষ হয়। কিন্তু বাসনা থাকে। কর্ম্ম শেষ হইলে বিষয়-কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্তি হয়না। তখন ভগবৎ শ্রবণ-কীর্ত্তন প্রভৃতি সাধন ভজনে মতি হয়। করিতে করিতে ভক্তির প্রকাশ। ভক্তিতে হৃদয় ব্যাকুল হইলে বালকবৎ, উন্মাদবৎ পিশাচবৎ অবস্থা, পরে দর্শন। "ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিঃ"

২৮। ব্রহ্মজ্ঞানে পূজায় সমস্ত তত্ত্ব লাভ হয়। দেবজ্ঞানে পূজায় সেই দেবতার যতটুকু ক্ষমতা তাই লাভ হয়।

২৯। আনন্দ, যদি কাম না থাকে। "রসো বৈসঃ"।

৩০। বিধির মধ্য দিয়া যাইতে যাইতেই আনন্দ ধামে যাওয়া যায়।

৩১। কাম ছাড়িব ক্রোধ ছাড়িব লোকে সাধু বলিবে, এ অভিমান সকলের অপেক্ষা শত্রু।

৩২। শ্বাস-প্রশ্বাসে নাম জপ করাই পরম সাধন।

৩৩। মায়া কি? কামনা। সত্ত্ব, রজঃ তম এই তিন গুণই মায়া হইতে উৎপন্ন। যত দিন ত্রিগুণ থাকিবে কাম তাহার উপর আধিপত্য করিবে। এজন্য ত্রিগুণাত্মক ত্রিদেব হইতে সিদ্ধ-যোগিগণ অনায়াসে কামকে নষ্ট করেন।

৩৪। কর্ম্ম শেষ হইলে বিশ্বাসের রাজ্য।

৩৫। পথে চলিলে ক্রমে দেখা যায় যে গম্য স্থানের নিকটে যাইতেছি।

৩৬। প্রিয় কার্য্য অর্থ এই যে, তাঁহার সুখে সুখী হওয়া, আত্ম-সুখ ভুলে যাওয়া।

৩৭। অর্জ্জুন বলিলেন "যুদ্ধ করিবনা"। উত্তর—"তোমার প্রকৃতি যুদ্ধ করাইবে"।

৩৮। ভগবানের ইচ্ছাই সমস্ত। প্রারব্ধ কেবল কথা।

৩৯। লোকের প্রশংসা সরল হৃদয়ে করিলে ঈশ্বরোপাসনার কার্য্য হয়। গুণ কীর্ত্তন করিলে নিজের পাপ তাপ পলায়ন করে, শান্তি, আনন্দ আগমন করে নিন্দা করিলে নিজের সদ্গুণ নষ্ট হইয়া নরক ভোগ হয়।

৪০। কোন বস্তুর দ্বারা হয়না, কেবল ভগবৎ নামই সমস্ত ক্রিয়ার মূল। মাদক বস্তু দ্বারা ক্রিয়া করা নিষেধ। নাম শ্রেষ্ঠ মাদক।

৪১। কাম নষ্ট হউক একথা ঠিক না; কাম থাকুক কিন্তু ত্রিগুণাতীত হইয়া থাকুক। এই কামই উপাসনা ভজন যা কিছু। তখনই ইহার নাম প্রেম।

৪২। কলিতে দান ও নাম জপ মাঠে পথে যেতে হাতে শক্ত ছড়ি। রাত্রিতে অন্ধকারে লণ্ঠন সঙ্গে।

৪৩। দান সমস্ত জীবে দয়া। কিছু প্রদানই দান। নাম কীর্ত্তন।

৪৪। বেদ শব্দ ব্রহ্ম। পরমাত্মা পর-ব্রহ্ম।

৪৫। চতুর্দ্বার অর্থাৎ হস্ত, বাক্, জঠর ও উপস্থ রক্ষা করা উচিত। যাহার এই চারিদ্বার রক্ষিত না হয় তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম বিফল হয়।

৪৬। ক্রোধ পূর্ব্বক করিলে শাসনের ফল হয়না। ধীর ভাবে বিচারকের ন্যায় বালকদের শাসন করা প্রয়োজন। তাহাদের বিরুদ্ধে কিছু শুনিলে অনুসন্ধান না করিয়া বিশ্বাস করা উচিত নহে।

৪৭। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ এই ত্রিবিধ দেহেতেই ক্ষুধা তৃষ্ণা আছে। স্থূল দেহে ক্ষুধা তৃষ্ণা হইলে, স্থূল দেহ স্বয়ং গ্রহন করেন। উত্তম পদার্থ হইলে প্রতি গ্রাসেই তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে সূক্ষ্ম দেহে কেবল আহার্য্য বস্তু দর্শন মাত্রে তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হইয়া থাকে কারণ শরীরে শরীর নিজে কিছু করিতে পারে না কোনও ব্রহ্মবিদ্ ব্রাহ্মণ যদি খাদ্য বস্তু দ্বারা স্বীয় জঠরাগ্নিতে হোম করেন তদ্দারা পরলোকবাসীর কারণ দেহের তৃপ্তি, ক্ষুধা নিবৃত্তি ও পুষ্টি হয়। এই জন্যই শ্রাদ্ধ-পাত্র, ঘৃত, পায়স ব্রাহ্মণকে দিবার প্রথা হয়েছে। (ক্রমশঃ)।

শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়।

—:0:—

মৃত্যু-চিন্তা।

আমরা "মৃত্যু" শব্দটী শুনিলে শিহরিয়া উঠি কেন? বস্তুতঃই কি মৃত্যু ভয়প্রদ? আমরা ত প্রতি শ্বাসে শ্বাসে, প্রতি পলে পলে, মৃত্যুর ভিতর দিয়া অনন্তের দিকে অগ্রসর হইতেছি, মৃত্যুতে কিছুরই ধ্বংশ হয়না, ইহা শুধু অবস্থার একটী পরিবর্ত্তন মাত্র; অদ্য যে বালক, দুদিন পর সে যুবক, আবার যুবক বৃদ্ধে, বৃদ্ধ পুনরায় বালকে পরিণত হয়; মৃত্যুতে পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায়, আর আত্মা দেহান্তর আশ্রয় গ্রহন করেন মাত্র; আত্মা নিত্য, পুরাণ, শাশ্বত ও অব্যয় ইহার কিছুতেই বিনাশ নাই; তাই গীতায় শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেনঃ—

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥

গীতা। ২।১৩।

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্নাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥

গীতা। ২ অঃ, ২২।২৩।২৪।২৫।

মৃত্যু জগৎপিতার সৃষ্টি প্রবাহ বজায় রাখিবার অপূর্ব্ব কৌশল, মৃত্যু আছে বলিয়াই, সৃষ্টি প্রবাহ অক্ষুণ্ণভাবে চলিতেছে; যদি ক্ষণেকের জন্য মৃত্যু ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়, তবে সৃষ্টি রাজ্যে যে কি এক অভাবনীয় বিপর্য্যয়কাণ্ড উপস্থিত হয়, তাহা আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্রবুদ্ধি মানবের ধারণার অতীত। মৃত্যু আছে বলিয়াই প্রকৃতির সৌন্দর্য্য রক্ষা হইতেছে, এবং বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতার অনন্ত মহিমার মাধুর্য্য-বৃদ্ধি পাইতেছে। আমরা অজ্ঞানান্ধ মায়ামুগ্ধজীব, তাঁহার অনন্ত ক্রিয়াকৌশলের দোষ ধরিতে গিয়া আমাদেরই অজ্ঞানতার পরিচয় দেই মাত্র, তাঁহার সৃষ্ট জগতে নিষ্প্রয়োজনীয় কিছুই নাই, সমস্তই জীবজগতের কোন না কোন উপকারে আসিতেছে।

মৃত্যুর অন্তরালে উন্নতি, মৃত্যুর অন্তরালে সৌন্দর্য্য, মৃত্যুর অন্তরালে মাধুর্য্য অবস্থিতি করিতেছে; মৃত্যু মর জগতে অমরত্বের পথ-প্রদর্শক। একটী ক্ষুদ্রতম জীবাণু মাতৃ-গর্ভে নিহিত হইয়া, মৃত্যুরকোলে আশ্রয় গ্রহন করতঃ সময়ে অসামান্য ধীসম্পন্ন, প্রভূত শক্তিশালী, সর্ব্বলোক-পূজিত মণিষীতে পরিণত হইতেছে। একটী ক্ষুদ্র বটবৃক্ষের বীজ ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া মৃত্যুর অঙ্কে শয়ন করতঃ প্রকাণ্ড বট বৃক্ষে পরিণত হইতেছে; একটী সামান্য ফুলের বীজ মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহন করিয়া অসংখ্য ফুল ও ফলের মাতা হইয়া জগৎকে মোহিত করতঃ স্রষ্টার অপার সৃষ্টি কৌশলের মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মৃত্যুর কৃপায় সামান্য বালুকাকণা, অভ্রভেদী পর্ব্বত শিখরে পরিণত হইতেছে; ধূলিমুষ্টি ভোগবিলাসীর বিলাসের উপকরণ, নয়নানন্দকর ও চিত্ত-মুগ্ধকর বিচিত্র সৌধ মালায় রূপান্তরিত হইতেছে। তাহাতেই দেখাযায় মৃত্যু আছে বলিয়াই সৃষ্টির উৎকর্ষ বৃদ্ধি পাইতেছে, বীজ বৃক্ষে পরিণত হইতেছে, বৃক্ষ ফুলে, ফুল ফলে,

ফল অসংখ্য বীজে, বীজ আবার অসংখ্য বৃক্ষে পরিবর্ত্তিত হইয়া সৃষ্টি প্রবাহ চক্রবৎ আবর্ত্তিত হইতেছে। জগৎ সদা পরিবর্ত্তনশীল, মৃত্যু দ্বারাই সেই পরিবর্ত্তন ক্রিয়া সংসাধিত হইতেছে।

মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যু ধর্ম্মপথের প্রবর্ত্তক। মৃত্যুচিন্তা বা মৃত্যু আছে বলিয়াই আমরা সময় সময় কত পাপক্রিয়া হইতে বিরত হই, পাপী মৃত্যুমুখে পতিত হওয়াতে তাহার পাপজীবনের পাপস্রোতের অবসান হইতেছে; যেমন কর্দ্দমাবৃত লৌহ চুম্বকের অতি কাছে থাকিয়াও চুম্বক কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইতে পারে না কিন্তু পুনঃ পুনঃ বৃষ্টিজলে ধৌত হইয়া লৌহ পরিষ্কৃত হইলে চুম্বক অতি সহজেই তাহাকে আপন ক্রোড়ে টানিয়া লয়, সেইরূপ যদি ও ভগবান্ আমাদের অতি নিকটবর্ত্তী, তবুও আমাদের মোহমায়াচ্ছন্ন পঙ্কিল আত্মা কিছুতেই তাঁহার সহিত মিশিতে পারিতেছেনা। কিন্তু পুনঃ পুনঃ মৃত্যু দ্বারা কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন হইলে অর্থাৎ আমাদের মলিনতা কাটিয়া চিত্ত শুদ্ধ হইলে, ভগবান্ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়াই আমাদিগকে তাঁহার শান্তি-ময় ক্রোড়ে চুম্বকবৎ আকর্ষণ করিয়া লন। মৃত্যুই কর্ম্ম-বন্ধন ছিন্ন করিবার উপায়। যেমন নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পন্ন হইলে প্রত্যেকে আপন আপন কর্ম্মক্ষেত্র হইতে সরিয়া পড়েন, সেইরূপে প্রত্যেককেই এই সংসার রূপ কর্ম্মক্ষেত্রে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম সম্পনান্তে মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে আশ্রয় লইতে হইবে। সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান্ যাহার যত নিকটবর্ত্তী অর্থাৎ যাহার কর্ম্ম যত কম মৃত্যুও তাহার তত নিকটবর্ত্তী; মৃত্যুই ভগবৎ লাভের দ্বার স্বরূপ।

পাপীই মৃত্যুর ভয়ে সর্ব্বদা ভীত, কোন অশুভ মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া তাহাকে গ্রাস করিবে এই ভয়ে সে সর্ব্বদা চকিত, সন্ত্রস্ত, ও ভীত থাকে, কিছুতেই মনে শান্তি পায়না; কিন্তু যাঁহারা ধার্ম্মিক, যাঁহারা প্রেমিক, তাঁহারা সর্ব্বদাই মৃত্যুর শান্তিময় ক্রোড়ে স্থান পাইবার জন্য লালায়িত; মৃত্যু তাঁহাদের শত্রু নয়, মৃত্যু তাহাদের মিত্র। তাঁহারা জানেন মৃত্যুর অন্তরালে সুখ, শান্তি, ঐশ্বর্য্য বিরাজ করিতেছে; তাঁহারা জানেন ছায়া যেমন কায়ার অনুগামিনী, তদ্রূপ মৃত্যুও জন্মের অনুগামী; জন্ম মৃত্যু ওতপ্রোত ভাবে গ্রথিত; তাহা বুঝাইবার জন্য ভারতের আর্য্য ঋষিগণ চিত্রপটে মহাকালের ক্রোড়ে জগজ্জননী প্রকৃতি সতীকে বসাইয়াছেন। স্থিরচিত্তে চিন্তা করিয়া দেখুন ঐ চিত্রপটের ভাব কত উচ্চ, কত মধুর! যাঁহারা ভগবৎ বিশ্বাসী তাঁহারা মৃত্যুর ভ্রুভঙ্গীতে কখনও ভীত হ'ন না। তাই কবি বলিয়াছেন:—

"ওহে মৃত্যু তুমি মোরে কি দেখাও ভয়,
ও ভয়ে কম্পিত নয় আমার হৃদয়
যাহাদের ভোগাসক্ত অবিবেকী মন
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ অনুক্ষণ
বিকট ভ্রুভঙ্গি মাখা বদন তোমার।
হেরিলে তাদের হয় ভয়ের সঞ্চার"॥

মৃত্যুচিন্তা যে ধর্ম্মপথের প্রবর্ত্তক তাহার একটী গল্প বলিতেছি;—এই দেশে এক রাজা ছিলেন; কোন সময়ে এক সন্ন্যাসীর সহিত রাজার সাক্ষাৎ হইয়াছিল, সন্ন্যাসী ভূত-ভবিষ্যৎবেত্তা ছিলেন এবং তাঁহার অন্যান্য অলৌকিক শক্তিও ছিল, রাজা সন্ন্যাসীর গুণগ্রামে মোহিত হইয়া তাঁহাকে রাজধানীতে

অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন; সন্ন্যাসী রাজার আগ্রহাতিশয্যে রাজবাটীর সন্নিকটস্থ শ্মশানে অবস্থিতি করিতে স্বীকৃত হইলেন। সন্ন্যাসী প্রত্যহ প্রাতে ও বিকালে রাজ-সকাশে উপস্থিত হইয়া রাজাকে রাজ্যসংক্রান্ত যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন, তাহার মন্ত্রনায় অনিষ্ট না হইয়া বরং দিন দিন নানা বিষয়ে রাজ্যের উন্নতি হইতে লাগিল। সন্ন্যাসী প্রত্যহ বিকালে একতোলা পরিমাণ মোদক সঙ্গে আনিতেন, তাহার সুচ্যগ্র প্রমাণ মোদক রাজাকে দিয়া অবশিষ্টটুকু নিজে খাইতেন; ঐ ঔষধের গুণে, রাজা প্রত্যহ বহু রমণীতে উপগত হইয়া ভোগসুখে মত্ত থাকিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর কৃপায় এত অত্যাচার সত্বেও ঐ ঔষধে তাহার শারীরিক শক্তির কোন হানি কিম্বা কোন ব্যাধি হয় নাই।

এই রূপে কিছুদিন গত হইলে মন্ত্রী দেখিলেন যে, রাজা পূর্ব্বের মত তাহাকে আর আদর কিম্বা তাহার পরামর্শ গ্রহন করেন না। সন্ন্যাসীই সর্ব্বেসর্ব্বা;—তাই, মন্ত্রী কিরূপে সন্ন্যাসী ঠাকুরকে জব্দ করিবেন, তাহার উপায় খুঁজিতে লাগিলেন; নগরে একটী যুবতী সুন্দরী বারবনিতা ছিল, মন্ত্রী তাহাকে অর্থদ্বারা বশীভূত করিয়া তাহার শরণাপন্ন হইলেন।

এক দিন বিকালে রাজবাটী হইতে প্রত্যাগমন কালীন ঐ বারবনিতা আপন দাসীদ্বারা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে তাহার আবাসে ডাকাইয়া নিয়া গেল এবং কাতর বচনে আপন পাপ জীবনের পাপকাহিনী বর্ণনা করিয়া তাঁহার নিকট ধর্ম্মজীবন লাভ করিবার উপায় প্রার্থনা করিল। পর দুঃখকাতর সন্ন্যাসী ঠাকুর অতি সহজেই তাহার সাধু প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং তদবধি তিনি মাঝে মাঝে তাহার আলয়ে গমন করতঃ তাহাকে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন। মন্ত্রী আপন অভিষ্টসিদ্ধির সুযোগ পাইয়া একদিন রাজার নিকট সন্ন্যাসী ঠাকুরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাইলেন; রাজা অনুসন্ধানে ঘটনা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন।

পরদিন যথা সময়ে সন্ন্যাসী রাজসকাশে আসিলেন, কিন্তু রাজার ব্যবহারের তারতম্য দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন, তিনি কিয়ৎক্ষণ ধ্যানস্থ হইয়া আদ্যোপান্ত ঘটনা অবগত হইলেন, তিনি রাজাকে সম্বোধন পূর্ব্বক বলিলেন—"মহারাজ, আগামীকল্য হইতে আপনার সঙ্গে আমার ছাড়াছাড়ি হইবে, তাই আপনার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছি" রাজা—"আপনি কল্য কোথায় যাইবেন কি"? সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন—"না, আমি যাইবনা, আপনাকেই যাইতে হইবে, আগামী কল্য অমুক সময়ে আপনাকে আপনার এই বিশাল-রাজ্য অতুল ঐশ্বর্য্য, স্ত্রী-পুত্র পরিবার পরিত্যাগ করিয়া জন্মের তরে এ ধরাধাম হইতে বিদায় গ্রহণ করিতে হইবে"।

রাজা- সন্ন্যাসীর কথা অবিশ্বাস করিতে পারিলেন না, কেননা তিনি ভুত-ভবিষ্যৎবেত্তা পূর্ব্বেই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাইয়াছিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর তাঁহার আনীত মোদকের সুচ্যগ্র পরিমাণ নিজের জন্য রাখিয়া বাকীটুকু রাজাকে দিলেন, রাজা এত বেশী দেওয়ার কারণ জিজ্ঞাসা করায় সন্ন্যাসী ঠাকুর বলিলেন,—"আগামী কল্য আপনাকে যাইতে হইবে ভাই

আজ জন্মের শোধ আমোদ উপভোগ করিয়া লউন"। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে আসিবেন বলিয়া সন্ন্যাসী বিদায় হইলেন।

এদিকে রাজা মৃত্যু-চিন্তায় অস্থির হইলেন, সারারাত্রি কিছুতেই শান্তি পাইলেননা, অতীত জীবনের কাহিনী স্মৃতিপথে উদয় হওয়াতে বড়ই ভীত হইলেন, রাজা ভাবিতে লাগিলেন জীবনে ধর্ম্ম কাহাকে বলে জানি নাই। ধনমদে মত্ত হইয়া পরকালের কথা, ভগবানের কথা একবারে ভুলিয়া গিয়াছিলাম, হায়! হায়! এখন আমার গতি কি হইবে? এই রূপ নানা অনুশোচনায় রাত্রি অতিবাহিত হইল। পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে সন্ন্যাসী ঠাকুর আসিলেন, রাজা সন্ন্যাসী ঠাকুরকে প্রণাম করিলেন। সন্ন্যাসী ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, —"কেমন আপনার চিত্ত স্থির আছে ত?" বোধ হয় গতরজনী সকল রাণীর সঙ্গেই আমোদ আহ্লাদে কাটাইয়াছিলেন?"

রাজা বলিলেন,—"হাঁ এখন আমার চিত্ত স্থির, কিন্তু আমোদ আহ্লাদের কথা দূরে থাকুক, আমি কাহার সঙ্গেও বাক্যালাপ ও করি নাই"। সন্ন্যাসী—"সে কি কথা? সূচাগ্র পরিমাণ মোদকে আপনার এত কাম উত্তেজিত হইত, আর আজ সমগ্র মোদকে ও কিছু হয় নাই?"

রাজা বলিলেন,—"আমি মৃত্যু চিন্তায় অস্থির ছিলাম, ভোগ সুখ কখন করিব?"

সন্ন্যাসী বলিলেন,—"মহারাজ, ক্ষণিক মৃত্যুচিন্তায় তোমার এই দশা আর মৃত্যুর বাসভূমি শ্মশান আমার বাসস্থান, মৃতের মাথারখুলি আমার জলপাত্র, মৃতের উপাধান আমার শয্যার উপকরণ, মৃতের কন্থা আমার শীতবস্ত্র আর মৃত্যু-চিন্তা আমার অঙ্গের ভূষণ, আমি কিনা বারবনিতায় আসক্ত"। রাজা তাহার ভ্রম বুঝিতে পারিয়া কাতর বচনে ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন এবং সেই দিন হইতে রাজার জীবনের গতি ফিরিয়া গেল, নবজীবন আরম্ভ হইল; তিনি ধর্ম্মজীবন লাভ করিয়া জীবন ধন্য করিলেন।

ভ্রাতৃগণ! যদি জগৎপিতার অমৃতময় অঙ্কে স্থান পাইতে চাও তবে মৃত্যু-চিন্তাকে অঙ্গের ভূষণ কর। প্রতিমুহূর্ত্তে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাক। যেমন সুবোধ ছেলে নিজের পাঠ উত্তমরূপে শিক্ষা করিয়া শিক্ষক মহাশয়ের যে কোন কঠিন প্রশ্ন হউক না কেন তাহার উত্তর দিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকে, তদ্রূপ ভগবন্নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য সম্পাদন পূর্ব্বক প্রত্যেকেরই মৃত্যুর জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা উচিত। আমরা ত মরিয়াই আছি, মৃতের আবার মরিবার ভয় কি? অন্ধের আবার দৃষ্টি শক্তি হারাইবার আশঙ্কা কি? ভগবানের সৃষ্ট জগতে মনুষ্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব; বহু পুণ্যফলে, বহু ভাগ্যবলে আমরা দুর্লভ মনুষ্যজন্ম লাভ করিয়াছি, দেবতারাও মানব জন্ম লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করেন, কেন না ভগবানের স্বরূপত্বে পহুছিতে হইলে মানব-জন্মের ভিতর দিয়াই অগ্রসর হইতে হইবে। আর আমরা কিনা সেই দেবদুর্লভ অমূল্য মানব জন্ম লাভ করতঃ কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি পশুবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিতেছি! যদি পশু প্রভৃতি ইতর জীব জ্ঞান-জগতে মৃত বলিয়া পরিগণিত হয়, তবে পশুবৃত্তি-সম্পন্ন মানুষ আমরা মৃত বলিয়া কেন না গণ্য

হইবে? যে মানুষ হইয়া মানব জন্ম সার্থক করিতে পারিল না সে মৃত বই কি? তাই বলি ভ্রাতৃগণ! পবিত্র জীবনে দাগ লাগাইয়া মৃতের খাতায় নাম লিখাইও না সত্য-শরণ ভগবানে আত্মসমর্পণ কর—সেই অনন্তের ভাস্বর জ্যোতিঃতে হৃদয় আলোকিত কর, আত্মানান্ধকার দূর হইবে—দেহ, মন, সদ্গুণে পূর্ণ হইবে,—জীবন ধন্য হইবে—জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি থাকিবে তাই কবি বলিয়াছেন:—"কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি"।

—:0:—

শান্তি।

হেরি উচ্চ ঊর্ম্মিমালা সংসার সাগরে,
গেছে চলি বহু দিন শান্তি-সুখ মোর;
দুরাকাঙ্ক্ষা, শোক দুঃখ পশিয়া হৃদয়ে,
জ্বলিয়াছে অশান্তির দাবানল ঘোর।

নাই আর শৈশবের নির্ম্মল পরাণ,
চপলতা সরলতা, মধুর হৃদয়;
নাই আর পবিত্রতা বালক সুলভ,
অশান্তি নিয়েছে হরি' সেই সমুদয়।

নিঃসহায় মাঝিহীন আমার তরণী,
কর্ম্ম-পারাবারে হায়, যেতেছে ভাসিয়া,
অশান্তির দীর্ঘ-শ্বাস জাগাইয়া প্রাণে,
বিন্দু কত অশ্রুজল হৃদয়ে ধরিয়া।

হেনকালে স্বপনেতে আমার জীবন,
সুখ, শোক, দুঃখ-ভোগ, কর্ম্ম ফলা ফল,—
দিলাম সঁপিয়া আমি বিভুর চরণে
মিশাইয়া ভক্তি-পুষ্প, পূত অশ্রুজল।

সহসা দেখিনু চেয়ে আকাশের পানে,
ভেসে যায় দেবীমূর্ত্তি নীরদের গায়;
কক্ষে শান্তি-ভাণ্ড নিয়ে বিমল আভায়,
বিলাইতে সুখ-শান্তি এ মর ধরায়।

বিজলির ঝলা সম,—তাঁহার জ্যোতিতে
ধাঁধিল নয়ন মোর; শান্তি এল নামি,
স্নিগ্ধ-চন্দ্রদ্যুতি সম, নীরব ধারায়;——
লভিলাম চির-সুখ—চির-শান্তি আমি

শ্রীপিযূষ কিরণ চক্রবর্ত্তী

—:0:—

সাধক-সঙ্গীত।

[৪]

পড়েছি বড় অসময়ে হরি। (কি করি এ-)
চন্দ্রপাশ লয়ে আমার শমন সেনা চারিপাশে,
সকলই ত্যজিল আমায়, তুমিও কি রৈলে পাসরি

অহংমন্দ মতি মন, মন দেই নাই তোমা পানে,
জায়া সুতের মায়াসূতে বেন্ধে রেখে ছিলাম প্রাণে ;
সকলই ত্যজিল তারা তুমি এখন কৃপাকরি,
এস হে দীনেরবন্ধু ভবজলধি কাণ্ডারী ;—
নইলে কাল রাত্রিযোগে, ভবার্ণবের ভীষণ বেগে,
বল কে তারে তারকব্রহ্ম পার করে এ ভাঙ্গা তরি ॥
রক্ষ মোরে মুকুন্দ মুরারে মধুসূদন,
কৃষ্ণকেশব কংশারে হরে বৈকুণ্ঠবামন,
হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ কৃষ্ণকৃষ্ণ হরেহরে
হরেরাম হরেরাম রামরাম হরেহরে ;
গোবিন্দের এই ডাকার শেষ, রুদ্ধ হইল কণ্ঠদেশ,
দাঁড়াও হে সম্মুখে এখন বামে লইয়ে কিশোরী ॥

—:0:—

কপিল ও দেবহুতি সংবাদ—

(৩য় সংখ্যায় পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এইরূপ অজ্ঞান মোহান্ধ মনুষ্য যখন সম্পূর্ণরূপে পুত্র কলত্রাদি পরিজনের ভরণ পোষণে অসমর্থ হইয়া পড়ে তখন যেমন নির্দ্দয় কৃষক বৃদ্ধ বলিবর্দ্দকে অযত্ন করে, সম্যক্‌রূপে আহারাদি প্রদান করে না, সেইরূপ তাহার পুত্রকলত্রাদিও তাহার বৃদ্ধাবস্থায় তাহাকে আর পূর্ব্বমত আদর করে না। কিন্তু তাহাতেও তাহার বৈরাগ্য বা চৈতন্যোদয় হয় না সেই মুগ্ধ মনুষ্য ক্রমে জরাগ্রস্ত বিকৃতাকৃতি ও আসন্নমৃত্যু হইয়া গৃহে বাস করে এবং পূর্ব্বে যে স্ত্রী পুত্রাদিকে স্বয়ং বহুদুঃখ ভোগ করিয়া প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবহেলা করিয়া যে আহারসামগ্রী তাহাকে প্রদান করে, সে কুক্কুরের ন্যায় তাহাই ভক্ষণ করে। সেই বৃদ্ধগৃহী মনুষ্য দুর্ব্বলতার জন্য তৎকালে রোগাক্রান্ত হয়, সুতরাং তাহার জঠরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকেনা, আহারও অল্প হইয়া আইসে, তাহার হস্ত-পদাদি সঞ্চালনের আর শক্তি থাকেনা। চক্ষুর্দ্বয় বহির্গত হইয়া পড়ে, বৃদ্ধ বয়সে দেহস্থ বায়ু স্বভাবতঃ ঊর্দ্ধ-গামী হইয়া নাড়ীসকল পূর্ণ করে, তজ্জন্য কাশ বা শ্বাস প্রশ্বাস সময়ে সাতিশয় ক্লেশকর হইয়া উঠে এবং কণ্ঠদেশে নিরন্তর "ঘড়্" "ঘড়্" শব্দ হইতে থাকে। ক্রমে যখন মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করে, তখন আত্মীয় বন্ধু সকলে চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করিয়া শোক করিতে থাকে, এবং তাহারা তাহাকে নানাকথা জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কালপাশের

বশবর্ত্তী হইয়া কিছুতেই প্রত্যুত্তর করিতে সমর্থ হয় না।

মাতঃ! কুটুম্ব পোষণে রত অজিতাত্মা সেই মনুষ্য, রোরুদ্যমান সেই আত্মীয় স্বজনের দুঃখ দর্শন করিয়া দুঃখিত হইয়া উক্তপ্রকারে যেমন মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, তৎক্ষণেই দুই ভীষণদর্শন অত্যদ্ভুত যমদূত আসিয়া তাহাকে আক্রমণ করে। সে তাহাকে দর্শন করিয়াই ভয়ে বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করিতে থাকে। অনন্তর ঐ দুই যমদূত তাহার যাতনা সকলকে তাহার দেহ মধ্যেই রুদ্ধ করিয়া গলদেশে রজ্জুবন্ধন করতঃ তাহাকে সঙ্গে লইয়া যায়। তাহাদের তাড়নায় পাপীর হৃদয় ছিন্নভিন্ন হইয়া যায় এবং গাত্র কম্পিত হয়। পথিমধ্যে কুক্কুর সকল তাহাকে দংশন করিতে আরম্ভ করে, তাহাতে সে আপনার পাপ স্মরণ করিয়া যারপর নাই কাতর হইয়া উঠে। যে পথ দিয়া তাহাকে লইয়া যায়, তাহা উত্তপ্ত বালুকা-পূর্ণ, তথায় আশ্রয়স্থান বা জলাশয় নাই, তাহাতে আবার ক্ষুৎপিপাসায় পীড়িত এবং দাবানল ও সূর্য্য-সন্তাপ দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া পাপী চলিতে অসমর্থ হইয়া পড়ে। কিন্তু যমদূতেরা তাহার পৃষ্ঠে কশাঘাত করিতে থাকে, সুতরাং শক্তি না থাকিলেও সেই পথ দিয়া তাহাকে গমন করিতে হয়। শ্রান্তিবশতঃ যাইতে যাইতে পথিমধ্যে পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে এবং পুনর্ব্বার উত্থিত হইয়া গমন করিতে থাকে, যমদূতগণ এইরূপে অন্ধকারময় পাপপথে পাপীকে যমালয়ে লইয়া যায়।

দেবি! যে পথ দিয়া যমসদনে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ একোন শত-সহস্র যোজন। যমদূতেরা কোন কোন পাপীকে দুই বা তিন মুহূর্ত্তের মধ্যেই সুদীর্ঘ পথ দিয়া লইয়া যায়। সুতরাং পাপী পথিমধ্যে অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। তৎপরে যখন যমসদনে উপস্থিত হয়, তখন দেখিতে পায়, কোথাও অগ্নি-শিখাদি দ্বারা বেষ্টিত হইয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা কেহ আপনার মাংস ছিন্ন করিয়া আহার করিতেছে, কোথাও এক জন অন্যের মাংস কর্ত্তন করিয়া ভক্ষণ করিতে দিতেছে: কাহারও বা জীবন থাকিতেই কুক্কুর ও গৃধ্রগণ তাহার নাড়ী সকল আকর্ষণ করিতেছে। কেহবা সর্প, বৃশ্চিক, মশকাদির দংশনে যারপরনাই কাতর হইতেছে। কাহারও বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সকল খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করিতেছে, কাহাকেও বা জলমধ্যে নিমগ্ন, কাহাকেও বা গর্ত্তমধ্যে রুদ্ধ করিতেছে। কেহবা এক কালেই তামিস্র, অন্ধতামিস্র, রৌরবাদি নরক যন্ত্রনা ভোগ করিতেছে। তথায় নর বা নারীদিগের কোন বিশেষ বিচার নাই। মাতঃ! পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই জগতেই স্বর্গ (সুখ), আর এই জগতেই নরক (দুঃখ), অতএব আমি যে নরক যন্ত্রণার বিষয় বলিলাম সে সকল এই জগতেই দেখিতে পাইবে।

জননি! মনুষ্য আপনার উদর পূরণ বা কুটুম্ব ভরণপোষণ করতঃ তৎপরে ঐ উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করে এবং প্রাক্তন কর্ম্মানুসারে ফলভোগ করে। একজন প্রাণী হিংসাবৃত্তি দ্বারা আপনার পরিপুষ্ট দেহকে এই স্থানেই (পৃথিবীতেই) পরিত্যাগ করিয়া কেবল মাত্র পাপপু

পুণ্য পাপের লইয়া নরকে গমন করে। অন্যান্যলোক তাহার বহু পরিশ্রম লব্ধ বস্তুজাত-সুখ ও তাহার ধনাদি সম্ভোগ করে। মনুষ্য দেহ বা কুটুম্ব পরিত্যাগ করিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের জন্য উপার্জ্জিত পাপ তাহার সঙ্গে সঙ্গেই গমন করে। সেই হতভাগ্য পাপী নরকগামী হইলেও তথায় ঐ সকল পাপের ফল ভোগ করিয়া থাকে। জননি! জীব কুটুম্ব ভরণপোষণের নিমিত্ত উৎসুক হইয়া কেবল পাপাচরণ করিয়া নরকের পরাকাষ্ঠা স্বরূপ ভয়ানক অন্ধতামিস্র প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে নরলোকের অধঃস্থ নরকে সকল প্রকার যাতনা ভোগ করিয়া পরে এই লোকেই প্রত্যাগত হয়।

ভগবান্ কপিল কহিলেন, মাতঃ! জন্তুগণ দেহধারণ জন্য, দৈব প্রেরিত স্বীয় কর্ম্মবশতঃ পুরুষের শুক্রকণা আশ্রয় করিয়া স্ত্রীগর্ভে প্রবিষ্ট হয়। এক দিবসেই শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চমদিবসে বুদ্বুদাকারে পরিণত হয়, তৎপরে অণ্ডাকারে বর্দ্ধিত হয়। একমাস পরে মস্তক, দুইমাসে হস্ত পদাদি ভিন্ন ভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকল এবং তিনমাসে নখ, লোম, অস্থি, চর্ম্ম, শিশ্ন ও ছিদ্রসকল ব্যক্ত হয়। চারিমাসে সপ্তধাতু, পঞ্চমাসে ক্ষুধা তৃষ্ণা জন্মে। পরিশেষে সপ্তমাস উপস্থিত হইলে জীব জরায়ু মধ্যে দক্ষিণ কুক্ষিতে ভ্রমন করে। মাতা যাহা পান আহার করে তাহাতেই তাহার শরীর-পুষ্টি হয় এবং ইচ্ছাশক্তি থাকিলেও সেই মলমূত্র পূর্ণ গর্ভশয্যায় শয়ন করিয়া থাকে। আহা! সেই গর্ভশয্যাতেও জীবের নিস্তার নাই, তথায় ক্ষুধার্ত্ত ক্রিমিসকল কোমলদেহ পাইয়া তাহাকে ক্ষত বিক্ষত করে, তাহাতে সে সাতিশয় যন্ত্রণাভোগ করিয়া ক্ষণে ক্ষণে মূর্চ্ছিত হয়। গর্ভধারিণী অসহ্য কটু, তিক্ত, উষ্ণ, লবণ, ক্ষীর প্রভৃতি যে সকল রস ভক্ষণ করে, তাহার সহিত সংযুক্ত হওয়াতে তাহার সেই সুকোমল শরীরে ব্যথা উপস্থিত হয়। সেই জীব গর্ভ শয্যায় জরায়ু দ্বারা বেষ্টিত এবং নাড়ী সকলদ্বারা বদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও মস্তক আ-কুঞ্চিত করিয়া কুক্ষিদেশে অবস্থিতি করে, সুতরাং পিঞ্জর মধ্যবর্ত্তী পক্ষীর ন্যায় আপনার অঙ্গ সঞ্চালন করিতে সমর্থ হয়না। সেই জীব শত শত জন্মে যে সকল কর্ম্ম করিয়াছিল, সে সমস্ত তৎকালে তাহার স্মরণ হয় এবং তজ্জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, সুতরাং এ অবস্থায় তাহার আর সুখের সম্ভাবনা কোথায়?

এই রূপে যখন সে দশমাসে উপস্থিত হয়, তখন তাহার জ্ঞানোদয় হয় কিন্তু প্রসব কারণ বায়ুবলে চালিত হইয়া, সহজাত ক্রিমির ন্যায় একস্থানে সুস্থির থাকিতে পারেনা। তৎকালে সেই সন্তপ্ত দেহাত্মদর্শী অবস্থাতেই অঞ্জলি-বদ্ধ করিয়া, যে পরম পুরুষ পরমেশ্বর তাহাকে গর্ভে প্রেরণ করিয়াছেন, সেই অন্তর্যামী জগ-দীশ্বরের স্তব করিতে থাকে। যথা—"হে জগৎ-পিতঃ! আপনি এই বিশ্বসংসার রক্ষার নিমিত্তে বিবিধ মূর্ত্তি ধারণ করেন এবং যিনি আমাকে এইরূপ গতি দান করিয়াছেন, আমি সেই শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তির অভয়প্রদ চরণকমলের সুশীতল ছায়ায় শরণাগত হইলাম। আমি দেহরূপে পরিণত মায়া অবলম্বন করিয়া কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া গর্ভ মধ্যে বাস করিতেছি; ভগবান শ্রীহরিও আমার সহিত এই স্থানে বাস করিতেছেন; কিন্তু তিনি—বিশুদ্ধ,

বিকার শূন্য এবং অখণ্ড বোধসম্পন্ন, আমার সন্তপ্ত হৃদয় মধ্যে প্রকাশ পাইতেছেন, আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। বোধ হইতেছে যে, আমি পাঞ্চভৌতিক দেহ দ্বারা বেষ্টিত হইয়া বাস করিতেছি, কিন্তু তাহা সত্য নহে; কারণ আমি বাস্তবিক শরীরের সহিত মিলিত নহি, সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও চিদাভাসের স্বরূপ হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু শ্রীহরির মহিমা এই শরীর যোগে ও কুণ্ঠিত হয়না, কারণ তিনি প্রকৃতি-পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্ব্বজ্ঞ, অতএব আমি তাঁহাকে নমস্কার করি। জীব যে পরমেশ্বরের মায়া বশতঃ গুণ জন্য কর্ম্মরূপ জালে আচ্ছন্ন—এই সংসার পথে অতি শ্রান্ত হইয়া ভ্রমন করিতেছে, সেই অন্তর্যামী পরম পিতার অনুগ্রহ ভিন্ন অন্য কি উপায়ে সে স্বীয় স্বরূপ জ্ঞাত হইতে সমর্থ হইবে? ঈশ্বর ভিন্ন অন্য আর কে আমাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এই ত্রৈকালিক জ্ঞান দান করিতে সমর্থ হইবে? কেবল ঈশ্বরেরই অংশ সকল অন্তর্যামী নিত্য-চৈতন্য-রূপে চরাচর সকল পদার্থেই প্রবিষ্ট রহিয়াছে, অতএব কর্ম্মফল রূপ জীব-পদবী প্রাপ্ত হইয়া তাপত্রয়ের বিনাশ বাসনায় আমরা সেই পরমেশ্বরকেই ভজনা করি। আমি মাতার মল মূত্র শোণিতাদি পূর্ণ গর্ভাশয়ে বাস করিয়া তাঁহার জঠরাগ্নি দ্বারা পরিতপ্ত হইতেছি, সুতরা এই স্থান হইতে বহির্গত হইবার জন্য মাস গণনা করিতেছি এবং ভাবিতেছি, ভগবান্ কবে আমাকে বহিষ্কৃত করিবেন। যে পরম পুরুষ জগদীশ্বর আমার দশমাস মাত্র বয়সে এই রূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই ভক্ত-বৎসল দীননাথ আপন কার্য্য দ্বারা আপনি সন্তুষ্ট হউন, অঞ্জলিবদ্ধ ভিন্ন কোনব্যক্তি তাঁহার যথোচিত কৃতজ্ঞতা স্বীকারে সমর্থ হয় না। সপ্তধাতু রূপ রজ্জুদ্বারা বদ্ধ অন্যান্য পশ্বাদি জীবসকল কেবল স্বীয়দেহে সুখ দুঃখাদি অনুভব করিয়া থাকে, কিন্তু আমি যাঁহার দত্ত বিবেকের বলে ঐ উভয়কে দমন করিবার সামর্থ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, সেই তেজঃস্বরূপে প্রতীয়মান পুরাণ পুরুষকে আমি বাহ্য ও অভ্যন্তরে চিন্তাকরি"।

"প্রভো! আমি বহু দুঃখ ভোগ করতঃ এই গর্ভ মধ্যে বাস করিতেছি সত্য, কিন্তু আমি এস্থান হইতে বহির্গত হইতে বাসনা করি না, কারণ বহির্গত হইয়া যে স্থানে পতিত হইব, তাহাও এক অন্ধকূপ। যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে, আপনার মায়া তাহার অনুগামিনী হয়, তাহার দেহাদিতে অহংবুদ্ধি জন্মে এবং সংসারচক্র প্রবর্ত্তিত হয়। অতএব হে প্রভো! আমি এই স্থানেই থাকি। বিষ্ণু-পাদ-যুগল হৃদয়ে ধারণ করিয়া সারথি রূপী বুদ্ধির সহায়তায় সংসার হইতে আত্মাকে অতি স্থিরভাবে উদ্ধার করিব। যেন আর আমাকে গর্ভবাস রূপ যন্ত্রনা ভোগ করিতে না হয়"।

ভগবান্ কহিলেন, "জননি! দশম মাস উপস্থিত হইলে, জীব যখন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভগবান্ নারায়ণের স্তব করিতে আরম্ভ করে, তখনই প্রসব-বায়ু তাহাকে অধোমস্তক করিয়া ভূমিষ্ঠ করাইবার জন্য বলপূর্ব্বক বাহির করে, সে অতি ক্লেশ পাইয়া বহির্গত হয় ও তৎকালে তাহার শ্বাস রুদ্ধ এবং স্মৃতি শক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়। অনন্তর শোণিতাক্ত-

শরীরে ভূমিতে পতিত হইয়া, কৃমির ন্যায়, নড়িতে থাকে। এবং ভিন্ন অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পূর্ব্ব জ্ঞান নষ্ট হওয়াতে সে রোদন করে। যে তাহার প্রতিপালক, সে রোদনের যথার্থ কারণ বুঝিতে না পারিয়া যদি তাহাকে তাহার অনভিমত কোন বস্তু প্রদান করে, সে তাহা প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না। যখন তাহার অভিভাবক অপবিত্র পর্য্যঙ্কে তাহাকে শয়ান করাইয়া রাখে, আর সেই অবস্থায় যদিও তাহাকে কীটাদি দংশন করে, তন্নিমিত্ত আপন অঙ্গ কণ্ডুয়ন করিতেও সমর্থ হয়না, শয্যা হইতে উত্থিত হইয়া অন্য স্থানে গমন করিতেও পারে না। এক কৃমি যেমন অন্য কৃমিকে দংশন করে, সেইরূপ দংশ মশক ও মৎকুনাদি তাহার সেই নূতন সুকোমল অঙ্গ দংশন করিতে থাকে। গর্ভাবস্থায় তাহার অনুভব শক্তির উদয় হওয়াতে জীব দংশন জন্য ব্যথা বিলক্ষণ অনুভব করিতে পারে, কিন্তু ক্ষমতা না থাকায় কোন প্রকার প্রতিকার করিতে না পারিয়া কেবল মাত্র ক্রন্দন করিতে থাকে”।

“দেবি! জীব শৈশবাবস্থায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বহুবিধ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, যখন বাল্যাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তখন অধ্যয়নাদি-জন্য নানাবিধ ক্লেশভোগ করে। তৎপরে যখন যৌবন দশায় উপস্থিত হয়, তখন বহুবিধ মনোরথ পূর্ণ না হওয়াতে অজ্ঞানতার জন্য নানা প্রকার দুঃখ প্রাপ্ত হয়। দেহের বৃদ্ধির সহিত জীবের অভিমান ও ক্রোধের বৃদ্ধি হইয়া থাকে, সুতরাং আপনার বিনাশের জন্য অন্যকামীদিগের সে বিবাদ উপস্থিত করে।”

জ্ঞানহীন মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি পাঞ্চভৌতিক অনিত্য এই দেহে বার বার “আমি” ও “আমার” বলিয়া অভিমান করে, সেইজন্য তাহাতে তাহার মমতা জন্মে। যে কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ হইয়া দেহী সংসার প্রাপ্ত হয়, দেহী দেহের জন্য সেই কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে, অবিদ্যাও কর্ম্ম দেহীর দেহবদ্ধ থাকায় জন্মে জন্মে তাহার অনুগামী হয়। জীব যদি সৎপথে থাকিয়াও শিশ্ন ও উদরের জন্য পরিশ্রম করিয়া অসাধুব্যক্তিদিগের সহবাস করে, তাহাতে সে নরকে নিপতিত হয়। জননি! মূঢ় অশান্ত দেহবাদী অসাধু ব্যক্তির সহবাসে এবং শোচনীয় ক্রীড়ামৃগস্বরূপ স্ত্রীগণের সংসর্গে, সত্য, চিত্তশুদ্ধি, দয়া, মুনি-ব্রত, বুদ্ধি, লজ্জা, লক্ষ্মী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও সৌভাগ্য এ সমস্তই নষ্ট হইয়া যায়, অতএব চেষ্টা ও যত্ন দ্বারা এই উভয় প্রকার সঙ্গই পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রী ও স্ত্রীসঙ্গীব্যক্তির সংসর্গে জীবের যেরূপ মোহ এবং বন্ধন উপস্থিত হয়, অন্য কাহারও সংসর্গে সেরূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। দেখুন, ব্রহ্মা মৃগরূপী স্বীয় দুহিতার রূপে বিমুগ্ধ হইয়া, নির্লজ্জের ন্যায়, মৃগরূপ ধারণ করিয়া, তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইয়াছিলেন। সেই ব্রহ্মার সৃষ্ট কশ্যপাদি প্রজাপতিগণ এবং সেই প্রজাপতির সৃষ্ট মনুষ্যাদি জীব সমূহ। দেবি! এই সকলের মধ্যে ঋষি-সত্তম যোগিবর নারায়ণ ভিন্ন কোন্ ব্যক্তি আছেন, প্রমদারূপিণী মায়া যাহার চিত্তকে আকর্ষণ না করে? জননি! প্রমদারূপিণী মায়ার কথা আর কি বলিব? বড় বড় দিগ্বিজয়ী বীরেরাও ভ্রূভঙ্গি মাত্রেই আহত হইয়া উঁহার পদানত হয়। যে

ব্যক্তি যোগধর্ম্মে পারদর্শী হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি কখনও প্রমদা সঙ্গ করিবেন না, কারণ যোগীরা কহিয়া থাকেন যে, যিনি সাধু-সেবা দ্বারা আত্মাকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার-পক্ষে নারী নরকের দ্বার স্বরূপ। দেব-নির্ম্মিত প্রমদারূপিণী মায়া শুশ্রূষাদি দ্বারা ক্রমে ক্রমে অনুগত হইতে থাকে, কিন্তু জ্ঞানীব্যক্তি তাহাকে তৃণাচ্ছন্ন কূপের ন্যায় আপনার মৃত্যুস্বরূপ জ্ঞান করিবেন। জীব স্ত্রীসঙ্গ হেতুই স্ত্রীত্ব প্রাপ্ত হইয়া পুরুষবৎ আচরণ কারিণী আমার মায়াকে মোহ বশতঃ সম্পত্তি পুত্র ও গৃহপ্রদাতা পতিরূপে ভাবনা করে, কিন্তু জ্ঞানবতী কামিনী ঐ পতিকে, ব্যাধের ন্যায়, আপনার মৃত্যু বলিয়া জানিবে।"

"জননি! পুরুষ উপাধিভূত লিঙ্গশরীর লইয়া এক লোক হইতে অন্যলোকে গমন করিয়া নিরন্তর কর্ম্মফল ভোগ করে, তথাপি সেই কর্ম্মেরই বারবার অনুষ্ঠান করে। জীবোপাধিক লিঙ্গ শরীর এবং আত্মার অনু-বর্ত্তী ইন্দ্রিয় ও মনোময় স্থূল শরীর এই উভয়ের লয়ের নাম মৃত্যু এবং ঐ আবির্ভা-বের নাম জন্ম অথবা যেরূপ দুই চক্ষুগোলক বস্তুর অবয়ব দর্শনে অসমর্থ হইলে দ্রষ্টা জীব দর্শনেও অশক্ত হয়, সেই রূপ যখন দ্রব্যের উপলব্ধিস্থান-ভূত স্থূল শরীরের দ্রব্য দর্শনে অযোগ্যতা জন্মে, তখন জীবের মৃত্যু এবং যখন তাহাতে "ইহাই আমি" বলিয়া অভিমান জন্মে, তখন জীবের উৎপত্তি হয়। অতএব যদি জন্ম ও মৃত্যু বাস্তবিক না হইল, তবে মৃত্যুভয়, জীবিতাবস্থায় দীনতা স্বীকার এবং জীবন রক্ষার জন্য যত্ন করা উচিত নহে। জ্ঞানীব্যক্তি এই জীবগতি বিবেচনা করতঃ সর্ব্বত্যাগী হইয়া যথার্থ বিচারকারিণী ও যোগযুক্তা বুদ্ধির বলে মায়া বিরচিত এই লোকে দেহ পরিত্যাগ করিয়া ভ্রমন করিবে।"

ভগবান্ কহিলেন—"যে ব্যক্তি গৃহে অব-স্থিত হইয়া ধর্ম্ম হইতে কাম ও অর্থ দোহন করেন, অর্থাৎ কাম ও অর্থের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনিই ভগবানের আরাধনারূপ ধর্ম্ম হইতে বিমুখ। কামমূঢ় এবং শ্রদ্ধান্বিত হইয়া তিনি সামান্য দেবতা এবং পিতৃদিগকে অর্চ্চনা করেন। তাহাদিগের প্রতি শ্রদ্ধাতেই তাঁহার বুদ্ধি আক্রান্ত হয় এবং তাহাদিগের নিমিত্তই ব্রতধারণ করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ঐ আরাধনা ফলে চন্দ্রলোকে গমন করিয়া তিনি সোমরস পান করেন, তাহা হইলেও পতিত হন। এইরূপে তাহার যে কেবল ভোগ বিলুপ্ত হয় তাহা নহে, যখন ভগবান অনন্তদেব অনন্ত শয্যায় শয়ন করেন, তখন তাঁহার যাবতীয় ভোগ্য লোক সকলও লয় প্রাপ্ত হয়।"

"জননি! যে ধীর পুরুষেরা কামও অধর্ম্মের নিমিত্ত আপন ধর্ম্মকে দোহন না করেন, ভগবানে কর্ম্ম সমর্পণ করেন, সঙ্গত্যাগী, প্রশান্ত, শুদ্ধচিত্ত, নিবৃত্তিধর্ম্মনিরত, মমতাশূন্য ও নিরহঙ্কার হইয়া এবং স্বধর্ম্ম দ্বারা সত্ত্ব ও বিশুদ্ধ-চিত্তলাভ করেন, তাহারা সূর্য্য-রশ্মিরূপ যোগে সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং বিশ্বের উপাদান ও নিমিত্ত কারণপুরুষকে প্রাপ্ত হন। তৎপরে যখন হিরণ্যগর্ভের চিন্তায় নিমগ্ন হন, তখন যত দিন ব্রহ্মার প্রলয় না হয়, তত দিন তিনি তাঁহার লোকে বাস করেন। মাতঃ! ত্রিগুণাত্মা পরম পুরুষ ব্রহ্মা দ্বিপরার্দ্ধ কাল ভোগ করিয়া পরিশেষে যখন পৃথিবী, জল,

অনল, অনিল, আকাশ, মন, ইন্দ্রিয় ও ভূতাদি দ্বারা পরিবৃত বিশ্বকে সংহার করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি ঈশ্বরে বিলীন হন। যোজিত প্রাণ, জিতেন্দ্রিয় ও বৈরাগ্য যুক্ত যোগী এইরূপে দূরে গমন করতঃ হিরণ্যগর্ভে প্রবেশ করেন, তিনি তাঁহার সহিত সত্বরই পরমানন্দ স্বরূপ পুরাণ পরব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, কিন্তু পূর্ব্বে তাঁহাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন না। কারণ তখন তাঁহার অভিমান নষ্ট হয় না, অতএব ভাবিনি! প্রীতিপূর্ব্বক হৃদয়কমলশায়ী সেই বিধায়কের শরণাগত হও। ঈশ্বরের মূর্ত্তিস্বরূপ কালবলে সমাধি গুণত্রয়ের পরস্পর মিলন হইলে চরাচরের আদ্য স্রষ্টা বেদগর্ভ ব্রহ্মা, মরিচ্যাদি ঋষিগণ; যোগেশ্বরাদি কুমার সকল এবং অন্য সিদ্ধ ও যোগ প্রবর্ত্তক মহাত্মাগণও প্রথমতঃ কর্ম্মজন্য পারমৈষ্ট্য ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করেন, পশ্চাৎ সগুণ পরব্রহ্ম লাভ করিয়া পূর্ব্বে নিষ্কাম ধর্ম্মজন্য যে আপন আপন ব্রহ্মাদি পদপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভেদ দর্শিতা, অভিমান ও কর্ত্তৃত্ব হেতু যথাকালে আবার সেই সেই পদে জন্ম গ্রহণ করেন। যাঁহারা কার্য্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ইহলোকেই মনকে বদ্ধ করত সর্ব্বতোভাবে কাম্য ও নিত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, যাঁহারা রজোগুণদ্বারা কুণ্ঠিতমনা, কামাত্মা, অজিতেন্দ্রিয় এবং গৃহকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া পিতৃলোকের অর্চনা করেন, যে মধুরিপুর মহ পরাক্রম কীর্ত্তনীয় এবং যাহাকে স্মরণ করিলে সংসার নিবৃত্তি হয়, তাঁহার কথায় বিমুখ হইয়া কেবল ত্রিবর্গ সাধনেই যাহারা ব্যস্ত থাকেন এবং দৈব কর্ত্তৃক প্রতারিত হইয়া হরি কথা রূপ সুধা পরিত্যাগ করতঃ শূকর যেরূপ বিষ্ঠা ইচ্ছা করে, সেইরূপ অসৎ কথায় অভিরুচি প্রকাশ করেন, তাঁহারা ধূমমার্গ দ্বারা প্রথমতঃ পিতৃলোকে গমন করেন তৎপরে সেই স্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্ব স্ব পুত্রাদিতে জন্ম গ্রহণ করিয়া গর্ভাধান হইতে শ্মশান পর্যন্ত যাবতীয় ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। পিতৃলোকে গিয়া দৈববশে পুণ্য ক্ষয় হওয়াতে যখন তাঁহাদের ভোগসুখ নিঃশেষিত হয় তখন তাঁহারা বিবশ হইয়া উক্ত প্রকারে পুনর্ব্বার ঐ নরলোকে পতিত হন।"

(ক্রমশঃ)।

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

অত্র মাসের ১১ই মঙ্গলবার ঝুলন পূর্ণিমার দিন অত্র আশ্রমপ্রতিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ আচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে মহোৎসব হইবে। আমরা গ্রাহক, পাঠক, অনুগ্রাহক প্রভৃতি ভক্তবৃন্দকে ও সর্ব্ব সাধারণকে উৎসবে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া নিমন্ত্রণ করিলাম।

———:0:———

নিম্ন আসাম ও উত্তর বঙ্গের ভক্তবৃন্দের অনুরোধে অত্র শান্তি-আশ্রমের অধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ শ্রীমৎ পরমহংসদেব ভাদ্র মাসের প্রথমেই ভক্তগণ সঙ্গে ভ্রমনে বাহির হইয়াছেন।

———:0:———

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের আশ্রিত ব্রহ্মচারী শ্রীমান নরেন্দ্র চন্দ্র ধর গত ইংরাজি প্রবেশিকা (*Matriculation*) পরীক্ষায় "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের" ৯ম স্থান অধিকার করিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছে। আশ্রম হইতে তাহাকে ঢাকা কলেজে পড়াইবার বন্দোবস্ত হইয়াছে।

———:0:———

অরুণাচল আশ্রমের নেতা ও সেবকগণ পুলিশ ও মহামান্য রাজ কর্ম্মচারীর কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা প্রদান করিয়া যে কীর্ত্তি জাহির করিয়াছে, তজ্জন্য অনেকে আমাদিগকে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেছে। কিন্তু আমরা উক্ত আশ্রম সম্বন্ধে কিছুই অবগত নহি। গত সন ১৩১৬ সালে ঐ আশ্রমের ২য় বার্ষিক উৎসবে নিমন্ত্রিত হইয়া পৌষ সংক্রান্তিতে পূজ্যপাদ্ পরমহংসদেবের সহিত আমরা চারিজন সেবক কুমিল্লা, দুর্গাপুর—শান্তি-আশ্রম (অরুণাচলের পূর্ব্বে কুমিল্লায় অত্র শান্তি-আশ্রম স্থাপিত হইয়াছিল) হইতে তথায় গমন করিয়াছিলাম। তখন আশ্রমের সুতিকাগারের গন্ধ যায় নাই। কোন সন্ন্যাসী বা ভৈরব-ভৈরবী ছিলনা। "গুরুদাস বাবু (দয়ানন্দ) ও তাঁহার ন্যায় কয়েকটী গৃহস্থ ধর্ম্মালোচনার জন্য হরিসভার ন্যায় এই আশ্রম করিয়াছেন" বলিয়া আমাদিগের ধারণা হইয়াছিল। তৎপরেই গুরুদাস বাবুকে স্বামী দয়ানন্দ নামে পরিচিত হইতে দেখিয়া, আমরা "আর্য্য-দর্পণ" পত্রিকায় (২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যায় "অরুণাচল আশ্রম" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) লিখিয়া ছিলাম যে, "* * * আমরা জিজ্ঞাসা করিয়া জানিয়াছিলাম যে, গুরুদাস বাবু কোন ভেকাশ্রিত ধর্ম্ম গ্রহন করেন নাই; অথচ "স্বামী" উপাধিটা সন্ন্যাসী সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণের নামেই ব্যবহৃত হয়। এরূপ অবস্থায় পিতৃ প্রদত্ত নাম পরিত্যাগ করিয়া একটা মনগড়া নাম ধারণের প্রয়োজন আমরা বুঝিতে পারিলাম না। সন্ন্যাস গ্রহন আধ্যাত্মিক জগতের জন্মমাত্র, তাই গুরুদেব দ্বিতীয় বার নাম করনকরেন। সেই নাম সাধু সমাজে ব্যবহৃত হয়। নতুবা নামের আর একটা সার্থকতা কি? অস্মদ্দেশে বিশে পাগলা, বামাক্ষেপা, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত প্রভৃতি কত মহাত্মা সাবেক নামেই পরিচিত থাকিয়া যেরূপ লোকের শ্রদ্ধাভক্তি আকৃষ্ট করিয়াছেন, অনেক স্বামীই তাঁহাদের নিকটেও আসন পাইবার যোগ্য নহে, তখন একটা নিজে নিজে হাত গড়া নাম লইয়া প্রতারণা করাটা ও এত বড় মিথ্যা টার উপর আশ্রমের ভিত্তি পত্তন করাটা আমরা সমিচীন বোধ করিলাম না; ইত্যাদি।" তদৃষ্টে তদানিন্তন উক্ত আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ সাধু এরূপ অসাধু ভাষায় ও রুক্ষভাবে প্রতিবাদ করিয়া আর্য্য-দর্পণের কর্ম্মকর্ত্তাকে পত্র দিয়াছিলেন যে, তাঁহাদিগের আশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষার্থ তাহা আর "আর্য্য-দর্পণে" প্রকাশিত হয় নাই। তাহার মর্ম্ম এই যে, "গেরুয়া কাপড় পরিলেই সন্ন্যাসী হয় না। ভোগের ভিতর দিয়া যোগের সামঞ্জস্য করিতেই তাঁহাদের ঠাকুর অবতীর্ণ। অতএব সন্ন্যাসীর "স্বামী" উপাধি তাঁহারা গৃহস্থ হইয়াও ব্যবহারে অধিকারী।" আমরা বি, এ, উপাধিধারী ধর্ম্ম-জগতের এই দুগ্ধপোষ্য শিশুর প্রতিবাদ

পড়িয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারি নাই। দয়ানন্দ হইতে রজনীতে রবি দেখিতে পাইবার আশা পাইয়া ছিলাম। ইহা ব্যতীত স্বাক্ষাৎ-ভাবে তাঁহাদের সহিত মিশিবার সুযোগ ঘটে নাই। তৎপর মহেন্দ্র বাবুর ন্যায় দু' চারিজন শিক্ষিত ব্যক্তি দলে জুটিয়া তাঁহাকে "অবতার" বলিয়া প্রকারান্তরে প্রচার করেন। আমাদের ঢাকায় যখন আশ্রম ছিল, তখন দয়ানন্দের দল নাম-প্রচারার্থ ঢাকা গিয়াছিল বটে, কিন্তু সেখানে নব অবতার-ধর্ম্ম প্রচারের সুবিধা না হওয়ায় ও নানা কারনে তাঁহাদের বিজ্ঞাপিত নির্দ্দিষ্ট সময়ের বহু পুর্ব্বেই ঢাকা ত্যাগ করিয়া ছিলেন। যেখানে মহাত্মা রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, লোকনাথ ব্রহ্মচারী প্রভৃতির ন্যায় মহাপুরুষগণের আসন, সেখানকার লোক হুজুগে মাতে না। যাহাহউক আমরা অরুণাচল আশ্রম ও তাহার সেবকগণের কার্য্যাবলী বা ধর্ম্ম-মত কিম্বা বর্ত্তমান ঘটনার কথা আলোচনা করিতে ইচ্ছা করিনা। সংবাদ পত্রে যাহা প্রচারিত হইয়াছে, তদতিরিক্ত কোন বিষয়ই আমরা জ্ঞাত নহি। যাঁহারা অরুণাচল আশ্রমবাসীদিগকে সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিতেছেন, তাঁহারা তাঁহাদের স্ব উক্তিতেই আপন ভ্রম বুঝিতে পারিবেন। যে সন্ন্যাসী শত প্রকারে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়া ভগবানের নিকট পীড়কের মঙ্গল কামনা করিয়া থাকেন, রাজা দুরে থাকুক্ কাহারও বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ কি তাঁহার পক্ষে সম্ভব? পৃথিবীর যাবতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ই বিপক্ষ কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়াছে; কিন্তু তাঁহারা ধৈর্য্যবলে—ক্ষমাবলে— প্রেমবলে তাহা অতিক্রম করিয়াছিলেন, কাহাকেও বাহুবল কিম্বা অস্ত্রবলের সাহায্য গ্রহন করিতে হয় নাই। কোন কোন সময়ে স্বেচ্ছাচারী রাজার বিরুদ্ধে দেশের প্রেমিক ব্যক্তিগণ সমবেত হইয়া দল করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়; তাঁহারাও সে সময়ে সন্ন্যাসী নামে পরিচিত হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহারা সন্ন্যাসী নহেন। আশাকরি, কোন হিন্দু দয়ানন্দ-সম্প্রদায়কে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিয়া ক্ষুণ্ণ হইবেন না। তাহারা স্ব-কপোল-কল্পিত ধর্ম্মমতের প্রতিষ্ঠাতা। দেশের এই সকল অপরিণামদর্শী, অবিবেকমূঢ়, শিক্ষা-ভিমানী, মোহান্ধ, আত্ম-অহঙ্কারী ব্যক্তি-গণের দ্বারা সাধারণের চক্ষে ধর্ম্ম জগতের পথ সঙ্কীর্ণ ও অন্ধকারাবৃত হইতেছে, ইহারা দেশের— দশের— সমাজের ঘোর শত্রু ত্রিশূল, লেংটা ভৈরবী প্রভৃতির সৃষ্টির দ্বারা হিন্দু ধর্ম্মকে উপহাসাস্পদ করা হইয়াছে। ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাধারণের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি করা হইয়াছে। সত্যে ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত না হইলে তাহার পরিণাম অরুণাচলবাসী দিগের ন্যায় শোচনীয়, অথচ হাস্যাস্পদ হইয়া থাকে স্বয়ং ভগবান্ ধর্ম্মের রক্ষক; ধর্ম্মে গ্লানি দেখিলে তাঁহার অটল সিংহাসন কাঁপিয়া উঠে, একথা কোন হিন্দু যেন না ভুলিয়া যান। জয় জগদীশ! তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পুর্ণ হউক।

—:0:—

বিজ্ঞাপন।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনে এখনও ৪।৫টী অনাথ বালক বালিকার স্থান হইতে পাবে। সুতরাং আমাদের গ্রাহক ও পাঠকগণকে জানাইতেছি যে, যদি কাহারও সন্ধানে অনাথ বালক বা বালিকা থাকে, তবে অবশ্য তাহার সবিস্তার পরিচয় আমাকে পত্র দ্বারা জানাইবেন। আপন ব্যয়ে যদি কেহ নির্দ্দিষ্ট কাল মাত্র পুত্র-কন্যাকে এখানে রাখিয়া শিক্ষাদান করিতে ইচ্ছা করেন, তবে এখনও ৪ ৫ টী মেয়ে ৩।৪ টী ছেলের বন্দোবস্ত হইতে পাবে। আর সাধারণে অনাথ বালক-বালিকার সন্ধান রাখিবেন।

দেশের কৃষক শ্রেণীর মধ্যে যাহারা জমি জমা অভাবে মজুরী করিয়া কষ্টে দিন যাপন করে, তাহাদিগের মধ্যে যাহারা আসামে আমাদিগের নিকটে বাস করিতে সম্মত আছে, আমরা তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযোগী জমি বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত আছি বলা বাহুল্য স্বহস্তে যাহারা চাষ করিয়া খায়, তাহারা ভিন্ন অন্যের সুবিধা হইবেনা। কারণ চাকর রাখিয়া চাষ করা করা এখানে পোসাইবেনা। কৃষকগণের সুযোগ ও সুবিধা করিয়া দিতে পারি।

সহৃদয় পাঠকগণ। দরিদ্র কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ইহা প্রচার করিয়া তাহাদিগের দুঃখ মোচন করিতে আশা করি কেহই ঔদাস্য প্রকাশ করিবেন না। আপাততঃ ৮।১০ জন কৃষকের সুবিধা করিয়া দিতে পারিব। প্রয়োজন হইলে ২।৪ জনের হাল গরু ও গৃহাদির যোগাড় করিয়াও দিতে পারি। যদি কোন নিঃস্ব দরিদ্র কৃষক আসিতে উদ্যোগী হয়, স্থানীয় যে কোন ভদ্রলোক আমাদিগকে জানাইলে বাধিত হইব। দরিদ্র কৃষকগণের এই সামান্য উপকারটুকু করিতে কোন হৃদয়বান্ ব্যক্তিই কুণ্ঠিত হইবেন না। এসম্বন্ধে কোন বিষয় জানিতে হইলে নিম্ন লিখিত ঠিকানায় পত্র লিখিবেন। ইতি :—

পোঃ কোকিলামুখ।	শ্রীস্বামী বোধানন্দ সরস্বতী।
শান্তি আশ্রম	"সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট"
(যোরহাট)	শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন।

যোগীগুরু ও জ্ঞানী গুরু প্রণেতা—

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ পরহংস দেবের

তান্ত্রিক গুরু বা তন্ত্র ও সাধন পদ্ধতি।

জাহির হইয়াছে। এতদ্দেশে তন্ত্র মতেই দীক্ষা ও নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়াকলাপ হইয়া থাকে। সুতরাং এ পুস্তকখানি যে সাধারণের বিশেষ প্রয়োজনীয়, এ কথা বলাই বাহুল্য। সাধারণের অবগতির জন্য নিম্নে সূচীগুলি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

প্রথম খণ্ড—যুক্তিকল্প।

তন্ত্র শাস্ত্র, তন্ত্রোক্ত সাধনা, মকার তত্ত্ব, প্রথম তত্ত্ব, অন্ত্য তত্ত্ব, পঞ্চম তত্ত্ব, সপ্ত আচার ভাবত্রয়, তন্ত্রের ব্রহ্মবাদ, শক্তি উপাসনা দেবী মূর্ত্তির তত্ত্ব এবং সাধনার ক্রম।

দ্বিতীয় খণ্ড—সাধন কল্প।

গুরুকরণ ও দীক্ষা পদ্ধতি, শাক্তাভিষেক, পূর্ণাভিষেক, নিত্য নৈমিত্তিক ও কাম্যকর্ম্ম, অন্তর্যাগ বা মানস পূজা, মালা নির্ণয় ও জপের কৌশল, স্থান নির্ণয় ও জপের নিয়ম জপ রহস্য ও সমর্পণ বিধি, মন্ত্রার্থ ও মন্ত্র চৈতন্য, যোনিমুদ্রাযোগে জপ, অজপা জপের, প্রণালী, শ্মশান ও চিতা সাধন, শব সাধন, শিবাভোগ ও কুলাচার কথন, রমণীকে জননীত্বে পরিণত, পঞ্চমকারে কালী সাধনা, চক্রানুষ্ঠান, মন্ত্র সিদ্ধির লক্ষণ, তন্ত্রের ব্রহ্ম সাধন এবং তন্ত্রোক্ত যোগ ও মুক্তি।

পরিশিষ্ট—(মাত্র জগদ্ধিতায়)

বিশেষ নিয়ম, যোগিনী সাধন, হনুমদ্দেবের বীর সাধন, সর্ব্বজ্ঞতা লাভ, দিব্যদৃষ্টি লাভ, অদৃশ্য হইবার উপায়, পাদুকা সাধন, অনাবৃষ্টি হরণ, অগ্নি নিবারণ, সর্প বৃশ্চিকাদির বিষ হরণ, শূলরোগ প্রতিকার, সুখপ্রসব মন্ত্র, মৃতবৎসা দোষ শান্তি, বন্ধ্যা ও কাকবন্ধ্যা প্রতিকার, বালক সংস্কার, জ্বরাদি সর্ব্বরোগ শান্তি, আপদুদ্ধার, কতিপয় মন্ত্রের আশ্চর্য্য প্রক্রিয়া এবং উপসংহার।

১৬ পেজী সুপার রয়েল ফর্ম্মার ২০ ফর্ম্মায় সম্পূর্ণ। গ্রন্থকারের হাপটোন চিত্র সহ মূল্য ১৸০ এক টাকা বার আনা মাত্র।

শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতী পরমহংসদেব কৃত অন্যান্য পুস্তক।

১। যোগী-গুরু (২য় সংস্করণ) মূল্য ১৷৹ দেড় টাকা।

২। জ্ঞানী-গুরু (দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে) মূল্য ২।৹ সোওয়া দুই টাকা।

৩। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন মূল্য ॥৹ আট আনা।

এই পুস্তক গুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, ২২৬ নং নবাবপুর, ঢাকা—আশ্রম-সেবক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়ের নিকটে, চট্টগ্রাম আশুতোষ লাইব্রেরীতে এবং নিম্ন লিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যাইবে। কোন স্থানে না পাইলে নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

অত্র আশ্রমাধিষ্ঠাতা শ্রীমৎ পরমহংসদেবের হাপটোন ফটো এবং আর্য্য-দর্পণের পুরাতন সংখ্যাগুলিও এখানে পাওয়া যাইবে।

পোঃ কোকিলামুখ
শান্তি-আশ্রম (যোরহাট।)

শ্রীকুমার চিদানন্দ
কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"।

৫ম বর্ষ। আশ্বিন, ও কার্ত্তিক। ৬ষ্ঠ ও ৭ম সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ।

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

———:0:———

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। } { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

আর্য্য-দর্পণের নিয়মাবলী।

—————:0:—————

"আর্য্য-দর্পণ" প্রধানতঃ ধর্ম্ম ও নীতি-বিষয়ক মাসিক পত্রিকা বটে। সময় সময় তাহাতে তদানুসঙ্গিক বিষয়াদিও বিবৃত হইতে পারিবে।

সর্ব্বশ্রেণীর গ্রাহকগণের জন্যই আর্য্য-দর্পণের বার্ষিক মূল্য ডাক মশুল সহ ২৲ দুই টাকা, অগ্রিম দেয়। নমুনার প্রয়োজন হইলে ।১০ সাড়ে চারি আনার ডাক টিকেট পাঠাইতে হইবে

প্রতি মাসের প্রথমেই "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত হইয়া সেই মাস মধ্যে গ্রাহকগণের সমীপে প্রেরিত হইবে। কোন মাসের পত্রিকা না পাইলে অনুগ্রহ পূর্ব্বক সেই মাসের মধ্যে আমাদিগকে জানাইবেন। নতুবা সেই সংখ্যার জন্য আমরা দায়ী নহি।

গ্রাহকগণ পত্রাদি লেখার সময় বা মূল্য প্রেরণের সময় স্বীয় স্বীয় নম্বর লিখিয়া দিবেন। নূতন গ্রাহক "নূতন" এই কথাটী লিখিয়া দিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তন যথাকালে কার্য্যাধ্যক্ষকে না জানাইলে, পত্রিকার অপ্রাপ্তি জন্য আমরা দায়ী হইব না।

এক পৃষ্ঠায় লিখিত প্রবন্ধ ও বিনিময় পত্রাদি সম্পাদকের নামে পাঠাইবেন। চিঠি পত্রাদির উত্তর চাহিলে রিপ্লাই কার্ড অথবা ডাক টিকেট পাঠাইতে হইবে।

যাঁহারা "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের" স্থিতির অকৃত্রিম আকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা ইহার উদ্দেশ্য অবশ্য জ্ঞাত হইবেন। "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের" আহুতি কল্পে মাসিক বা বার্ষিক চাঁদা, কি এককালীন দান—**যিনি যাহা শ্রদ্ধার সহিত দান করিবেন,** তাহা যতই অল্প হউক না কেন, সাদরে গৃহীত ও আর্য্য-দর্পণ পত্রিকান্তর্গত স্বীকৃত হইবে। বিজ্ঞাপনদাতাগণের সহানুভূতি প্রার্থনীয়।

কেহ ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণ করিয়া প্রবন্ধ লিখিলে তাহা প্রকাশিত হইবেনা। কেন না কাহারও কোন বিষয়ে প্রতিবাদ করিতে কিম্বা কাহারও দোষ অন্বেষণ করিতে আর্য্য-দর্পণ পত্রিকা অত্যন্ত ঘৃণাবোধ করেন। অনর্থক বাজে বিষয় লইয়া বাদ প্রতিবাদ করার জন্য পত্রিকায় স্থানাভাব।

ধর্ম্ম পুস্তক ভিন্ন অন্য কোন বিষয় অত্র পত্রিকায় সমালোচিত হয় না। সমাজের বা গ্রন্থকারের বিশেষ প্রয়োজন বোধ না করিলে গুণাংশ ব্যতীত অন্য বিষয় সমালোচনা বাহুল্য বিবেচনা করি।

পত্রিকা সম্বন্ধে কোন বিষয় জানাইতে বা মূল্য পাঠাইতে হইলে আমার নামে পাঠাইবেন।

আর্য্য-দর্পণ—কার্য্যালয়।	বিনীত—
পোঃ কোকিলামুখ	শ্রীকুমার চিদানন্দ।
শান্তি-আশ্রম, (যোরহাট।)	কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"।

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।	আশ্বিন।	বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

কপিল ও দেবহুতি সংবাদ।

(পঞ্চম সখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

"অতএব জননী! আপনি পরমাত্মার গুণাশ্রয়িনী ভক্তির সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে পরমাত্মাকেই ভজনা করুন, তাঁহার শ্রীচরণ-কমলই উপাস্য। ভগবান্ বাসুদেবে ভক্তি হইলেই শীঘ্র বৈরাগ্য এবং যে জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, সেই জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে। মাতঃ! দ্রব্য সকলই সমান, ভক্ত-চিত্ত যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি দ্বারা দ্রব্য মধ্যে একটীকে প্রিয় এবং অন্যটীকে অপ্রিয় বলিয়া ভিন্ন বোধ না করেন, তখনই তিনি আত্মদ্বারা স্বপ্রকাশ, নিঃসঙ্গ, হেয়, উপাদেয়-ভাব বিবর্জ্জিত, সুতরাং সর্ব্বত্র সমদর্শন এবং "আমি পরমানন্দস্বরূপ" এই রূপ জ্ঞান-প্রাপ্ত যে আত্মা তাঁহাকেই দর্শন করেন। কেবল জ্ঞানই পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর এবং পরম পুরুষ; কিন্তু তিনি এক হইয়াও দৃশ্য দ্রষ্টা ও ইন্দ্রিয় ভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রতিভাত হন। মাতঃ! সমস্ত যোগ দ্বারা সম্পূর্ণ রূপ সঙ্গরহিত আত্ম-প্রাপ্তিই যোগীর উদ্দেশ্য। শুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ একমাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ পরাঙ্মুখ ইন্দ্রিয়গণ দ্বারা শব্দাদি দ্রব্যরূপে প্রকাশ পাইতেছেন। যেমন একমাত্র মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার রূপে সত্ব, রজঃ ও তম স্বরূপ হইয়া পুনর্ব্বার ভূতরূপে পঞ্চবিধ, আবার ইন্দ্রিয়রূপে একাদশ প্রকার হইয়াছেন এবং তাহা হইতেই জীব, জীবের শরীর-ভূত ব্রহ্মাণ্ড ও জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, তেমনি এই প্রপঞ্চ এক পরব্রহ্মেই দ্রব্যরূপে প্রতীত হইতেছে, যোগানুরক্তচিত্ত, সঙ্গরহিত ও সংসারবিরক্ত ব্যক্তিই শ্রদ্ধা, ভক্তি ও নিত্য যোগাভ্যাস দ্বারা এই প্রপঞ্চকে ব্রহ্ম-রূপে দর্শন করিয়া থাকে।

"মাতঃ! যে জ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয় এবং যদ্দ্বারা প্রকৃতি ও পুরুষের

তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, আমি তোমার নিকট সেই জ্ঞানের বিষয় এই কহিলাম। নির্গুণ জ্ঞান যোগ এবং আমাতে ভক্তি যোগ, এই উভয়েরই এক উদ্দেশ্য, অর্থাৎ এই উভয় হইতেই ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। যেমন রূপ রসাদি বিবিধ গুণের আশ্রয়ীভূত দুগ্ধ প্রভৃতি পদার্থ বিভিন্ন ইন্দ্রিয়াদি দ্বারা বহুবিধ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, সেই রূপ ভগবান্ এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন শাস্ত্রভেদে বিভিন্ন বলিয়া প্রকাশ পান। পূর্ত্ত কর্ম্ম (জলাশয়াদি খনন), যজ্ঞ, দান, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন, মীমাংসা, আত্মা ও ইন্দ্রিয়জয়, সন্ন্যাস, বিবিধ অঙ্গবিশিষ্ট যোগ, ভক্তিযোগ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিশালী সকাম ও নিষ্কাম-উভয়বিধ ধর্ম্ম, আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং সুদৃঢ় বৈরাগ্য ইত্যাদি বহুবিধ পথদ্বারা স্বপ্রকাশ নির্গুণ ব্রহ্মও সগুণ বলিয়া প্রতিভাত হন।"

"দেবি! আমি আপনাকে ভক্তিযোগের চারি প্রকার লক্ষণ এবং যে কাল প্রাণী-সকলের সৃষ্টি ও সংহার করিতেছেন; তাঁহারও লক্ষণ কহিলাম। মায়া ও কর্ম্মবলে জীবের বহুবিধ জন্ম হইয়া থাকে, আত্মা সেই সকলে প্রবিষ্ট হইয়া স্বীয়গতি অবগত হইতে পারে-না। জননী! আমি আপনাকে এই যে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিলাম, আপনি ইহা কখনও খল, অবিনীত, জড়, দুরাচার, দাম্ভিক, লোলুপ বা গৃহাসক্তচিত্ত ব্যক্তিকে উপদেশ করিবেন না। যাহারা আমার ভক্ত নহে অতএব যাহারা আমার ভক্তদিগের দ্বেষ করে, আপনি তাহাদিগেরও নিকট ইহা ব্যক্ত করিবেন না। কিন্তু যাহারা শ্রদ্ধাশীল, ভক্ত, বিনীত, নির্ম্মৎসর, সকল ভূতে দয়াবান্, আমার শুশ্রূষায় নিরত, বাহ্যবস্তুতে বিরক্ত, শান্তচিত্ত, ঈর্ষাশূন্য, শুচি এবং যাঁহারা আমাকে প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তম বলিয়া বোধ করেন, আপনি তাঁহাদিগকেই ইহা উপদেশ করিবেন। মাতঃ! যদি কেহ শ্রদ্ধার সহিত এই উপদেশ একবার শ্রবণ করেন, অথবা আমাতে মন স্থাপন করিয়া ইহার অনুষ্ঠান করেন, তিনি আমার পদবী প্রাপ্ত হন।

সাংখ্য-শাস্ত্রের প্রবর্ত্তক ভগবান্ কপিলের পূর্ব্বোক্ত প্রকার সারগর্ভ হিতজনক উপদেশ সকল শ্রবণ করিয়া কর্দ্দম সহধর্ম্মিনী—তাঁহার জননী দেবহূতির মোহান্ধকার সকল দূরীভূত হইল। তখন তিনি তাঁহাকে প্রণাম করিয়া কহিলেন; বৎস! ব্রহ্মা তোমার নাভিপদ্মে উৎপন্ন হইয়াও সলিলের অভ্যন্তরে শয়ান, সুতরাং সুব্যক্ত গুণ প্রবাহ-বিশিষ্ট, অতএব ভূত, ইন্দ্রিয়, দ্রব্য ও আত্মা দ্বারা ব্যাপৃত, এবং অসীম কার্য্যকারণের বীজরূপ তোমার এই দেহকে কেবল চিন্তা করিয়া থাকেন মাত্র, দর্শন করিতে পারেন নাই। তুমি সকল প্রকার ক্রিয়ারহিত, কিন্তু যাহা মনে কর তাহাই করিতে পার। তুমি আত্মা এবং তোমার শক্তি অচিন্ত্য; অতএব গুণ-প্রবাহ রূপে আপনার শক্তি বিভক্ত করিয়া এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় করিতেছ। প্রলয় কালে এই প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তোমাতেই লীন হয়, অতএব বৎস! আমি তোমাকে কিরূপে গর্ভে ধারণ করিয়াছি? প্রভো! তুমি প্রলয় কালেও এইরূপ মায়িক শিশুরূপ ধারণ করিয়া স্বীয় পদাঙ্গুষ্ঠ চুষিতে চুষিতে একাকী বটপত্রে শয়ন করিয়া ছিলে, অথবা দুষ্টদিগের দমন ও শিষ্টদিগের সমৃদ্ধি এবং

জ্ঞানপথ প্রদর্শনের জন্য, শূকরাদি অন্যান্য অবতারের ন্যায়, তুমি আপন ইচ্ছায় এই মূর্ত্তি স্বীকার করিয়াছ। আমি সামান্য বালকের ন্যায় তোমাকে গর্ভে ধারণ করি নাই। বৎস! কুক্কুরভোজী অতি অসভ্য ব্যক্তিও যদি তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ অথবা তোমাকে সম্বোধন করিয়া আহ্বান করে, তাহা হইলে সে তৎক্ষণাৎ সোমযজ্ঞের যোগ্যপাত্র হয়; আর যে তোমাকে দর্শন করে, তাহার কথা আর কি কহিব! যদি একজন অতি নীচ চণ্ডালও তোমার নাম জিহ্বাগ্রে উচ্চারণ করে, সেও পূজ্য হয়, সুতরাং যাহারা তোমার গুণগান করেন, তাঁহারাই যথার্থ তপস্যা করিয়া থাকেন, যথার্থ হোম করেন; প্রকৃত তীর্থজলে অভিষেক করেন; যথার্থ বেদ অধ্যয়ন করেন; এবং তাঁহারাই যথার্থ সাধু। তুমি "কপিল" রূপে সাক্ষাৎ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়াছ, অতএব তোমাকে নমস্কার করি। তুমি পরব্রহ্ম ও পরমপুরুষ, মনকে বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া, তদ্বারা তোমাকে চিন্তা করিতে হয়। তুমি আপন তেজদ্বারা গুণ সমূহকে বিনষ্ট করিয়াছ। প্রলয় কালে বেদ তোমারই উদর মধ্যে লীন হয়।

মাতৃবৎসল কপিল নামধারী পরমপুরুষ শ্রীহরি, উক্তপ্রকারে কথিত হইয়া, গম্ভীর বাক্যে মাতাকে কহিলেন; জননি! আমি যে আপনাকে অতি উৎকৃষ্ট উপদেশ প্রদান করিলাম; ইহা আপনার অনায়াস-সাধ্য, আপনি ইহার অনুষ্ঠান করিলেই জীবন্মুক্তি লাভ করিতে পারিবেন। মাতঃ! আমার এই কথায় শ্রদ্ধা করুন। ব্রহ্মবিদ্ মহাত্মগণ এই মতেরই অনুকরণ করেন। ইহার অনুবর্ত্তিনী হইলে আপনিও আমাকে জানিতে পারিয়া সাংসারিক সকল প্রকার ভয় হইতে মুক্তি পাইবেন। যাহারা ইহা অবগত নহে, তাহারাই মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

ভগবান্ কপিল এইরূপ মনোহারিণী আত্মগতি দর্শন করাইয়া ও ব্রহ্মবাদিনী জননীর অনুমতি লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। তাঁহার জননী দেবহূতিও পুত্রের নিকট সারগর্ভ উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, যোগানুষ্ঠান বাসনায় সরস্বতীর পুষ্প মুকুট তুল্য সেই আশ্রমেই সমাধিযোগে মনোযোগ করিলেন। পুনঃ পুনঃ স্নান করাতে তাঁহার কুটিল অলকাজাল জটিল ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। চীরকৌপীন বাস পরিধান করিয়া কঠিন তপস্যায় নিমগ্ন হইয়া তিনি স্বীয় শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিলেন।

প্রজাপতি কর্দ্দমের গৃহ তপস্যা ও যোগের প্রভাবে প্রচুর পরিমাণে যাবতীয় উৎকৃষ্ট দ্রব্য সামগ্রী দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, তাহার তুল্য আর দ্বিতীয় গৃহ ছিল না, এমন কি দেবতাগণও তাহাতে স্পৃহা করিতেন। দুগ্ধ-ফেন-নিভ-শয্যা, স্বর্ণ-খচিত হস্তিদন্ত-নির্ম্মিত মঞ্চ, স্বর্ণ-নির্ম্মিত আসন এবং সুখস্পর্শ আস্তরণ সকল স্থানে স্থানে বিস্তৃত ছিল, বহুমূল্য মরকত মণি এবং স্বচ্ছ স্ফটিক দ্বারা বিনির্ম্মিত ভিত্তি সমূহে রত্নময় প্রদীপ সকল আভা বিস্তার করিত। পরিবারের মধ্যে যে সকল মহিলা ছিল, তাহারা প্রত্যেকেই স্বজাতির রত্ন স্বরূপ। বাটীর নিকটবর্ত্তী উদ্যানে বহুবিধ দেবতরু সকল সুগন্ধি কুসুমে

বিভূষিত ছিল, বিহগকুল ঐসকল বৃক্ষ শাখায় উপবিষ্ট হইয়া সুমধুরস্বরে গান করিতেছিল, এবং মধুমত্ত মধুপগণও গুণ্ গুণ্ ধ্বনি করিতেছিল, মহর্ষি কর্দ্দমের সহধর্ম্মিনী দেবহুতি যখন ঐ উদ্যানের মধ্যে উৎপল-গন্ধে সুবাসিত বাপীতে অবগাহন করিতেন, দেবানুচরেরা তখন তাঁহার যশোগান করিতেন। অধিক কি কর্দ্দমের ঐ ঐশ্বর্য্য সম্ভোগ করিবার জন্য ইন্দ্র-পত্নীগণও সমুৎসুক হইয়াছিলেন। কিন্তু কপিল-জননী পুত্র বিয়োগ দুঃখে কাতর হইয়া ঈদৃশ দেবদুর্লভ গৃহ পরিত্যাগ করিলেন। তাঁহার তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল সত্য, কিন্তু একে স্বামী প্রব্রজ্যা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাতে আবার পুত্র প্রস্থান করায়, তিনি মৃতবৎসা গাভীর ন্যায়, সাতিশয় কাতরা হইলেন। তিনি স্বীয় পুত্র কপিলদেবকে মনোমধ্যে চিন্তা করিয়া উক্তরূপ সংসার কামনা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। প্রসন্নবদন ভগবানের যে মূর্ত্তির বর্ণনা করিয়াছিলেন, তিনি তাহার সেইসকল অঙ্গ এককালে এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে ধ্যান করিতে লাগিলেন। যে পরমাত্মার স্বরূপ প্রকাশ দ্বারা মায়াগুণ পরিচ্ছেদ তিরোহিত হয়, সুতরাং যিনি সর্ব্বব্যাপী, কর্দ্দম-কামিনী ভক্তিযোগ, প্রবল বৈরাগ্য, মিতাহার এবং ব্রহ্মত্ব প্রাপক জ্ঞানের সহযোগে, আত্মা দ্বারা তাঁহাকেই চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি জীবের আশ্রয় স্বরূপ ব্রহ্মে স্থিরভাবে অবস্থিত রহিল এবং তিনি পরম-শান্তি লাভ করিলেন। ক্রমে তাঁহার সমাধি পরিপক্ক হইয়া উঠিল, সেজন্য তাঁহার গুণজনিত ভ্রান্তিও দূরীভূত হইল। তখন যেমন সুপ্তোত্থিত ব্যক্তি, স্বপ্নদৃষ্ট বিষয় স্মরণ করিতে পারে না, সেইরূপ তিনি আর আপন দেহের অস্তিত্বও অনুভব করিতে পারিলেন না। কর্দ্দমের যোগপ্রভাব দ্বারা সমুৎপন্ন বিদ্যাধরিগণ তাঁহাকে সুস্বাদু আহারাদি প্রদান করিতে লাগিল এবং পুত্রবিরহ জন্য আর তিনি কাতরা হইলেন না, সুতরাং তাঁহার দেহ কৃশ হইল না, কিন্তু মললিপ্ত হইয়া ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায়, দীপ্তি পাইতে লাগিল। অঙ্গ সকল প্রারব্ধ কর্ম্ম দ্বারা প্রতিপালিত হইয়া তপস্যা এবং যোগেই নিযুক্ত রহিল। কখন কটিদেশ হইতে বসন স্খলিত হইয়া পড়িত, কখন বা কেশপাশ আলুলায়িত হইয়া থাকিত, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি কেবল শ্রীকৃষ্ণেই নিমগ্ন থাকাতে তিনি কিছুই জানিতে পারিতেন না।

এইরূপে দেবহুতি কপিল কথিত পথ দ্বারা অবিলম্বেই পরব্রহ্ম স্বরূপ নিত্যমুক্ত পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইলেন। তিনি যেস্থানে সিদ্ধিলাভ করিয়া ছিলেন, সেই স্থান সিদ্ধিপ্রদ পুণ্যক্ষেত্র বলিয়া ত্রিলোকে বিখ্যাত হইয়াছে। যিনি মহামুনি কপিলের এই আত্ম-যোগ জ্ঞাপক মত শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহার বুদ্ধি গরুড়ধ্বজ শ্রীকৃষ্ণে নিমগ্ন হয় এবং তিনি চরমে তাঁহার পদারবিন্দ লাভ করেন।

—:০:—

জীবাত্মার অমরত্ব ।

(মানবের সঙ্গে নিরাশা ও আশার কথোপকথন ।)

একদা হৃদয়কক্ষে নিরাশা পশিয়ে,
গরবে কহিলা ধনি, মোরে সম্বোধিয়ে :—
"মর্ত্ত্যধামে মৃত্যু নিয়ে খেলা অনুক্ষণ,
চারিভিতে মৃত্যুভয় করে বিচরণ ।
ধূলির ধরণী এই মরণে গঠিত,
মরণ বিষাদছায়া সবে নিপতিত ।
প্রভাতে তরুণ ভানু রক্তিম আভায়,
উদিল মোহিয়া ধরা রূপের ছটায় ।
সরোজিনী সানুরাগে খুলিয়া নয়ন,
নেহারি প্রেমের ছবি আহ্লাদে মগন ।
প্রকৃতি হাসিছে কত হাসা'য়ে সকলে,
পুলকে নাচিছে ধরা পূর্ণ কোলাহলে ।
কিন্তু হায় ! প্রদোষের বিষাদ ছায়ায়,
ডুবিল যখন ভানু আকাশের গায়,
নিঠুর তমসজাল বাহু প্রসারিয়া,
অতল ক্ষোভেতে ধরা দিল ডুবাইয়া ;
প্রকৃতির হাসাহাসি, কমলিনী-আশা—
ভাঙ্গিল সুখের স্বপ্ন ; মিটে কি পিয়াসা ?
অতএব লও মোর সার উপদেশ,
আমোদে মাতিয়ে কর জীবনের শেষ ।
দু'দিনের তরে এই মরতের খেলা ।
ভুঞ্জহ যতেক সুখ সাধে, 'এই বেলা' ।
শুনিয়া এতেক কথা মরমে জ্বলিয়া,
মানব কহিছে তায়, মৃদু সম্বোধিয়া ।
"কেন গো নিরাশে অয়ি বিকটবদনে !
মরণের কথা মোরে কহ কাণে কাণে ?
তোমার ভীষণ আস্য নেহারি সভয়ে,
পরাণ শুকায়ে যায় সদা কাঁপে হিয়ে ।
সত্য বটে আছি হেথা মরণ মাঝারে,
রয়েছি ডুবিয়ে সদা মোহ অন্ধকারে ।
মিলেনা তিলেক স্থান মাথা রাখিবার—
চঞ্চল অনিত্য সব শুধু হাহাকার !
কিন্তু সুভাষিনী দেবী আশার বচনে,
কত বল পাই মোরা মর মর প্রাণে ।
উৎসাহ উদ্যমে প্রাণ জেগে উঠে, তাই
অসত্যে সত্যের জ্যোতিঃ দেখিবারে পাই" ।
হেনকালে জ্যোতির্ম্ময়ী আশা আগুয়ান,
আশার আলোকে তার বাঁচিল পরাণ ।
সে জ্যোতিঃ সহিতে নারি নিরাশা পালায়,
আশার আশ্বাসবাণী শ্রুতি পথে ধায় ।
আশারাণী কত সাজে হৃদয়ে বিরাজে !
অমৃত সন্ধান কহে মরতের মাঝে ।
কহে রাণী তোমরা ত অমৃত-সন্তান,
নিরাশা তিমিরে কেন সদা মুহ্যমান ?
শুনেছি আড়ালে থাকি নিরাশার কথা,
কি কারণে পিশাচিরে স্থান দেও হেথা ।
মাতৃ-গর্ভে ভ্রূণ যথা নাহি জানে কভু,
কি লীলা করিবে তায় লীলাময় বিভু ;
সংসারের নাট্যশালে নট নটী সাজি,
কত কিবা অভিনয়ে রহিবে সে মজি ;
সুখদুঃখ হাসিকান্না পাপপুণ্য নিয়ে,
কত খেলা খেলিবে সে মরতে বসিয়ে !
তেমতি এ ধরিত্রীর জরায়ু গরভে,
মোহের আঁধারে ঘেরা অনুক্ষণ সবে ;
কেমনে বুঝিব হেথা এ পারে বসিয়ে,
কত কি সাধিব মোরা ওপারেতে গিয়ে !
মরণ ! মরণ নহে,—প্রসব-যাতনা—
সুখের প্রভাত আগে নিশির ছলনা ।

মৃত্যুই জনম তেই সাধুজন ভনে;
সহাস্যে বরয়ে তায় প্রেম আলিঙ্গনে।
সহস্র অমিয় ধারা ঝরে যেইখানে,
মরণ দেখায় সেই শান্তি-নিকেতনে।
আর কিছু নাহি জানি, জানি এই সার,
অনন্তের পথে, 'আমি তাঁর—সে আমার।'
এহেন সুহৃদ মৃত্যু জীবের কারণ,
অনন্ত জীবন হেতু, পথ সে মরণ।
'অমর, অমর নর' গম্ভীর নির্ঘোষে,
আর্য্যনারী ঘোষেছিল এ ভারতাকাশে।
শোন, দেবি মৈত্রেয়ীর সুধাময়ি বাণী.
এখনো ধ্বনিছে কর্ণে নাচিছে ধমনী।
এখনো সে তারস্বর, আশ্বাসিয়ে সবে,
"অমৃতস্য পুত্রাঃ" বলি সম্ভাষে মানবে।
পতিত ভারত এবে ঘুমে অচেতন,
আর্য্যরক্ত রিক্ত হায়! অসাড় শ্রবণ।
আমরা যে অমৃতের আত্মজ সন্তান;
কে রটিবে? গুপ্ত এবে ধর্ম্ম সনাতন!
জান না কি নর নারি! জগতের পতি,
করুণার প্রস্রবণ দয়ার মুরতি,
প্রেমবাহু প্রসারিয়ে যত জীবগণে,
লালিছে পালিছে বুকে রাখি সযতনে।
প্রেম-দয়া করুণার ত্রিবেণীর স্রোতে,
যেতেছে জগত ভাসি অনন্তের পথে।
নিরাশার কথা শুনে ভুলেছ নিয়তি,
তোমাদের ভাগ্যলিপি 'অনন্ত উন্নতি'।

শ্রীদীনবন্ধু মিত্র।

———:০:———

তীর্থ ভ্রমন।

(চতুর্থ সংখ্যায় পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ক্রমান্বয়ে দুইদিন দুইরাত্রি গাড়ীতে বাস করিয়া পরদিন রাত্রি প্রভাতসময়ে বোম্বাই ষ্টেশনে ট্রেন উপনীত হইল। গাড়ীতে অবস্থান কালীন আমরা কেবলমাত্র ফলমূল ভক্ষণ ও দুগ্ধপান করিয়া জীবনরক্ষা করিয়াছিলাম। আমরা গাড়ী হইতে নামিয়া সহরে প্রবেশ করতঃ জলেশ্বর শিব-বাড়ীর ধর্ম্মশালায় গমন করিলাম। কিন্তু ধর্ম্মশালাটী যাত্রীতে পরিপূর্ণ দেখিয়া অন্য ধর্ম্মশালায় গমন করি, তথায় যাইয়া দেখি যে, দ্বারের সম্মুখে তিনটী লোক প্লেগে মরিয়া রহিয়াছে; কাজেই বাধ্য হইয়া অপর একটী ধর্ম্মশালায় গমন করিলাম। এই ধর্ম্মশালাতে একজন দেশীয় লোক ম্যানেজার আছেন, তাঁহার অনুমতি লইয়া তথায় থাকিতে হয়। আমি তাঁহার নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিলে, প্রায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে তিনি গম্ভীরভাবে বলিলেন যে, "এখানে বঙ্গদেশীয় যাত্রীগণকে থাকিতে দেওয়া হয় না:" আমি নানারূপ অনুনয় বিনয় করিয়াও তাঁহাকে সন্মত করিতে পারিলাম না। অগত্যা বাহির আঙ্গিনাতে পাক করিয়া আহারাদি করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইবার অনুমতি চাহিলাম, তিনি কর্কশ স্বরে বলিলেন, "অতি সত্বর আপনাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া যাউন"। আমি তাহাই শিরোধার্য্য করিয়া স্নানাহ্নিক সমাধাপূর্ব্বক পাকের বন্দোবস্ত করিতেছি, এমন

সময় একজন দ্বারওয়ান আসিয়া উপস্থিত হইল। যমকিঙ্করের ন্যায় দ্বারবানের অভূচিত ভদ্র-ব্যবহারে এবং উৎপাতে পাকাদির বিশেষ বিঘ্ন উপস্থিত হইল। কি করিব একে বিদেশ; তাহার পর সামান্য একটা অশিক্ষিত চাকরের সঙ্গে বাগ্‌ড়া করা ন্যায়-সঙ্গত মনে করিলাম না। নীরবে সমস্ত সহ্য করিয়া যত সত্বর পারিলাম আহারাদি সম্পন্ন করতঃ এক টাকা ভাড়া স্থির করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে প্রথমতঃ তথাকার অধিষ্ঠাত্রী ৺মুম্বা দেবীকে দর্শন করিতে গেলাম। তাঁহারই নামানুসারে সহরের বোম্বে নাম হইয়াছে। বোম্বের অন্তর্গত এলিফেণ্ট বা গোরাদ্বীপে দেবীর মন্দির অবস্থিত। মন্দিরটী প্রায় ৭০ ফিট উচ্চ, পাহাড় কাটিয়া মন্দির বাহির করা হইয়াছে। মন্দিরাভ্যন্তরে দেবীর কটি-দেশ পর্য্যন্ত ত্রিমস্তক মূর্ত্তি অবস্থিত। শিবের মন্দিরও দেবীমন্দিরের সংলগ্ন। শিব লিঙ্গ-মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। আমরা দেবতা দর্শনান্তে প্রণাম করিয়া ও যথাসাধ্য প্রণামী দিয়া চরণামৃত গ্রহণ করিয়া সহর দেখিতে গেলাম। সহরটী কলিকাতা হইতে কোন অংশে নিন্দনীয় নহে; বরং সমুদ্রের ধার এবং জাহাজ থাকিবার স্থানটী আরও সুন্দর। আমরা সহর ভ্রমন করিয়া তিনটার সময় ষ্টেশনে আসিলাম। বোম্বের ষ্টেশনটী দেখিবার জিনিস—ভারতবর্ষে এমন একটীও আর সুন্দর ষ্টেশন নাই। ষ্টেশনে দশ পনরটী বাঙ্গালী বাবুর সহিত দেখা হইল, তাঁহারা সকলেই রেলওয়ে কর্ম্মচারী। যথা সময়ে আমরা প্রত্যেকে ৫।৵০ দিয়া নাসিকের টিকিট্ করিলাম।

আমরা বেলা পাঁচটার সময় বোম্বে হইতে রওনা হইয়া, পরদিন রাত্রি দুইটার সময় নাসিক ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম। ষ্টেশন হইতে সহরে যাইতে ঘোড়ার গাড়ী, গরুর গাড়ী এবং ট্রামও আছে। আমরা ষ্টেশনেই শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র সুব্রাহ্মণকে পাণ্ডা নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘোড়ার গাড়ীতে তাঁহার বাটী রওনা হইলাম। পথি মধ্যে সহর-টেক্স নামে একটা আফিস্ আছে, তথায় প্রত্যেক যাত্রীকে দুই আনা করিয়া টেক্স দিতে হয়। আমরা পাঁচ জনে দশ আনা দিয়াছিলাম। রাস্তার দুই পার্শ্বে অনেক কল-কারখানা ও ইংরাজের বাড়ী আছে। আমরা ইংরাজী স্কুলের সম্মুখে পাণ্ডার বাটীতে উপস্থিত হইয়া বিশ্রাম করিতে লাগিলাম। নাসিক কলিকাতা হইতে ১২৮৪ মাইল দূরে অবস্থিত। রামানুজ লক্ষ্মণ এই স্থানে সুর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া ছিলেন, তাই ইহার নাম নাসিক।

আমরা প্রাতে পাণ্ডার সহিত স্নান করিতে গেলাম। যে স্থানে স্নান করিলাম, তথায় গোদাবরী নদী ছোট ছোট পুষ্করিণীর ন্যায় চারিদিক পাথরের দ্বারা বাঁধান আছে। তন্মধ্যে তিনটী ঘাট আছে, তাহাদের নাম যথাক্রমে রামঘাট, লক্ষ্মণঘাট এবং সীতাঘাট। সীতা-ঘাটে কেহ স্নান করিতে পারে না; কারণ তাহার জল পানের জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অন্য দুই ঘাটে যাত্রিগণ স্নান করেন। আমরা স্নানান্তে সন্ধ্যাহ্নিক ও তর্পণাদি শেষ করিয়া পঞ্চবটী দর্শন মানসে রওনা হইলাম। সেই স্থানে লঙ্কাধিপতি দুর্জ্জয় রাবণ সীতাদেবীকে হরণ করিয়া ছিলেন। আমরা রাস্তায় নদীর ন্যায় একটী

খাল দৃষ্টে পাণ্ডাকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, লক্ষ্মণ মায়ামৃগের পশ্চাদ্ধাবিত রামের অনুসন্ধান করিতে যাইবার কালে, সীতাদেবীকে যে গণ্ডীর ভিতর রাখিয়া যান, এই খালটী অদ্যাপি তাহারই চিহ্ন রূপে বিরাজিত আছে আমরা আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, পাঁচটী বৃক্ষ একত্রে একস্থানে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু বৃক্ষ কয়টী শুষ্ক, চারিদিক প্রস্তর দ্বারা বান্ধান আছে। আমরা ঐ বৃক্ষপুঞ্জের চতুর্দ্দিক প্রদক্ষিণ করিয়া তথায় ভগবানের উদ্দেশে প্রণাম করিলাম। তথাকার জনৈক পাণ্ডা আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যে স্থানে সীতাদেবী অবস্থান করিতেন, তথায় লইয়া চলিলেন। সে এক বিষম কাণ্ড, পাহাড়ের নিম্ন দিকে একটী সঙ্কীর্ণ গহ্বর আছে, ঐ গহ্বরের ভিতর দিয়া নিম্নে যাইতে হয়। তথায় যাইতে প্রথমতঃ ভয় হইতে লাগিল, পাণ্ডা একটী প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ সঙ্গে অগ্রে অগ্রে চলিতে লাগিলেন, আমরা পশ্চাতে ধীরে ধীরে চলিলাম। প্রথমতঃ পদ দুইটী গহ্বর মধ্যে দিয়া ক্রমে অন্যান্য শরীর প্রবেশ করাইতে হয়। আমরা যাইয়া দেখি যে, উহার মধ্যে একটী স্থানে ভগবান্ রামচন্দ্র সীতাদেবী ও লক্ষ্মণের মূর্ত্তি আছে। মূর্ত্তি কয়টী পিত্তল-নির্ম্মিত। আর একটী গুপ্ত স্থানে একটী শিবলিঙ্গ আছেন। এই স্থানে রামচন্দ্র গোপনভাবে সর্ব্বদা শিবপূজা করিতেন। দর্শন ও প্রণাম করিয়া পূর্ব্ব রাস্তায় গহ্বর দিয়া উপরে উঠিলাম। এই স্থানের দৃশ্য বড় সুন্দর,—শান্তি-রসাস্পদ।

তৎপরে তথা হইতে রওনা হইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে গেলাম; এই মন্দির সম্প্রতি এক গুজরাটী বণিক মূল্যবান্ প্রস্তরের দ্বারা প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। মন্দিরের মধ্যে ভগবান্ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ ও সীতাদেবীর পাষাণময়ী মূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তথা হইতে তাঁহাদের বৈঠকখানা দেখিতে গেলাম। বৈঠকখানা নানারূপ জাঁকজমকে সজ্জিত। ঝাড়, লণ্ঠন, দেওয়ালগিরি ও বড় বড় আয়না দ্বারা সাজান আছে। এই সমস্ত দর্শন পূর্ব্বক বাসায় পৌঁছিয়া আহারাদি সমাধান্তে বিশ্রাম করিলাম।

বৈকালে চারিটার সময় পুনরায় পাণ্ডাকে সঙ্গে করিয়া তপোবন দর্শন করিতে রওনা হইলাম। বাসা হইতে প্রায় এক ক্রোশ যাইতে হইল। রাস্তার দুই পার্শ্বে জঙ্গল এবং মধ্যে মধ্যে সাধু মহাত্মাগণের বাসের জন্য ছোট ছোট নূতন ও পুরাতন দালান আছে। কোন কোনটীতে বিগ্রহও স্থাপিত আছে। তপোবনের দৃশ্য অতিশয় আনন্দজনক!—দেখিলে বোধ হয় আজিও যেন তাপসগণ তথায় বাস করিতেছেন; চতুর্দ্দিকে তাঁহাদের তপঃ প্রভাব বিকীর্ণ রহিয়াছে। এই স্থানে সুমিত্রানন্দন লক্ষ্মণ রাবণের ভগ্নী শূর্পনখার নাসিকাচ্ছেদন করিয়া ছিলেন। এই স্থানে গোদাবরী নদীর একটী সঙ্কীর্ণ শাখা কপিল-গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। তথায় একটী নাতিউচ্চ পর্ব্বত গাত্রে শূর্পনখার নাককাটা মূর্ত্তি আছে। তাহার কিছু দূরে একটী কুণ্ড আছে। তথায় সংকল্পপূর্ব্বক জল স্পর্শ করিতে হয়। তজ্জন্য অন্য একটী পাণ্ডাকে কিছু দক্ষিণা দিতে হয়। এই তপোবনটী দর্শন করিলে দর্শকের মনে আপনা হইতে পবিত্রতায় পূর্ণ হইয়া যায়। আমরা তপোবন দর্শন করিতে করিতে সন্ধ্যা উপস্থিত

হওয়ায় বাধ্য হইয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম। নাসিক সহরটী সুন্দর এবং খাদ্যদ্রব্য সমস্তই ভাল পাওয়া যায়। এখানকার তরমুজ অতি মিষ্ট ও অন্যান্য ফল মূল যথেষ্ট মিলে। আমরা এখানে সে রাত্রি বাস করিয়া পরদিন আহারান্তে দুইটার সময় ষ্টেশনে উপস্থিত হইলাম এবং প্রত্যেকে ১॥৶ দিয়া "ভূষওয়ালের" টিকেট্ করিলাম।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় নাসিক হইতে রওনা হইয়া পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় 'ভূষওয়াল' ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। গাড়ী হইতে নামিয়া "মুসাফেরখানায়" বাসা লইলাম। এই স্থানে প্রত্যেক যাত্রীকে প্রতিদিনের জন্য এক পয়সা করিয়া ভাড়া দিতে হয়। ষ্টেশন হইতে তাপ্তি নদীতে স্নান করিতে প্রায় অর্দ্ধ ক্রোশ পদব্রজে যাইতে হয়। তাপ্তী নদীতে স্নান করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ হয়। আমরা আহারাদি করিয়া আবার রাত্রিতেই 'ইউরণী' রওনা হইলাম। প্রত্যেকে ২৸৶ আনা দিয়া 'ইউরণী' ষ্টেশনের টিকেট্ করিলাম। রাত্রি এগারটার সময় ট্রেন ছাড়িল, পরদিন অপরাহ্ণ পাঁচটার সময় 'ইউরণী' জংসনে উপস্থিত হইলাম। রাত্রিতে এখানে বিশ্রাম করিয়া পরদিন বেলা আট্টার সময় 'মিরগঞ্জ' রওনা হইলাম। এখান হইতে 'মিরগঞ্জের' রেলভাড়া প্রত্যেকের দেড় টাকা লাগিয়া থাকে। সন্ধ্যা সাতটার সময় 'মিরগঞ্জ' ষ্টেশনে ট্রেন পৌছিল। আমরা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া ষ্টেশনের পশ্চাদ্ভাগের আঙ্গিনায় রাত্রি বাসের ব্যবস্থা করিয়া লইলাম। কারণ ষ্টেশনটী ছোট, এখানে যাত্রিগণের বিশ্রামের জন্য উপযুক্ত গৃহাদির বন্দোবস্ত নাই। দোকানাদিও নাই, কেবল একঘর বুনো এবং ষ্টেশনমাষ্টারের বাসা আছে। আর কেবল পাহাড় ও জঙ্গল। আমরা রাত্রিতে ছাতু এবং ফল-মূলাদি দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করিয়া নিদ্রিত হইয়া পড়িলাম।

এই ষ্টেশনের দুই ক্রোশ দূরে নর্ম্মদা নদীর প্রসিদ্ধ স্থান ভেড়াঘাট। নর্ম্মদা নদীর ভেড়াঘাটে স্নান করিবার জন্যই যাত্রিগণ 'মিরগঞ্জ' ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া থাকে। নর্ম্মদা পুণ্যসলিলা নদী—সপ্ত গঙ্গার অন্যতম। এই নদী বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে উৎপন্ন হইয়া ভরোচের নিকট সাগরের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইহার অন্য নাম রেবা। উৎপত্তি স্থানের নাম অমরকণ্টক, তাহাও অতীব পুণ্যক্ষেত্র এবং ইহার তীরবর্ত্তী প্রত্যেক স্থানই মহাতীর্থ। এই নদীর তীরে বহু সাধু সন্ন্যাসীর আশ্রম আছে। নর্ম্মদা-সাগর সঙ্গমে স্নান করিলে জন্ম-জন্মান্তরের কৃত পাতকরাশি বিনাশ প্রাপ্ত হয়। সাগর সঙ্গমের নিকট 'ভৃগুঘাট' বিখ্যাত তীর্থ। নর্ম্মদা নদী তাপ্তী নদী অপেক্ষা অধিকতর বেগবতী। "নর্ম্মদার কঙ্কর শঙ্কর রূপে" পূজিত হয়। এই নদীতে বাণ-লিঙ্গ নামক শিলারূপী শিবলিঙ্গ পাওয়া যায়।

আমরা প্রাতে উঠিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে ভেড়াঘাট রওনা হইলাম। ষ্টেশন হইতে ঘাটে যাওয়ার জন্য বাঁধা রাস্তা আছে। দুই পার্শ্বে পর্ব্বত, মধ্য দিয়া রাস্তাটী। আমরা কিছু দূর গমন করিলে, ঘাটের পাণ্ডার সহিত সাক্ষাৎ হইল। পাণ্ডার সহিত আমার পূর্ব্ব হইতে পরিচয় ছিল। তাঁহার সঙ্গে রওনা হইয়া বেলা নয়টায় ভেড়াঘাট উপ-

নীত হইলাম। তথায় নদীর তীরেই একটী বাড়ীতে বাসা স্থির করিয়া লইলাম। খাদ্য-দ্রব্যাদি এখানে যথাসম্ভব পাওয়া যায়, বিশেষতঃ দধি দুগ্ধ যথেষ্ট মিলে। আমরা বেলা দশটার সময় নর্ম্মদায় স্নান, তর্পণ ও নিত্যক্রিয়া সমাপন করিলাম। স্নানের ঘাট প্রস্তর নির্ম্মিত এবং মধ্যে মধ্যে পাণ্ডের টাটী আছে। নর্ম্মদার জল অত্যন্ত পরিষ্কার; তলদেশের ছোট ছোট মৎস্যগুলি পর্য্যন্ত দেখা যায়। পূর্ণিমা তিথিতে নর্ম্মদার তীরে মেলা হয়। এতদঞ্চলের বহুলোক তথায় উপস্থিত হইয়া নর্ম্মদায় স্নান ও মেলায় কেনাবেচা করে। দুই তিন দিবস মেলা থাকে, তৎপরে সকলে চলিয়া যায়। আমরা আহারান্তে বিশ্রাম করিয়া বৈকালে নদী ও পর্ব্বতের স্বভাব-সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করিয়া বেড়াইলাম। রাত্রে আহারান্তে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িলাম।

রজনী প্রভাত হইলে নর্ম্মদার বিখ্যাত জলপ্রপাত দেখিতে যাত্রা করিলাম।—আমাদের বাসা হইতে তথায় এক ক্রোশ যাইতে হয়। আমরা রাস্তার দুই পার্শ্বে মন-প্রাণ প্রফুল্লপ্রদ প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী দেখিতে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। পথে দুইটী ইংরাজের কবর দেখিলাম। কবর গাত্রে লেখা আছে "আর যেন কোন ইংরাজের এরূপ দুর্ব্বুদ্ধি না হয়, হইলে আমাদের দশা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।" কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া পাণ্ডার নিকট অবগত হইলাম, এই দুই জন ইংরাজ মৌমাছির চাক্ ভাঙ্গিতে গিয়া মারা পড়িয়াছে। এই স্থানে পাহাড়ের উপর বিখ্যাত একটী মন্দির (হিন্দুটেম্পল) আছে, আমরা অগ্রে তাহাই দর্শন করিতে গেলাম। তথায়, শিব-শক্তি— গৌরী-শঙ্কর নামে পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে বিরাজিত আছেন। তাঁহারা জাগ্রত দেবতা বলিয়া বিশ্রুত। যখন দেবদ্বেষী কালাপাহাড় এখানকার সমস্ত দেব দেবী ভগ্ন করে, সেই সময় গৌরী-শঙ্করেরও হস্ত কর্ত্তন করিয়াছিল; কিন্তু হাতে দিয়া রক্ত বহির্গত হইলে মূর্ত্তি নষ্ট বা বিকলাঙ্গ করিতে সাহস পায় নাই। অদ্যাপিও তাঁহাদের বিশেষ ভাবে অর্চ্চনা হইয়া থাকে। অন্যান্য মূর্ত্তিগুলি বিকলাঙ্গ হইয়া যবন-অত্যাচারের জলন্ত সাক্ষ্য দিতেছেন। আমরা দেবতা দর্শন করিয়া বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

পরদিন প্রাতে সাতটার সময় প্রসিদ্ধ মার্ব্বেলের পাহাড় দেখিবার জন্য রওনা হইলাম। উহা পরিদর্শন করাইবার জন্য একটি সরকারী আফিস্ এবং দুই খানি বোট্ ও চারি জন মাঝি আছে। প্রত্যেক দর্শককে আট আনা করিয়া 'ফিস্' দিতে হয়। এবং এক খানি বড় খাতায় দর্শকগণের নাম ধাম ও কত 'ফিস্' দেওয়া হইল লিখিয়া দিতে হয়। অমরা তিন জনে দেড়টাকা 'ফিস্' দিয়া নাম ধাম লিখিয়া দিলাম। তৎপরে চারি জন মাঝি আসিয়া আমাদিগকে বোটে উঠাইল। বোট ধীরে ধীরে নর্ম্মদার মধ্য-দিয়া চলিতে লাগিল। নদীর দুই পার্শ্বে পাহাড়, মধ্যে মধ্যে শিব স্থাপিত রহিয়াছে। ঐ পাহাড়ের গায়ে প্রায় তিন চারি হাজার মৌচাক্ দেখিলাম। তাহারা কোন যাত্রীকে বিনা কারণে আক্রমণ করে না; ইতিপূর্ব্বে দুইজন সাহেব উৎকট সখের বশবর্ত্তী হইয়া-মধুচক্রে বন্দুকের গুলি চালাইয়া জীবন

হারাইয়াছে। গতকল্য তাহাদেরই কবর দেখিয়াছিলাম। আমরা প্রায় দেড় মাইল যাইয়া মার্ব্বেলের শ্বেত ও নীলবর্ণের পাহাড় দেখিতে পাইলাম। মার্ব্বেল পাহাড় দেখিবার জিনিস। পাহাড় দেখিয়া ভগবানের অনন্ত মহিমার কথা মনে উদয় হইতে লাগিল; আর আনন্দে শরীর পুলকিত হইল। সে যে কি আশ্চর্য্য দৃশ্য তাহা চক্ষে না দেখিলে অনুভব করা যায় না,—ভাষায় ব্যক্ত করা বিড়ম্বনা মাত্র। একটী শ্বেত মার্ব্বেল পর্ব্বতের গাত্রে—কতকটা স্থানে অনেকগুলি ধাপের ন্যায় দেখিয়া পাণ্ডাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। পাণ্ডা বলিলেন,— "এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, যখন ইন্দ্রদেব নর্ম্মদায় স্নান করিতে আসিতেন, তখন তাঁহার হস্তীর পদচিহ্নে ঐ ধাপ গুলি নির্ম্মিত হইয়াছিল।" আরও কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া দেখি যে, নর্ম্মদার তীরে একটী গহ্বরের মধ্যে একজন সন্ন্যাসী বসিয়া আছেন। আমরা বোট্ হইতে নামিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলাম। তিনি কোন কথাবার্ত্তা কহিলেন না, হস্তোত্তলন করিয়া আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিলেন; এবং সঙ্কেতে আমাদিগকে আর অগ্রসর হইতে নিষেধ করিলেন। তথায় বহুতর মৌমাছি ভন্ ভন্ করিয়া চতুর্দ্দিকে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আমাদিগকে আক্রমণ করিবে বলিয়া সত্বর বোটে উঠিলাম এবং সাধুবাক্য লঙ্ঘন না করিয়া তথা হইতে বোট্ ফিরাইলাম। বেলা সাড়ে দশঘটিকার সময় যথাস্থানে বোট্ হইতে অবতরণ করিলাম। এখানে যে সকল বড়লোক ও সাহেবেরা আসিয়া থাকেন, তাঁহারা কেহই এই মার্ব্বেল পাহাড় না দেখিয়া প্রত্যাগমন করেন না। আমরাও জগৎপিতা জগদীশ্বরের আশ্চর্য্য বিশ্বসৃষ্টি-লীলা দর্শন-পূর্ব্বক ভক্তি-প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে বেলা এগার-টার সময় বাসায় আসিয়া পৌঁছিলাম এবং মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়াকলাপ সমাপনান্তে বিশ্রাম করিলাম।

এখানে ভাল ভাল বাণলিঙ্গ শিব পাওয়া যায়। এখানকার অধিবাসিগণ শিব প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করে। এখানকার কয়েকটী কুণ্ডেতেও ভাল ভাল শিব পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বাণকুণ্ডের শিব গৃহস্থের মঙ্গলদায়ক। এই সমস্ত কুণ্ডের জমা আছে। গৌরী-শঙ্কর শিবের মহন্ত এই সমস্ত কুণ্ডের কর আদায় করিয়া থাকেন। বাণকুণ্ডের একটী শিব আনিতে হইলে তিন টাকা মূল্য দিতে হয়। অন্যান্য কুণ্ডের শিবের জন্য দুইটাকা হইতে আড়াই টাকা মূল্য নির্দ্ধারিত আছে।

আমরা ত্রিরাত্রি তথায় বাস করিয়াছিলাম। আমরা এখানে শ্রীযুত মহাবীর পাণ্ডাকে পাণ্ডা করিয়াছিলাম। তিনি অতিশয় ভদ্র ও সজ্জন ব্যক্তি। আমরা স্বেচ্ছায় তাঁহাকে যাহা দিয়াছিলাম, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আমরা যে দিন মার্ব্বেল পাহাড় দেখিতে যাই, তাহার পরদিন আহারান্তে রওনা হইয়া বেলা চারিটার সময় 'মিরগঞ্জ' ষ্টেশনে উপস্থিত হই। 'মিরগঞ্জ' হইতে প্রত্যেকে ৭৶১৫ দিয়া হুগলির 'থ্রু'টিকেট্ করিলাম। অপরাহ্ন পাঁচটার সময় মিরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে ট্রেন ছাড়িল। আমরা জব্বলপুর হইয়া একরাত্রি

একদিন ক্রমাগত চলিয়া অপর রাত্রির সাড়ে চারিটার সময় হুগলি ষ্টেশনে উপনীত হইলাম। অর্দ্ধঘণ্টা পরে 'নৈহাটীর' গাড়ীতে গঙ্গাপার হইয়া ভোরে নৈহাটী ষ্টেশনে অবতরণ করিলাম। হুগলি হইতে নৈহাটীর ভাড়া তিন পয়সা মাত্র। নৈহাটীতে শ্রীযুত গুরুদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাসায় একদিন বিশ্রাম করিয়া পরদিন রাত্রি সাড়ে নয়টার সময় ২॥৶ দিয়া সেরাজগঞ্জের টিকেট্ করতঃ গাড়ীতে উঠিলাম। ভোরে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে উপনীত হইয়া গৌহাটীর মেল ষ্টীমারে উঠিলাম; এবং সেই দিন অপরাহ্ন তিনটার সময় বাটীতে উপস্থিত হইলাম। বিশ্বাত্মা ও মা বিশ্বজননীর কৃপায় মঙ্গলমতেই বাটীতে আসিয়াছি, কোন অসুবিধা ভোগকরিতে হয় নাই।

শ্রীসারদাপ্রসাদ মজুমদার।

—:0:—

স্মৃতি-চিহ্ন।

তুমি ফুল প্রাণেশের প্রিয় উপহার,
তাইত সুষমা এত বদনে তোমার;
মায়াডোরে বদ্ধ আমি ভব কারাগারে,
ষড় রিপু নাশি বিভু উদ্ধারিবে মোরে;
ভুলেনি আমাকে তিনি, তুমি চিহ্ন তার,
পাঠায়েছে প্রেমময় প্রীতির সম্ভার।
শোকাকুলা সীতাদেবী অশোক কাননে
রাঘবের অঙ্গুরীয় হেরিয়া নয়নে,
উৎসুক হৃদয়ে যথা ভাবিতেন নিতি,
উদ্ধার করিতে এই এল রঘুপতি।
সেই রূপ প্রিয় ফুল তব দরশনে
আশায় উৎফুল্ল আমি, চেয়ে পথ পানে
ভাবি নিতি, কবে কোন শুভক্ষণে আসি,
উদ্ধারিবে প্রেমময় ষড়রিপু নাশি।

শ্রীমতী ননীবালা বসু।

—:0:—

ভক্তি।

ভক্তি লাভ করিতে হইলে অগ্রে "ভক্তি কি" তাহা বিশেষরূপে বুঝিতে হইবে। ভক্তি কাহাকে বলে?——

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে।

শাণ্ডিল্য সূত্র।

শাণ্ডিল্য ঋষি বলেন;—"পরমেশ্বরে পরম অনুরক্তিকেই ভক্তি বলে"। যাহার দ্বারা পরম পুরুষ ভগবানের কৃপা আকৃষ্ট হয় ও বাসনা সকল পুরণ করে, তাহাই ভক্তি। সোজা কথায় ভক্তি অর্থে, ভগবানে পরমপ্রেম। যথা:—

সা কস্মৈ পরম প্রেমরূপা।

নারদ সূত্র।

জ্ঞান-কর্ম্ম ভুলিয়া, বাসনা-কামনা ভুলিয়া, সুখ-দুঃখ ভুলিয়া, ধর্ম্মাধর্ম্ম ভুলিয়া, ধনৈশ্বর্য্য ভুলিয়া, স্ত্রী-পুত্র এমন কি আপনা ভুলিয়া ভগবানে যে ঐকান্তিক অনুরক্তি, তাহার নাম ভক্তি। ভক্ত প্রবর প্রহ্লাদ ভগবানকে বলিয়া

ছিলেন;—

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসর্পতু॥
বিষ্ণু পুরাণ।

"অবিবেকিগণের ইন্দ্রিয় বিষয়ে যেরূপ প্রবল আসক্তি, হে ভগবন্! তোমার প্রতি আমার হৃদয়ের সেরূপ আসক্তি যেন অপগত না হয়"। ইহার ভাবার্থ এই যে, ফল হেতু বিচারশূন্য হইয়া ভগবানের প্রতি যে ভক্তি, তাহাই প্রকৃত ভক্তি।

এই ভক্তি যিনি লাভ করিয়াছেন, তিনিই ভক্ত। ভক্ত ভগবানে আত্মহারা হইয়া যান। তিনি ভক্তিভাবে বিভোর হইয়া ভগবানকে আপনার ভাবিয়া তাঁহাকেই সর্ব্বত্র পরিদর্শন করেন। জলে, স্থলে, চন্দ্রে-সূর্য্যে, গ্রহ-নক্ষত্রে, মেঘ-সাগরে, গঙ্গায়-গোদাবরীতে, কাশী-প্রয়াগে, অগ্নি-বায়ুতে, অশ্বথ ও বটে,—সর্ব্বঘটেই বিশ্ব-ব্যাপীরূপে তাঁহাকে দেখিয়া,—তাঁহাতেই আত্ম-সমর্পিত হইয়া—মনবুদ্ধি অহঙ্কার প্রভৃতি সমস্ততত্ত্ব তাঁহার চরণে অর্পণ করিয়া ভক্ত কৃতার্থ হইয়া থাকেন। ভক্ত আকুল কণ্ঠে ভগবান্‌কে বলেন,—প্রভো! তুমি সকলের সব; সবের সকল। আমি যে তপ, জপ, পূজা, হোম, ব্রত, নিয়ম কিছুই জানি না। আমি তোমাকে ভিন্ন কিছুই চাই না। তোমাকে পাইলে আমি কৃতকৃতার্থ হইয়া যাইব। প্রাণাধিক! তুমি দয়াকর—আমায় তোমার চরণরেণু করিয়া লও।

ভগবান্‌ও এই ভক্তির অধীন। ভক্তের উপহার তিনি যেমন প্রীতিপূর্ব্বক গ্রহন করিয়া থাকেন, এমন আর কিছুই নহে। ভক্তিপূর্ব্বক ডাকিলে, তিনি না আসিয়া থাকিতে পারেন না। ভক্তিতে পিত্তলের প্রতিমা অন্ন ভক্ষণ করেন, ভক্তিতে নোলক পরিবার জন্য পাষাণ-প্রতিমার নাকে ছিদ্র হয়, ভক্তিতে শালগ্রাম শীলা অলঙ্কার পরিবার জন্য হস্ত বাহির করেন, ভক্তিতে এমন হয়; ভক্তির অসাধ্য জগতে কিছুই নাই। তাই ভক্ত-চূড়ামণি প্রহ্লাদের ভক্তিতে স্ফটিকস্তম্ভ বিদীর্ণপূর্ব্বক নৃসিংহমূর্ত্তির আবির্ভাব হইয়াছিল। ভগবান্ ভক্তাধীন,—ভক্তির জন্য তিনি ক্রীড়া-পুত্তলী। সমস্ত ইন্দ্রিয়শক্তির সহিত মনের তদ্গত ভাবকেই ভক্তি বলা যায়। তাহা হইলেই ভক্তিকে ইচ্ছা শক্তির ঐকান্তিকী স্বমুখী বৃত্তি বলা যাইতে পারে। ইচ্ছা শক্তির (Will force) ঐকান্তিকী চালনে তিনি মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। সমুদ্রের জল যেমন আত্যন্তিক শৈত্যে জমিয়া বরফ হয়, তদ্রূপ নিরাকার, নির্ব্বিকার, অনন্ত, চিন্ময় ভগবান্ ভক্তের ঐকান্তিকী ইচ্ছাশক্তির বলে চিন্মন হইয়া প্রকাশিত হন—জগন্ময়, মনোময়-রূপে আসিয়া দেখা দেন। যেমন দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত দায়রার বিচারপতি তদীয় শিশু-পুত্রের অনুরোধে বিদ্যা, বুদ্ধি ও শক্তিশালী মানুষ হইয়াও ঘোড়া সাজিতে বাধ্য হ'ন, তদ্রূপ জ্ঞানময় ও শক্তিময় বিরাট্ ভগবান্ ভক্তের আব্দারে তাহার মনোময়ী মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া থাকেন। উক্ত বিচারপতির সহিত অপরে কথা বলিতেও ভীত—সঙ্কুচিত হয়; কিন্তু তদীয় পুত্র তাঁহার গোঁপ ধরিয়া ঘোড়া হইতে বাধ্য করে, তদ্রূপ অপরে ভগবানের বিশ্বরূপ ও বিরাট্ বিভূতি দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যায় বটে; কিন্তু যে ভাগ্যবান্ ব্যক্তি ভগবানের কৃপায় তাঁহাকে "আমার" বলিয়া

জানিয়াছেন, সেই ভক্তের নিকট ভগবান্ তাঁহার ইচ্ছানুসারে মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উদয় হ'ন। এ তত্ত্ব ভগবদ্-কৃপা ব্যতীত অন্যরূপে হৃদয়ঙ্গম হয় না।

অনেকে মনে করে, জ্ঞান ভক্তির বিরোধী। সেই হেতুবাদে অস্মদ্দেশে বহুকাল ধরিয়া জ্ঞান ও ভক্তি লইয়া বাদানুবাদ চলিতেছে। জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড়, ইহা লইয়া অনেক তর্ক বিতর্ক হইয়া গিয়াছে। অধুনা জ্ঞান মার্গের সাধকগণ ভক্তি-মার্গের সাধক দেখিলে 'বিটল' উপাধিতে বিভূষিত করেন; আর ভক্তি-মার্গের সাধকগণ জ্ঞান-মার্গের সাধক দেখিলে "অরসিক" বলিয়া উপেক্ষা করেন। কেহই তাহাদের স্বীয় আচরণের ভাবী বিষময় ফলের কথা চিন্তা করেন না, হিংসাদ্বেষ-কলুষিত-চিত্তে সে চিন্তার অবসরও হয় না। ভক্তগণ বলেন,—"জ্ঞানে মিষ্টত্ব আছে বটে, কিন্তু অত্যন্ত শুষ্ক — যেমন মিশ্রি।" আর জ্ঞানী বলেন; — "ভক্তি সুপেয় বটে কিন্তু তেমন মিষ্টত্ব নাই — যেমন দুগ্ধ।" কিন্তু তাঁহারা কেহই বুঝেন না যে, এই দুগ্ধ ও মিশ্রি কর্ম্মের আবর্ত্তনে মিশ্রিত হইলে ত্রি-সমন্বয় ঘনামৃত অতি সুস্বাদু সরবত প্রস্তুত হইবে। জ্ঞানী বুঝেন না যে, দুগ্ধের সাহায্যে মিশ্রি গলিয়া অদৃশ্য হইলেও তাহার অস্তিত্ব কখনই লোপ হইবে না। আর ভক্ত বুঝেন না যে, মিশ্রির সাহায্যে দুগ্ধের আস্বাদ যদিও অন্যরূপ হয়, তথাপি সে রূপান্তরিত হইবে না; বরং মিশ্রি তাহার মাধুর্য্যই বাড়াইয়া দিবে। অধিকন্তু জ্ঞানী ও ভক্ত উভয়ের কেহই বুঝেন না যে, জ্ঞান ও ভক্তির শুভসম্মিলনেই ধর্ম্মের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত। এই মর্ম্ম-রহস্য সাধারণে অবগত নহে বলিয়াই আজ হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপে শত শত পরগাছা গজাইয়া ইহাকে জীর্ণ শীর্ণ শুষ্ক কাষ্ঠে পরিণত করিয়াছে।

অতএব জ্ঞান কখনই ভক্তির বিরোধী নহে। ব্যবহারিক জ্ঞান অবশ্যই ভক্তির বিরোধী হইতে পারে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তির স্থান কোথায়? চিৎ ব্যতীত কি আনন্দের বিকাশ হইতে পারে? মনে যে সংস্কার থাকে, ইন্দ্রিয়-পথে বিষয়বোধে তাহার বিকাশ; বিকাশ হইলেই জ্ঞান হয়, জ্ঞান-হইলেই ভক্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। ভক্তি লাভ হইলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন নাই। শাস্ত্রেও এই কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথাঃ—

জ্ঞানেন জ্ঞেয়মালোক্য জ্ঞানং পশ্চাৎ পরিত্যজেৎ।
উত্তর গীতা।

জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞেয় বস্তু লাভ হইলে আর জ্ঞানে প্রয়োজন কি? সাধক যখন জ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে জানিতে পারেন, তখন জ্ঞানকে দূর করিয়া দেন;—জ্ঞান আপ-নিই দূর হইয়া যায়। জ্ঞান ও ভক্তি সহোদর ভাই ও ভগ্নী। জ্ঞানকে না জানাইয়া ভক্তি কোন স্থানে যাইলে কালে জ্ঞান ছোট ভগ্নীটীকে ভৎর্সনা করিয়া তুলিয়া লইয়া যাইতে পারে। তাই একবার যে হৃদয়ে ভক্তির বিকাশ দেখা গিয়াছে; কালে সে হৃদয়েও দানবের তাণ্ডব নৃত্য দেখিতে পাওয়া যায়; তাই তখন ভক্তির পরিবর্ত্তে নাস্তিকের কঠোর কর্কশ আরাব শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু জ্ঞান যে স্থানে ভক্তিকে বসাইয়া দেন, সেখানে ভক্তির কোন প্রকার সঙ্কোচ থাকেনা। তবে জ্ঞান বড় ভাই; —তাহার নিকট বালিকা

ভক্তি সর্ব্বদাই সরমে জড় সড় হইয়া যায়। বিশেষতঃ জ্ঞান পুরুষ মানুষ, সকল স্থানে তাহার যাওয়া সম্ভবে না; ভক্তি বালিকা— কাজেই অন্তঃপুরের সর্ব্বস্থানেই তাহার গতি। যেখানে কূট তর্কের হিজিমিজি — অধিক দন্ত কিচিমিচি, সেখানে ভক্তি যায় না। সে চায় শুদ্ধ বুদ্ধ সরল স্থান, — বিচার বিতর্ক বুঝেনা। তবে জ্ঞানের সঙ্গে যাইতে তাহার কোন আপত্য নাই। তাহারা ভাই-ভগিনীতে যেখানে থাকিবে সে স্থান এক দৈব আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। সেখানে পারিজাতের গন্ধ ছুটিবে, — স্বর্গের মন্দাকিনী আপন উজানবাহিণী ক্ষীরধারা লইয়া সে স্থান বিধৌত করিয়া দিবে। এই সময় জ্ঞান অন্তরালে বসিয়া স্নেহ চক্ষে ভগিনীকে নিরীক্ষণ করিবে, আর বালিকা অসঙ্কোচে একাকিনী কত ক্রীড়া — কত আনন্দ — কত লীলা করিবে। তখন সেই শুভ্রা-শীতলা-মধুরা-পিযূষ-বরণা-আলোক-আনন্দময়ী-বালিকা রূপিনী ভক্তি ভক্তের হৃদয়াসনে মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে উপবিষ্ট হইয়া হৃদয়দ্বার খুলিয়া দেন। অমনি জগৎ আনন্দময় হইয়া উঠে,— হৃদি-তন্ত্রে শান্তির শত প্রেমধারা বহিতে থাকে। সকলেই সেই আনন্দ-ময়ীর ক্রোড়ে নৃত্য করিতেছে দেখিয়া ভক্ত কৃতার্থ হন।

অতএব জ্ঞান, ভক্তি পথের অন্তরায় নহে। বরং দুই ভ্রাতা ভগিনীতে বড়ই প্রীতি, কেহ কাহাকেও এক দণ্ড ছাড়িয়া থাকিতে পারেনা। যদি কাহাকেও জ্ঞানী বলিয়া বুঝিতে পারিয়া থাক, অনুসন্ধান করিও দেখিবে পশ্চাতে ভক্তি লজ্জা বিনম্রবদনে দাদার হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তদ্রূপ ভক্তের হৃদয় খুঁজিলেও দেখিতে পাইবে ভক্তিকে ক্রোড়ে করিয়া জ্ঞানই বসিয়া আছে। ভক্তি কোন কারণে সঙ্কুচিতা হইলেই জ্ঞান সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবে। প্রেমের মূর্ত্তিমতী প্রতিমা সরলা গোপবালিকা-গণ ভক্তিতে উন্মত্ত হইয়া যে দিন শ্রীকৃষ্ণের বাঁশরীস্বরে বিবশা হইয়া পূর্ণিমা রাত্রিতে তাঁহার নিকট ছুটিয়াছিল; শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানহীনা গোপবালাগণকে কতরূপে বুঝাইয়া ভক্তির উদ্ভ্রান্ত উচ্ছ্বাসকে রোধ করিতে চেষ্টা করিয়া-ছিলেন। সে দিন হ্রস্ব-দীর্ঘ-বোধ-বিবর্জ্জিতা গোয়ালার মেয়ে কিরূপ জ্ঞানের পরিচয় দিয়া শ্রীকৃষ্ণকে নিরুত্তর করিয়াছিল, তাহা শ্রীমদ্ভাগ-বতে দ্রষ্টব্য। তাই বলিতেছিলাম, একের আধিক্য দেখিয়া অন্যের অস্তিত্ব অস্বীকার করিলে চলিবে কেন? একের বিদ্যমানে অন্যের বিদ্যমানতা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কারণ উভয়েই অচ্ছেদ্য সম্বন্ধে সম্বন্ধ। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে, বরং জ্ঞানই ভক্তিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া আইসে। তবে কথা এই যে, ভক্তি আসিয়া একবার সমস্ত হৃদয়টা জুড়িয়া বসিলে আর জ্ঞানের প্রয়োজন কি? যে ব্যক্তি আম খাইয়াছে তাহার আর রাসায়নিক বিশ্লেষণের প্রয়োজন নাই। জ্ঞান একাকী যেখানে সেখানে যাইতে পারে, কিন্তু ছোট ভগিনীকে যাইতে দিবে কেন,—বরং সে একাকিনী যেখানে সেখানে যাইলে কালে জ্ঞান তাহাকে ধমকাইয়া লইয়া আসিবে। জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি কোথাও যাইতে পারে না। সুতরাং জ্ঞান ভক্তির বিরোধী নহে,—ভক্তির প্রতিষ্ঠাতা। তবে ভক্তি প্রতিষ্ঠিত হইলে তখন আর জ্ঞানের প্রয়োজন হয় না। তখন ভক্তিই নাচিয়া হাসিয়া

কত রঙ্গে বিরঙ্গে ক্রিয়া করিয়া বেড়ায়।

জ্ঞান অর্থে ঈশ্বরসত্ত্বায় পূর্ণ বিশ্বাস। কতকগুলা বই পড়া বা কথা জানাকে জ্ঞান বলে না। সংশয়শূন্য হইয়া ভগবানের অস্তিত্বে বিশ্বাস করাকে—সোজা কথায়, ঈশ্বরসত্ত্বা উপলব্ধি করাকেই জ্ঞান বলে। সংশয় থাকিলে কি প্রকারে ভক্তির ভাব সে হৃদয়ে দাড়াইতে পারিবে? একের অবস্থান-আধারে অন্যের অবস্থান সম্ভব কোথায়! সুতরাং জ্ঞান ব্যতীত ভক্তি যে আসিতে পারেনা, তাহা অবিসংবাদীরূপে প্রমাণিত হইল। যখন কর্ম্মযোগের দ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইবে, জ্ঞানযোগের দ্বারা আত্ম-পরমাত্ম জ্ঞান হইবে, তখনই ভক্তি আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করিয়া আপন আসন পাতিয়া বসিবে।

এই ভক্তি দ্বারাই একমাত্র ভগবান্ লভ্য হন। জীবের কতটুকু শক্তি যে তদ্দ্বারা অনন্ত শক্তিময়কে আয়ত্ত করিবে,—জীবের কতটুকু জ্ঞান যে জোনাকী পোকা হইয়া সূর্য্যকে প্রকাশিত করিবে, সুতরাং একমাত্র ভক্তি ব্যতীত জীবের উপায় কি? ভগবান্ নিজ মুখে ভক্তি ও ভক্তের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়া বলিয়াছেন;—

অপিচেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

হে অর্জ্জুন! অতি দুরাচার লোকও যদি অনন্যচেতা হইয়া আমার ভজনা করিতে থাকে, তবে তাহাকে সাধু বলিয়া মনে করিতে হইবে, সে সম্যক জ্ঞানবান্ হইয়াছে। যে এরূপে আমার ভজনা করে সে শীঘ্রই ধর্ম্মাত্মা হইয়া যায়, এবং নিত্য শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে কৌন্তেয়! তুমি ইহাই জানিও আমার ভক্ত কখনও নাশ পায় না। ভক্ত অবিনাশী; সে ভক্ত কিরূপ? ভগবান্ বলিয়াছেন;—

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মে ভক্ত স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্ম্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যে মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২।১৩-২০।

যে ভক্তিমান ব্যক্তি দ্বেষশূন্য, কৃপালু, মমতাবিহীন, নিরহঙ্কার, সুখ-দুঃখ সম জ্ঞান, ক্ষমাবান্, সতত প্রসন্নচিত্ত, অপ্রমত্ত, জিতেন্দ্রিয়, দৃঢ়নিশ্চয়, যিনি আমাতেই মন ও বুদ্ধি সমর্পণ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। লোকসকল যাহা হইতে উদ্বিগ্ন হয় না, লোকসকল কর্ত্তৃক যিনি উদ্বিগ্ন হয়েন না, এবং যিনি অনুচিত হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ শূন্য; তিনিই আমার প্রিয়। যিনি নিস্পৃহ, শুচি, দক্ষ, পক্ষপাতরহিত ও মনঃপীড়াশূন্য এবং সর্ব্ব উদ্যমপরিত্যাগী, যিনি

সকাম কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি শোক, হর্ষ, দ্বেষ, আকাঙ্ক্ষা ও পাপ-পুণ্য পরিত্যাগকরিয়া "ভক্তিমান" হন; তিনিই আমার প্রিয়। যিনি সর্ব্ব আসক্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক শত্রু ও মিত্র, মান ও অপমান, শীত ও উষ্ণ সুখও দুঃখ, নিন্দা ও প্রশংসা তুল্য রূপ বিবেচনা করিয়া থাকেন ও যিনি মৌনী, যিনি যৎকিঞ্চিৎ লাভে সন্তুষ্ট হন, কোন স্থলেই প্রতিনিয়ত বাস করেন না এবং স্থিরমতি ও স্থিরভক্তিসম্পন্ন হইয়াছেন, তিনিই আমার প্রিয়। যিনি মৎপরায়ণ হইয়া পরম শ্রদ্ধা সহকারে উক্তপ্রকার ধর্ম্মরূপ অমৃত পান করেন; তিনিই আমার অতীব প্রিয়। পাঠক! ভক্ত হইতে হইলে, কি কি গুণ থাকা চাই বুঝিয়াছ? কেবল চৈতন-চুট্‌কির বাহার, কণ্ঠীবন্ধন, বা গোপীমৃত্তিকা লেপন করিলে ভক্ত হওয়া যায় না। ভক্তের উপরোক্ত লক্ষণগুলি থাকা চাই। আর কেবল চক্ষু মুদিয়া ভেট কি মাছের মত মাঝে মাঝে 'হা' করতঃ "গোপীবল্লভ," "প্রাণবল্লভ" বলিয়া রব ছাড়িলে ভক্তির সাধনা হয় না। শ্রীমুখে ভগবান্ বলিয়াছেন;—

> যে তু সর্ব্বানি কর্ম্মানি ময়ি সংন্যস্ত মৎপরাঃ
> অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে।
> তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যু সংসার সাগরাৎ।
> ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১২।৬, ৭।

যাঁহারা আমাতে সমস্ত কর্ম্মসমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া অনন্যপরাভক্তি দ্বারা আমাকেই ধ্যান ও উপাসনা করেন, আমি সেই সকল ব্যক্তিকে অচিরকাল মধ্যেই মরণশীল সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি।

অতএব ভক্তিই ভগবদারাধনার প্রাণ। ভক্তিবিহীন ব্যক্তির তপ, জপ, উপাসনা বন্ধ্যানারীতে সন্তান উৎপাদনের চেষ্টার ন্যায় বিফল। প্রকৃত সাধক ভক্তি ব্যতীত কোন দ্রব্যই আকাঙ্ক্ষা করেন না। ভক্তি ও ভক্তের অবস্থা ভাষায় ব্যক্ত করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র।

ভক্তির সাধনায় ক্রমে প্রেমভক্তির উদয় হয়। তখন ভক্ত শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও কান্তা প্রভৃতি প্রেমের উচ্চস্তরের মাধুরী লীলায় বিভোর হইয়া যান। সাধক সর্ব্বত্রই ভগবানের অস্তিত্ব দর্শন করিয়া থাকেন। তখন তিনি জানিতে পারেন যে;—

> বিস্তার সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণুর্বিশ্বমিদং জগৎ।
> দ্রষ্টব্য মাত্মবৎ তস্মাদভেদেন বিচক্ষণৈঃ॥
>
> বিষ্ণুপুরাণ।

বিশ্ব, জগৎ, সর্ব্বভূত বিষ্ণুর বিস্তার মাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তি এইজন্য সকলকে আপনার সঙ্গে অভেদ দেখিবেন। কিন্তু ভেদজ্ঞান থাকিতে কখনই ভক্তির অধিকারী হইতে পারাযায় না। পুরাণের হর-গৌরীমূর্ত্তি—জ্ঞান ও ভক্তির জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। মহাদেব জ্ঞানমূর্ত্তি,—কিন্তু গৌরী প্রেমময়ী। তাই তাঁহার ত্যাগের কর্কশতা গৌরী প্রেমের মাধুর্য্যে উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছেন। আলোক যদি ফানুস (চিম্‌নি) দ্বারা আবরিত না হয় তবে কিঞ্চিৎ কর্কশ ও অনুজ্জ্বল বোধ হয়; কিন্তু ফানুস দিয়া আচ্ছাদিত করিয়া দিলে কেমন স্নিগ্ধ ও উজ্জ্বল আলো বাহির হয়। তদ্রূপ জ্ঞান, প্রেমের ফানুসে আবরিত হইলে, ঐ জ্ঞানালোক স্নিগ্ধ মধুরোজ্জ্বল জ্যোতিঃ বিকীর্ণ করিয়া সাধককে তৃপ্ত

করিবে।

ভক্তিযোগ সিদ্ধ হইলে ভক্ত তখন ভক্তির বলে—প্রেমের বলে জগদ্রূপী জগন্নাথকে আপনার সঙ্গে লয় করিয়া থাকেন

——:0:——

সাধক-সঙ্গীত।

[৫]

যে অঙ্গে সাধন কাল অঙ্গনা হ'লনা তেমন অঙ্গে কি ফল তা বলনা।
ধন জন সব বিড়ম্বনা,—এদেহ সন্দেহ গিরি বিদেহ ভানু নন্দিনী,
স্থান দেহ পদে এই বাসনা॥
কুপুত্র হইয়ে না হয় মা তোরে পিতা শঙ্করে,
না ভাবিলাম নাই আর অন্যের সাধনা,
সদা কু-প্রসঙ্গে মতি, কু-পথে কু-সঙ্গে গতি,
শেষের সঙ্গতি করা হ'লনা॥
ক্ষণে ভাবি সুবিমল সরযূ পুলিনে বসি,
সরোজ নয়ন রামের পদ ভাবি দিবা নিশি,
এড়াই ভব জায়া ভব যন্ত্রনা ;———
ক্ষণে সাধ গুরুতর মনে, ভক্তি অগুরু চন্দনে গুরুপদ করি উপাসনা ;
আবার আশা দিন রজনীতে, দ্বিজপদ রজঃ নিতে,
দুর্গে গো এই ভাগ্যে কিছুই হ'লনা॥
ক্ষণে ক্ষণে মনে ভাবি গিয়ে মধুর বৃন্দাবনে,
ভ্রমর পুঞ্জ গুঞ্জরব রসিক কুঞ্জবনে;
রাম কৃষ্ণে করি উপাসনা ;—
তাহে আবার গরজে মন, মহা অজগর যেমন, গোরজে
অঙ্কিত তনু ভাবেনা ;
গোবিন্দের দুর্ভাগ্য জন্য বিষয় হলাহল জন্য কৃষ্ণ-
হলধরে মতি হ'লনা॥

——:0:——

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)।

৪৮। জ্ঞানের প্রয়োজন ততক্ষণ, যতক্ষণ না ভক্তির প্রতিষ্ঠা হয়; যেমন — পুস্তক মুদ্রিত হইয়া গেলে পাণ্ডুলিপির আর দরকার হয় না।

৪৯। প্রস্তর ক্ষয় হইয়া যায়, কিন্তু প্রস্তরে অঙ্কিত গভীর দাগ সহজে মুছিতে পারা যায় না; সেইরূপ মৃত্যু হইবে তবু সংস্কার দূর হইবে না।

৫০। জীবনের অধিকাংশ সময় যে ভাবে কাটাইবে, মৃত্যুকালে তাহাই স্মরণ হইবে; যেমন — গরু দিবসে যেরূপ ঘাস খায়, রাত্রে তাহারই জাবর কাটে। তাই সাধন, ভজন, তপস্যা ইত্যাদি।

৫১। পশুবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য বিবাহের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয় নাই, অসংযমীকে সংযমের পথে টানিয়া আনিবার জন্যই বিবাহের প্রয়োজন। তাই পূর্ব্বে বাল্যকালেই সকলকে ব্রহ্মচর্য্য রক্ষা করিতে শিক্ষা দেওয়া হইত। যাহার বিন্দু স্থির হইয়া যাইত, তাহাকে আর বিবাহ করিতে হইত না, কিম্বা তাহার আদৌ বিবাহে প্রবৃত্তি হইত না।

৫২। কলির জীব ভোগলোলুপ, তাই তান্ত্রিক সাধনার সৃষ্টি, কেন না, যাহা স্বভাবের অনুকূল তাহাই সহজ; এবং তাহাতেই স্বল্পায়াসে কৃতকার্য্য হওয়া যায়। সমাজে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত করার জন্য তন্ত্রের সৃষ্টি হয় নাই।

৫৩। শক্তির বিকাশ দেখিতে চাও ত শব হও; তাই শিবের বুকে নয় — শবের বুকে শক্তি।

৫৪। কামিনী পরিত্যাগ করা সকলের পক্ষেই বিধেয়, কিন্তু তাই বলিয়া কি জননী-কেও পরিত্যাগ করিতে হইবে? রমণীকে কামিনী ভাবিও না — জননী রূপে দেখিও — জোঁকের মুখে নুন পড়িবে।

৫৫। যাহার কাছে যাহা আছে লোকে তাহাই চায়, ইহাই স্বাভাবিক; তাই কামুক কি কামুকী দেখিলে কামোদ্রেক হয়।

৫৬। যে যাহা চায় না, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাহাই তাহার কাছে যায়, ইহাই "অস্তেয়" সাধনার ফল, তাই সাধু মহাপুরুষের ধন জনের অভাব নাই; আবার ভিক্ষুক দিনান্তে একমুষ্টি অন্নও ভিক্ষা পায় না।

৫৭। অগ্নির সংস্পর্শে ভিজা কাঠ রাখিলে রস মরিয়া তাহাও এক সময়ে জ্বলিয়া উঠে; সাধু মহাপুরুষদিগের সংসর্গে পাষণ্ডদেরও এই অবস্থা ঘটে — তাই জীবনে সাধুসঙ্গ প্রয়োজন।

৫৮। দোষাংশ পরিত্যাগ করিয়া গুণাংশ গ্রহন করাই সাধুর লক্ষণ, যেমন — দুধ ও জল মিশাইয়া দিলে হাঁস দুধ টুকুই গ্রহন করে

৫৯। গুণাংশ পরিত্যাগ করিয়া দোষাংশ গ্রহন করা অসাধুর লক্ষণ, যেমন — বিষ্ঠা ও মধু একস্থানে রাখিলে, মাছি মধু পরিত্যাগ করিয়া বিষ্ঠাতেই বসিবে।

৬০। এ সংসারে নিষ্প্রয়োজনীয় কিছুই নাই, সুতরাং তুচ্ছ করিবারও কিছুই নাই; প্রয়োজনানুসারে বস্তুর গুরুত্ব উপলব্ধি হয়; যেমন বাতাসা দ্বারা টিকে'র অভাব পূরণ হয় না, যদি বাতাসা সস্তা হয় আর টিকে মহার্ঘ হয়, তবুও আবশ্যক হইলে অধিক মূল্য দিয়া টিকে'ই কিনিতে হইবে।

৬১। অধিক কিম্বা নিষ্প্রয়োজনীয় বাক্য ব্যয়ে শক্তির নাশ হয়,—তাই বাক্‌সংযম করা শাস্ত্রের আদেশ।

৬২। লোকে বলে অন্ধ বিশ্বাস; বিশ্বাস কি কখনও অন্ধ হইতে পারে? বিশ্বাস সর্ব্বদা চক্ষুষ্মান।

৬৩। যে গুরুবাক্য বেদবাক্য বলিয়া অভ্রান্ত মনে না করে, তার গুরুর প্রতি বিশ্বাস কি ভক্তি কিছুই হয় নাই, গুরু বাক্যে বিশ্বাস জন্মিলে গুরুতে বিশ্বাস হইবে এবং তখনই গুরুকৃপা লাভ হইবে।

৬৪। যাহা করিবে একাগ্রচিত্তে কায়-মনোবাক্যে করিও।

৬৫। যে যাহাই কর না কেন—"সত্য-লাভ করিব" এই সঙ্কল্প রাখিয়া কাজ করিয়া যাও, শত বাধা বিঘ্নে পশ্চাৎপদ হইও না; সত্যলাভ হইবেই হইবে, কেন না এ জগৎ সত্যে প্রতিষ্ঠিত।

৬৬। সত্য লাভ করিতে হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের উপাধির দরকার হয় না—তাহার প্রমাণ;—পরমহংস শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব।

৬৭। একটী সদ্বৃত্তির বিকাশ করিতে পারিলে অন্যগুলি আপনা আপনিই হইবে, যেমন সাবধানে কলমীর একটী ডগা ধরিয়া টানিলে অন্যগুলি আপনা আপনিই হাতের কাছে আসে, কেন না একে অন্যের সঙ্গে অচ্ছেদ্য বন্ধনে বদ্ধ।

৬৮। কর্ম্মই বন্ধন বা মুক্তির কারণ, অনাসক্তচিত্তে ফলকামনাশূন্য হইয়া ভগ-বদুদ্দেশে যাহা করা যায়, তাহাই মুক্তির কারণ; আর আসক্তির সহিত যাহা করা যায় তাহাই বন্ধনের কারণ। ভোগলালসা চরিতার্থের জন্য কৃত পাপকর্ম্ম লোহার বাঁধন। আর ফলাকাঙ্ক্ষায় কৃত সৎকাজ সোণার বাঁধন। উন্মুক্ত অবস্থায় রাখিয়া দিলে সময়ে লোহার শিকলও ক্ষয় হয়, কিন্তু সোণার শিকল শতবর্ষ ভূ-গর্ভে প্রোথিত করিয়া রাখিলে কিছুই হয় না; আবার সোণা সোহাগা সংযোগে অগ্নির অতি সামান্য উত্তাপেই গলিয়া যায়।

৬৯। আগে লক্ষ্য স্থির কর, পরে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও; নতুবা জীবন বিফলে যাইবে।

৭০। নিয়ম সংযম ততদিন, যতদিন না মন স্থির হয়, মনস্থির হইলে নিয়ম সংযমের দরকার নাই। পাখী পোষ মানিলে আর পিঞ্জরে আটকাইয়া রাখিতে হয় না।

৭১। গুরুসেবা দ্বারাই সর্ব্বার্থসিদ্ধ হইতে পারে, যোগ, যাগ, তপস্যার আর প্রয়োজন হয় না। কেননা গুরুসেবাই যে যোগ, যাগ, তপস্যা।

৭২। বাহিরে যত বড় হইবে, ভিতরে তত ছোট হইবে, আবার ভিতরে যত বড় হইবে, বাহিরে তত ছোট হইবে।

৭৩। স্থূল জগতে দেখাযায়, যতই উচ্চে

উঠিবে ততই বায়ুর চাপ কম; অন্তর্জগতেও তাই, যতই উচ্চে উঠিবে ততইবায়ুর প্রয়োজন কমিয়া আসিবে।

৭৪। উপর হইতে নীচে নামিয়া আসা সহজ, কিন্তু নীচ হইতে উপরে উঠা বড় কঠিন, উভয় দিকেই মধ্যাকর্ষণের টান, তবে একদিকে অনুকূল আর অন্যদিকে প্রতিকূল।

৭৫। অহং-জ্ঞানে কাজ করিলেই অবসাদ আসে, কিন্তু অহং-জ্ঞান-রাহিত্যে অবসাদের পরিবর্ত্তে স্ফূর্ত্তি হয়।

৭৬। কেহ আঘাত করিলে কি কোনরূপে চোট পাইলে ব্যথা পাই কেন?——আমি "আমাকে" দেহ হইতে অভিন্ন মনে করি অর্থাৎ আমার 'আমিত্ব'কে দেহের প্রতি অণু পরমাণুতে জড়িত মনে করি।

৭৭। দেহ বৃদ্ধ হয় কিন্তু বৃত্তিগুলি কখন বৃদ্ধ হয় না, তাই বৃদ্ধকেও কাম, ক্রোধ, প্রভৃতি রিপুর বশীভূত হইতে দেখা যায়।

৭৮। সাংসারিক ভাবে দেখিতে গেলে ধার্ম্মিক কখনই সুখী নন; তাহার প্রমাণ—যুধিষ্ঠির, নল, শ্রীবৎস, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি; তাঁহারা সত্য লাভ করিয়া ছিলেন, — সত্যে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন।

৭৯। কর্ম্মে দোষ নাই, উদ্দেশ্য বা ভাবেই দোষ।

৮০। ভগবান কর্ম্ম দেখেন না—তিনি ভাব গ্রহন করেন, তাই ভাবগ্রাহী জনার্দ্দন।

৮১। স্থূলদেহ রক্ষার জন্যই আহারের প্রয়োজন, স্থূলদেহ অতিক্রম করিতে পারিলে আর আহারের প্রয়োজন নাই।

৮২। ত্যাগই সন্ন্যাসের মূল মন্ত্র।

৮৩। ভগবানের কাছে শত্রু মিত্র নাই। তিনি শুধু ভাবগ্রাহী; যে ভাবেই হউক না কেন, তাঁহাকে স্মরণ রাখিতে পারিলেই সকলের আগে বুকে তুলিয়া লন। তাই হিরণ্যকশিপু শত্রু ভাবে ভাবিয়াও তিনি জন্মে উদ্ধার হইয়াছিল। (ক্রমশঃ।)

——:0:——

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

প্রথম—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। হালিসহরের অন্তঃপাতী কুমারহট্ট, বা কুমার হাটী নামক গ্রামে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেনের জন্ম হয়; ইনি সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ সম্ভূত। রামপ্রসাদ বাল্যকালে সংস্কৃত ও পারসীক ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন; তিনি জাতীয় চিকিৎসা বিদ্যা অবলম্বন করেন নাই; যৌবনের প্রারম্ভেই তাঁহার পিতৃবিয়োগ হয়, সুতরাং তিনি সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ জন্য কর্ম্মের-অনুসন্ধানে কলিকাতা আগমন করেন এবং তথাকার কোন ঐশ্বর্য্যশালীর ভবনে মুহুরি-গিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হন। কিন্তু মন সর্ব্বদা পরমার্থ চিন্তায় রত থাকিত বলিয়া, তিনি বিষয় কর্ম্মে বড় একটা মনসংযোগ করিতে

পারিতেন না; তিনি অবকাশ মত শক্তি বিষয়ক বিবিধ সঙ্গীত রচনা করিয়া হিসাবের খাতার প্রান্তভাগেই সে সমুদয় লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন; হিসাবের খাতার চারিদিকে কালী নাম লেখা ও ঐ সকল গীতের সন্নিবেশ রহিয়াছে দেখিয়া রামপ্রসাদের উৰ্দ্ধতন কর্ম্মচারীরা তাঁহার উপর বড়ই বিরক্ত হইলেন, এবং একদিন প্রভুকে সেই সমস্ত দেখাইলেন। প্রভু একজন গুণগ্রাহী ও ভক্তপুরুষ ছিলেন; তিনি রামপ্রসাদের গীত কয়েকটী পাঠ করিয়া তাঁহার অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় পাইলেন। "আমায় দেও মা তবিলদারী" এই গানটী পাঠ করিয়া একেবারে বিমোহিত হইয়া গেলেন। তখন রামপ্রসাদকে নিকটে আহ্বান পূর্ব্বক তাঁহাকে অনর্থ সংসারচিন্তা পরিহার করিতে ও শক্তি সাধনায় নিযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। প্রভুর অনুগ্রহে রামপ্রসাদের যাবজ্জীবন ৩০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইয়া গেল। রামপ্রসাদ সেই অবধি কুমারহট্ট ফিরিয়া আসিয়া শক্তি-সাধনায় ও সঙ্গীতরচনায় মনোনিবেশ করিলেন। সেইসময় বিদ্যানুরাগী নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র বিদ্বজ্জনের সমাদর করিতেন। রাজা তাঁহার ধর্ম্মানুরাগে ও কবিত্বে বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে "কবিরঞ্জন" উপাধি ও একশত বিঘা নিষ্করভূমি দান করিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ।)

———:0:———

সংবাদ ও মন্তব্য।

প্রেমিকার মৃত্যু।

বোম্বায়ের এলফিন ষ্টোন কলেজের ভূতপূর্ব্ব সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক পণ্ডিত নানুরাম চণ্ডভানু মহাশয়ের ১৩শ বৎসর বয়স্কা একটী কন্যার সহিত চারি বৎসর পূর্ব্বে, রাজপুতনার অন্তর্গত জয়পুরে মলসিসার সম্প্রদায়ভুক্ত অষ্টাদশ বর্ষীয় একটী যুবকের বিবাহ হইয়াছিল। প্রায় একবৎসর পূর্ব্বে, সেই যুবার একটী পুত্রসন্তান ভূমিষ্ঠ হয়। ঐ শিশুর জন্ম গ্রহনের কয়েক মাস পরে যুবা কোন এক সাংঘাতিক রোগে শয্যাগত হইয়া পড়ে। বিগত ৫ই জুলাই তারিখে ঐ যুবা আত্মীয় স্বজনকে শোক-সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া লোকান্তরে গমন করে। স্বামীর প্রাণপাখী দেহপিঞ্জর পরিত্যাগ করিবামাত্র প্রেমিকাপত্নী মৃতদেহের চতুর্দ্দিক একবার পরিক্রমণ করিয়া স্বামীর চরণ তলে উপবেশন করিলেন। তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে অলঙ্কার উন্মোচন করিবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিল, কিন্তু তিনি স্বামীর চরণ দু'খানি বুকে করিয়া বসিয়া থাকিলেন, কাহারও কথায় কর্ণপাত করিলেন না। স্বামীর শব শ্মশানে লইয়া যাইবার সময়ে সেই প্রেমময়ী পতিগতপ্রাণা যুবতীও সহমৃতা হইবার জন্য শ্মশানে গমন করিতে উদ্যতা হইলেন। কিন্তু তাঁহার আত্মীয়গণ তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিল,

বাটীর বাহির হইতে দিল না। তখন যুবতী ধীর ভাবে বলিলেন, "অনর্থক আমাকে ধরিয়া রাখিতেছ; শ্রীরামচন্দ্র আমাকে "সতী" হইতে আদেশ করিয়াছেন।" অনন্তর "রাম-রাম" বলিয়াই সাধ্বী অজ্ঞান হইয়া ঢলিয়া পড়িলেন। আর তাঁহার জ্ঞান হইল না, সতীর প্রেম-পূত প্রাণ শূন্যদেহ ছাড়িয়া পতির অনুসরণ করিল। তখন একই চিতায় সেই দেবদম্পতীর পবিত্র দেহের সৎকার করা হয়।

প্রেমের পবিত্র বন্ধন—আধ্যাত্মিক বিকাশ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া যাহারা হিন্দু-রমণীর সহমরণ প্রথাকে "কুসংস্কার" কিম্বা "পতি-বিরহ-জনিত আত্মহত্যা" মনে করে; তাহারা এ ক্ষেত্রে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইবেন, আর "মহিলাবান্ধব" পত্রিকার মহামান্যা সম্পাদিকা মহোদয়াই বা কিরূপ সম্পাদকীয় টিপ্পনী কাটিবেন? হিন্দু জানে প্রেমে এরূপ হয়,—দুই প্রাণে এক হইয়া যায়, এ তত্ত্ব বিজ্ঞান যুক্তিতে বুঝিতে হয় না এ প্রাণের খেলা, প্রাণ দিয়া বুঝিতে হয় বলিয়া আমরা এ তত্ত্ব বুঝাইতে অগ্রসর হইলাম না। আমাদিগের বিশ্বাস, এই সকল পূত-প্রাণা প্রেমময়ী রমণীর চরণরেণু বক্ষে ধারণ করিতেছে বলিয়াই বুঝি আজিও ভারত মরু-ভূমিতে পরিণত হয় নাই;—শ্মশান হইয়া যায় নাই। শিক্ষা দোষে——সংসর্গ গুণে হিন্দু সমাজে এবম্বিধা দেবীর পরিবর্ত্তে ক্রমশ আত্ম-সুখরতা মদগর্ব্বিতা দানবীর আবির্ভাব হইতেছে ভারতের এই দাম্পত্য-বন্ধন-বিভ্রাটদিনে আজি একটী সংবাদ প্রচার করিয়া আনন্দে একবার গাহিয়া লই—

"এক মরণে দুজন মরে এমন মরণ কৈ শুনি।
জয়দেব পদ্মাবতী, লক্ষ্মীরাণী বিদ্যাপতি,
ম'রেছিল শুন্তে পাই চণ্ডীদাস আর রজকিনী"।

———0———

প্রকৃত স্বদেশী।

বাংলার প্রবীন ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র পালিত (মিঃ টি, পালিত) মহাশয় বঙ্গদেশে বিজ্ঞান শিক্ষার উৎকর্ষ উদ্দেশ্যে নগদ ও ভূসম্পত্তিতে প্রায় চারিলক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। সেদিন কলিকাতা — টাউন হলে প্রকাশ্য সভায় দানপত্র গভর্ণমেণ্টের হস্তে প্রদত্ত হইয়াছে। বিজ্ঞানকলেজ স্থাপনের সর্ত্ত গুলি সকলেরই মনোমত হইয়াছে। শুনিতেছি কলিকাতা হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত বাবু রাসবিহারী ঘোষ মহাশয়ও ঐ উদ্দেশ্যে চারিলক্ষ টাকা দিতে মনস্থ করিয়াছেন। বোম্বাই প্রদেশের তিনজন ধনকুবের পার্শী বোম্বাই সহরে আদর্শ বিজ্ঞান কলেজ স্থাপনের জন্য সতের লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন। আমরা ইহাঁদিগকে প্রকৃত "স্বদেশ হিতৈষী" বলিয়া মনে করি। দেশের লোক যদি দেশের অভাব মোচন করিতে অগ্রসর না হয়, তবে পরের নিকট "ঝুলী" ঘাড়ে করিয়া হৈ-চৈ করিলে, শুনিবে কেন? আশা করি, দেশের লোক এই সকল মহাত্মাদিগের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন।

———0———

ভারতের দান।

হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ম্মকর্ত্তাগণ দল বাঁধিয়া ভারতের নানা স্থানে অর্থ সংগ্রহ করিয়া বেড়াইতেছেন। হিন্দুগণও মুক্তহস্তে অর্থদান

করিতেছেন। শীঘ্রই প্রস্তাবিত এক কোটি টাকা সংগৃহীত হইবে। এখন কার্য্যকালে শিক্ষা ও তদুদ্দেশ্য সাধিত হইলেই মঙ্গল। ভারতের এই দারুণ দুর্দ্দিনেও ভারতবাসী হিন্দুগণ দান ধর্ম্ম ভুলিয়া যান নাই। চেষ্টা করিলে ভারতবাসীর অর্থেই এখনও বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপারও অনুষ্ঠিত হইতে পারে। দেশের লোকের একপ্রাণতা নাই, পরস্পর বিশ্বাসের অভাব, ক্ষুদ্রপ্রাণে স্বার্থপরতার আধিক্য ও প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের অভাব; এই সকল কারণে কোন দেশহিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় না। নতুবা ভারতবাসী হিন্দু যতই দুরবস্থায় পতিত হউক না কেন, তাঁহারা দান ধর্ম্মের গৌরব এখনও বিস্মৃত হয় নাই।

—0—

আশ্রম সমাচার।

অত্র আশ্রম অধিষ্ঠাতা পরমারাধ্য পরমহংসদেব ৺শারদীয়া পূজার পূর্ব্বে আর আশ্রম ত্যাগ করিবেন না, এজন্য আমরা পূর্ব্ব সংবাদ প্রত্যাহার করিলাম। আশ্রমের কার্য্যাধ্যক্ষ ও শিক্ষক ব্যতীত আর কোন কর্ত্তৃপক্ষ এক্ষণে আশ্রমে উপস্থিত নাই। সম্পাদক মহারাজ উজ্জয়িনী অবস্থিতি করিতেছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতনের সুপারেণ্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমৎ স্বামী বোধানন্দ সরস্বতী মহারাজ ও আর্য্য-দর্পণের ম্যানেজার কুমার শ্রীমৎ চিদানন্দ মহাশয় জন্মাষ্টমী উপলক্ষে বগুড়ার উৎসবে যোগ দান করিতে গিয়াছেন। তাঁহারা নিম্ন আসাম, উত্তর বঙ্গ ও কুচবিহার ভ্রমণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইবেন। এই সকল কারণে পূজ্যপাদ পরমহংসদেব আশ্রমের আসন ত্যাগ করিলেন না। আমাদের ব্রহ্মচারী নরেন্দ্রচন্দ্র পূর্ব্ববঙ্গের উত্তীর্ণ ছাত্রদিগের মধ্যে তৃতীয় হওয়ায় ২০৲ টাকা বৃত্তি লইয়া ঢাকা কলেজের ১ম বার্ষিক শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইয়াছে। বিগত ১১ই ভাদ্র ঝুলন পূর্ণিমার দিন শ্রীমদাচার্য্য পরমহংসদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে যথারীতি মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে।

—0—

সংস্কৃত পণ্ডিত।

ব্যাকরণ, দর্শন ও কাব্য পড়াইতে পারেন, এমন একজন সংস্কৃত শিক্ষকের প্রয়োজন। প্রবীন, অথচ কার্য্যদক্ষ লোক প্রার্থনীয়। যিনি যত অল্প বেতন লইবেন, তাঁহারই আবেদন আদরণীয়। আশ্রমে আহার ও বাসস্থান পাইবেন। কোন পণ্ডিত যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক কিছু দিন বিনাবেতনে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, জানাইবেন। বাংলা দেশে কি সেরূপ পণ্ডিত নাই? ৺পূজার পূর্ব্বেই আশ্রমের কর্ম্মকর্ত্তার সহিত পত্র ব্যবহার করিবেন॥

—0—

পত্রিকার অক্ষর।

আসামী ভাষায় "র" এর পরিবর্ত্তে "ৰ" ব্যবহৃত হয়, তাই "আর্য্য-দর্পণেও" "ৰ" রই ব্যবহার বেশী, কেননা বর্ত্তমান সময়ে উক্ত পত্রিকা আসাম হইতে প্রকাশিত হইতেছে। ইহাতে বোধ হয় বঙ্গদেশীয় পাঠকগণের কিছু অসুবিধা হইতেছে, পূজার পর হইতে এ অসুবিধা দূর হইবে বলিয়া আমরা আশা করি, পাঠকগণ ক্রটী মার্জ্জনা করিবেন।

—0—

ওঁ তৎসৎ।

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ,	কার্ত্তিক।	বঙ্গাব্দ ১৩১৯।
৭ম সংখ্যা।		শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(৬ষ্ঠ সংখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

দ্বিতীয়—দ্বিজ রামপ্রসাদ। কবিরঞ্জন সেন রামপ্রসাদ যে দ্বিজ ভণিতা দিয়া সঙ্গীত রচনা করেন নাই, এ বিশ্বাস অনেকেরই ছিল; কিন্তু দ্বিজ রামপ্রসাদ কে, তাহা জানিবার জন্য কেহ বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন কৃত "সাহিত্য-বিষয়ক-প্রস্তাব" পাঠে প্রথম এ বিষয়ের আভাস পাই, পরে একটু অনুসন্ধান করিয়া দ্বিজ রামপ্রসাদের সন্ধান পাইয়াছি; তিনি পূর্ব্ববাঙ্গালার লোক নহেন, কলিকাতারই অধিবাসী।

তৃতীয়—কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী নামে আর একজন কবি কয়েকটী প্রসাদী সঙ্গীত ও সামান্য কবিগান রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কনিষ্ঠ সহোদর নীলমাধব চক্রবর্ত্তীর একটি কবিরদল ছিল। নীলমাধব কবিওয়ালা "নীলু ঠাকুর" নামে খ্যাত। এই নীলু ঠাকুরের দলেই তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী বাঁধনদার বা সঙ্গীত-প্রণেতা ছিলেন। ইনি সঙ্গীত রচনা করিতেন বটে—কিন্তু ভাল গাইতে পারিতেন না। কলিকাতা নগরেই হেদুয়া পুষ্করিণীর নিকট নীলু রামপ্রসাদের বাটী ছিল। কতকগুলি প্রসাদী গানে ডিক্রী, ডিস্‌মিস্, আপীল্ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্ট হয়; ঐ সমস্ত ইংরেজী কথা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সময় বাঙ্গলা ভাষার অন্তর্নিবিষ্ট হওয়া সম্ভবপর নহে; সেইজন্য বোধ হয় উক্ত শব্দাবলীযুক্ত গানগুলি কবিরঞ্জনের নহে; চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদের রচিত। চক্রবর্ত্তী রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুর পরে জন্ম গ্রহন

করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রদর্শিত পদানুসরন করিয়া সঙ্গীত রচনা করিতেন, সুতরাং উভয়েরই সঙ্গীত যে মিশ্রিত হইয়াছে ইহা কোন ক্রমেই বিচিত্র নহে। অনেক ক্ষুদ্রপ্রাণ রামপ্রসাদ যে মহাপ্রাণ রামপ্রসাদে বিলীন হইয়াছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। এইতো গেল ব্যক্তিগত মন্তব্য। এখন

আমার কথা।

আমি অনেক কাল যাবত দ্বিজ রামপ্রসাদের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সমসাময়িক সঙ্গীত রচয়িতা দ্বিজ কুলোদ্ভব অপরাপর রামপ্রসাদেরও সন্ধান পাওয়া যায়। সে সকল রামপ্রসাদ আমার মনোমত হইতেছে না—অন্ধের লালসা সন্তৃপ্ত হইবে কিরূপে? সুতরাং এখানে তাঁহাদের উল্লেখ অনাবশ্যক।

প্রসাদপদাবলী-প্রকাশক একটু অনুসন্ধান করিয়া যে প্রণালীতে দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয় পাঠকগণকে উপহার দিয়া পরিতৃপ্ত হইতে পারিয়াছেন, এরূপ পরিচয় প্রদান সমীচীন নহে। মোটের উপর গ্রন্থকার দ্বিজ রামপ্রসাদের বিষয়ে কিছুই অনুসন্ধান করেন নাই, পক্ষান্তরে ইহাই প্রতীতি হয় যে, তিনি নানা পুস্তকাবলম্বনে পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার পরিচয় দিতে সচেষ্ট হইয়া, কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের সহিত অন্যান্য সঙ্গীত-রচয়িতা রামপ্রসাদ এবং তদানীন্তন সঙ্গীত-রচয়িতা আজু গোঁসাই ও ইদানীন্তন সংগ্রহকারগণের তীব্র সমালোচনা করিয়া অকুণ্ঠিতচিত্তে আত্মপ্রসাদ ভোগ করিয়াছেন।

দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যিনি যত সমালোচনা বা মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ৺দয়ালচন্দ্র ঘোষ বিজ্ঞতা ও দূরদর্শীতার এবং সাধক-সঙ্গীত প্রকাশক শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ, তাঁহার অধ্যবসায় এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

আমার শিশুকালে—সে অনেক দিনের কথা,—আমাদের ভদ্রাসন বাটীর বহির্ভাগে প্রাচীর সংলগ্ন কুটীরে এক 'নান্‌কার' প্রজার বসতি ছিল। বাড়ীতে দুইটী স্ত্রীলোক, একজন শ্বাশুড়ী অপরটী পুত্রবধূ; প্রাচীনার পুত্র কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। নিঃসহায় অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুটী পৌত্র বর্ত্তমান। বড়টীর নাম "কার্ত্তিক", প্রতিবেশীরা ইহাকে "ফেরা" বলিয়া ডাকিত। পুত্র বর্ত্তমানেই পুত্রবধূর সহিত বনিবনাও না হওয়ায় প্রাচীনা পৃথকান্ন, "অন্ন-চিন্তা চমৎকার—" পেটের দায়ে পর-প্রত্যাশী, কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিত; নাম "ভবানী দাস্তা"। বয়স সত্তর উত্তীর্ণ, তথাপি সুস্থকায়া—মোটা সোটা। পাড়ার মেয়ে পুরুষ তাহার স্বভাব-চরিত্র, সরলতা এবং অমায়িকতায় ইহাকে অতি আদর করিত ও ভালবাসিত। চরিত্রবতী বলিয়া বধূমহলে বৃদ্ধা সবিশেষ আদৃতা ছিল। বধূরা কখনও বৃদ্ধার নাম ধরিয়া ডাকিত না; সম্পর্ক পাতিয়া ডাকিত—কোন কোন অভিমানিনী কুলবধূকে "ফেরার দিদি" বলিয়া ডাকিতে শুনিয়াছি, আমি ডাকিতাম "বুড়ী দিদি"। এই বুড়ী দিদিই আমার শৈশবের অবলম্বন। শুনিয়াছি এই বৃদ্ধা শৈশবাবস্থায় আমার কটিদেশে একগাছা দড়ি বাঁধিয়া খেলা করিতে ছাড়িয়া দিয়া নিজে চর্‌কায় সূতা কাটিত।

(ক্রমশঃ।)

বুদ্ধদেবের গৃহত্যাগ।

আর কেন দেখাশোনা, আর কেন আনাগোনা, কেন ভালবাসা,
কেন মিছে জীবনের, ফলহীন মরণের, এতই প্রত্যাশা;
কেন মিছে তুমি আর, করিতেছ সংসার, আপনার অতি,
আজ বাদে কাল যারে, ফেলে যাবে একেবারে, অতি দ্রুতগতি।
তাই বলি আজ তারে, করুণ নয়ন ধারে, কর বরজন।
ওগো প্রভু ছিঁড়ে দেও সকল বন্ধন।

আমার সমগ্র আশা, বিক্ষিপ্ত ভালবাসা, এককরি লয়ে,
দিও পূত পাদবারি, শান্তি-সুখময় করি, নিও হে হৃদয়ে;
জীবনের প্রতি ছন্দে, প্রতি চিত্রে শব্দে গন্ধে, যেন হে তোমায়,
দেখি গো বৃহৎ করি, প্রেমের মূরতি গড়ি' জ্যোতির আভায়।
বাসনা কামনা সব যশমান সুগৌরব করিহে অর্পণ।
ওগো প্রভু, ছিঁড়ে দেও সকল বন্ধন।

ঐ হের ধীরে ধীরে, আমায় ফেলিছে ঘিরে, নিশার আঁধার,
আলোক না পেলে পরে, যাইব কি দূরে সরে, আসি বারে বার;
হবে না হবে না তাহা, সর্ব্ব জগতের যাহা, ভূমান্ পুমান্,
আমি কি পাব না তাঁরে, জীবনের অন্ধকারে, মহা জ্যোতিষ্মান্।
আর কেন বসে রলে, জ্ঞানাঞ্জনে ফেল খুলে, মোহিত নয়ন।
ওগো প্রভু, ছিঁড়ে দেও সকল বন্ধন।

জরা মৃত্যু দুঃখ শোক, জীবনের শত ভোগ, লভি বারে বার,
সময়ের চক্রতলে, বাঁধা পড়িয়াছি বলে, নাহি কি নিস্তার?
ঐ হের উর্দ্ধে অতি, মহাকাশে বিশ্বপতি, শব্দের কম্পনে,
অস্ফুট অধর কোণে, ধরি' কথা সযতনে, ডাকিছে গোপনে;
আমার বিধাতা যদি, মোরে ডাকে নিরবধি, কার রাজ্য ধন?
ওগো প্রভু ছিঁড়ে দেও সকল বন্ধন।

এই রাজ্য এই প্রজা, মোর পূর্ব্বে কত রাজা, করেছে পালন
তারা কি পায়নি দুখ, তারা কি পেয়েছে সুখ, অনন্ত জীবন;
তবে কি রমণী সুখে, অতৃপ্ত কামনা বুকে, যাপিল জনম;
তাহাদের চাঁদ মুখ, দেয় কি স্বর্গীয় সুখ, শান্তির চরম?
অসম্ভব; পচে দেহ, ছোয় না দুর্গন্ধে কেহ, হইলে মরণ।
(তবে আর কেন) প্রভু ছিঁড়ে দেও সকল বন্ধন।

আকাশের পর পারে, কে যেন মেঘের পরে, বাজাইছে ভেরী,
চল মন চল ত্বরা, সর্ব্ব আবরণ হারা,—আর নাই দেরী;
ছাড় রত্ন আভরণ, বিনশ্বর ধন জন, নগ্ন শিশু সাজ,
হৃদয় পরাণ মোর, বিরাগ সঙ্গীতে তোর, আর বার বাজ;
গাও হে প্রভাতী রাগে, বিহগ ঘুমিয়ে জেগে, মধুর ভজন।
আমি আজ ছিঁড়িনু বন্ধন।

ঘুমাও ঘুমাও প্রিয়ে, স্নেহেতে বাঁধিয়ে হিয়ে, আমি আজ যাই,
স্বপনে যাতনা পেয়ে, কাঁদিয়ে দেখিবে চেয়ে, আমি আর নাই;
প্রভাতী আলোক নিয়ে, ঘুমন্ত জগতে গিয়ে, জাগাইব সবে,
সমস্ত জগত ব্যাপে, নির্ব্বাণের চিত্র এঁকে, সত্যের আরবে;
কর্ম্মের সোপানে আজ, দিব নিত্য লীলা সাজ, দিব জাগরণ;
তাই আজ ছিঁড়িনু বন্ধন।

শ্রীপীযূষ কিরণ চক্রবর্ত্তী।

———:0:———

ভক্তির অধিকারী।

মহৎ সঙ্গাদি-জনিত-সংস্কার বিশেষ দ্বারা যাঁহার ভগবদারাধনায় শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, এবং যিনি কর্ম্মে অতিশয় আসক্ত বা বিরক্ত হন নাই, তিনিই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। যথা:—

যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাত শ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তি যোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ।

শ্রীমদ্ভাগবত, ১১স্কঃ, ২০অঃ

সৌভাগ্যবশতঃ ঈশ্বরীয় কথায় যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্ হইয়াছে ও কর্ম্মমাত্রে বৈরাগ্যযুক্ত বা কর্ম্মে আসক্ত হয় নাই, তাহার সম্বন্ধেই ভক্তিযোগ সিদ্ধি প্রদান করেন। যে ব্যক্তির প্রকৃত বৈরাগ্য বা জ্ঞান হয় নাই, অথচ সংসারেও নিতান্ত আসক্তি নাই; কিন্তু ভগবৎ প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগের অধিকারী। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্রে আর্ত্ত, তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অর্থকামী ও জ্ঞানী এই চারি প্রকার ব্যক্তিই ভক্তির অধিকারী বলিয়া নিরূপিত হইয়াছে। যথা:—

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৭।১৬, ১৭।

সুকৃতিশালী পুরুষেরাই ভগবান্‌কে ভজিয়া থাকেন, কিন্তু পূর্ব্বকৃত পুণ্যের তারতম্য হেতু তাঁহারা চারি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়েন। যথা—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। এই চতুর্ব্বিধ ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান, যেহেতু তিনি সর্ব্বদা ভগবানে আসক্ত এবং অসার সংসার মধ্যে ভগবানকেই সার

জানিয়া কেবল তাঁহাকেই অচলা ভক্তি করিয়া থাকেন। এই কারণে জ্ঞানীর ভগবান্ অতি প্রিয় এবং তিনিও ভগবানের প্রিয়তর। পরন্তু ইহাঁরা সকলেই উদার স্বভাব, বিশেষতঃ ভগবান্ জ্ঞানীকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া থাকেন, যেহেতু তিনি সকল হইতে উত্তম-গতিস্বরূপ ভগবান্‌কে আশ্রয় করিয়া ভগবান্ ভিন্ন অন্য ফলের আশা করেন না। বহুজন্মের পর জ্ঞানবান্ ব্যক্তি স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমুদায় জগৎকে আত্মময় দেখিয়া থাকেন, এবং এই প্রকার সর্ব্বত্র আত্মদৃষ্টি নিবন্ধন কেবল ভগবান্‌কেই ভজনা করেন, অতএব এতাদৃশ ভক্ত অতিশয় দুর্লভ। কিন্তু বিবিধ বাসনাতে যাহাদের জ্ঞান আহৃত হইয়াছে; তাহারাই কামনা পূরণার্থ ভগবানের অথবা তাঁহার দৈবশক্তির উপাসনা করে। তথাপি ইহা-দিগের মধ্যে যাহার প্রতি ভগবানের অথবা ভগবদ্ভক্তের কৃপা হয়, তাহার তত্ত্ভাব ক্ষীণ হওয়াতে সে শুদ্ধা ভক্তির অধিকারী হয়।

ভুক্তি মুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদিবর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তি সুখ স্যাত্র কথমভ্যুদয়োভবেৎ॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যে মানব ভক্তি সুখের অভিলাষ করে, তাহাকে অন্যান্য বিষয়সুখের আশা এক-বারেই ত্যাগ করিতে হইবে। কারণ যত দিন ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপ পিশাচী হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকিবে, তাবৎ পর্য্যন্ত কিরূপে সেই হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইবে! সুতরাং গুণময়ী সকামাভক্তি সাধন করিতে করিতে যতদিন না ইহমুত্রার্থ ফলভোগে বৈরাগ্য উপস্থিত হইবে, ততদিন শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাব হইবে না। নির্গুণ ভক্তির পরি-পক্কাবস্থায় প্রেমভক্তিতে পর্য্যাবসিত হয়, সুতরাং ভাব ও প্রেমসাধ্য সাধনভক্তিই প্রকৃত ভক্তি পদবাচ্য।

এইরূপ ভক্তির উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে অধিকারী তিন প্রকার। তন্মধ্যে উত্তম অধিকারী যথা :—

শাস্ত্রে যুক্তৌচ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ় শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ।
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত যুক্তিবিষয়ে নিপুণ, তত্ত্ব-বিচার, সাধন-বিচার ও পুরুষার্থ বিচার দ্বারা ভগবানই একমাত্র উপাস্য ও প্রীতির বিষয়, এইরূপ বিচার দ্বারা যাঁহার নিশ্চয় দৃঢ়তর এবং শ্রদ্ধা প্রগাঢ় হইয়াছে, তিনিই ভক্তি বিষয়ে উত্তমাধিকারী। মধ্যমাধি-কারী যথা :—

যঃ শাস্ত্রাদিম্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তুঃ মধ্যমঃ॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্রাদিতে অনিপুণ অর্থাৎ শাস্ত্র বিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ মনোমধ্যে উপাস্যদেবের প্রতি দৃঢ়তর নিশ্চয় রহিয়াছে, এ নিমিত্ত তাহাকে মধ্যমাধিকারী বলে।

কনিষ্ঠাধিকারী যথা :—

যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে॥
ভক্তিরসামৃত সিন্ধু।

যিনি শাস্ত্র ও শাস্ত্রানুগত বিষয়ে অনিপুন এবং কোমল শ্রদ্ধাবান্ অর্থাৎ শাস্ত্র বা যুক্তি দ্বারা যাহার বিশ্বাস খণ্ডন করিতে পারা যায়, তাঁহাকে ভক্তি বিষয়ে কনিষ্ঠাধিকারী জানিতে হইবে।

কনিষ্ঠ ও মধ্যমাধিকারীও সাধনের পরিপাক দশায় উত্তমাধিকারী মধ্যে গণ্য হইয়া থাকেন। ভক্ত মাত্রেরই প্রেম-ভক্তিলাভ চরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। ভুক্তি-মুক্তিলাভ ভক্তের উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ ভগবৎ চরনারবিন্দ সেবা দ্বারা যাহাদের চিত্ত আনন্দ রসে পরিপ্লুত হইয়াছে, সেই সকল ভক্ত জনের মোক্ষ-লাভ নিমিত্ত কখনই স্পৃহা হয় না। তথাপি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য এই চারিটি মুক্তি ভক্তির সম্পূর্ণ বিরোধী নহে, উক্ত অবস্থাতেও কোন কোন ব্যক্তির ভগবৎ-বিষয়ক ভাব উদ্দীপিত হইয়া থাকে। অপর সালোক্যাদিরূপ মুক্তির দুইটী অবস্থা। প্রথমাবস্থায় প্রধানরূপে ঐশ্বরিক সুখ বাঞ্ছনীয়। দ্বিতীয় অবস্থায় প্রেমস্বভাব-সুলভ সেবাই একান্ত বাঞ্ছনীয় হইয়া উঠে, অতএব সেবারসিক ভক্তবৃন্দ প্রথমাবস্থাকেই প্রতিকূল বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু যাহারা একবার মাত্র প্রেমভক্তির মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, ভগবানে একান্ত অনুরক্ত সেই ভক্তগণ সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মোক্ষও কদাচ স্বীকার করেন না। অতএব এক প্রেমমাধুর্য্যাস্বাদি-ভক্তবৃন্দের মধ্যে যাহাদের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের চরণারবিন্দে মন আকৃষ্ট হইয়াছে, তাঁহারাই একান্ত ভক্তদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। কেন না যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্, তাঁহারাই বিশুদ্ধ ভক্তিতে অধিকারী। যথা—

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টা নপিস্বকান্।
ধর্ম্মান্ সন্তজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১ স্ক, ১১ অঃ।

যে ব্যক্তি স্বীয় বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিয়া কৃপালুতাদি গুণ ও কৃপাশূন্য প্রভৃতি দোষের হেয়োপাদেয়তা বিচারপূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করেন, তিনি সাধুদিগের মধ্যে উত্তম। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকেও বলিয়াছিলেন,—"তুমি বর্ণাশ্রম বিহিত সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করায় তোমার যে সকল পাপ হইবে, তাহাহইতে আমিই তোমাকে মুক্ত করিব, এজন্য তুমি শোক করিওনা *।" অতএব ভুক্তি-মুক্তি-ত্যাগী একমাত্র ভগবানের প্রেমসেবাস্বাদি-ভক্তই উত্তমাধিকারী।

বিশুদ্ধ ভক্তির সাধক উত্তমাধিকারী হইলেও সকলেরই ভক্তি বিষয়ে অধিকার আছে। তবে গুণ-ভেদে কামনা-ভেদে ফলের পার্থক্য হইয়া থাকে। জীবমাত্রেরই ভক্তি সহজ ধর্ম্ম, সুতরাং যাঁহার যেরূপ ভক্তির উদ্রেক হইয়াছে, সে সেইরূপ ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে। তবে ভক্তির পরিপক্কাবস্থায় সকলেই নিগুর্ণা ভক্তি লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। বৈধী ও রাগানুগাভেদে ভক্তি প্রধানতঃ দুই প্রকার। এই উভয় ভক্তি যেরূপ পরস্পর বিভিন্ন, তদ্রূপ ইহাদিগের অধিকারী ভক্ত ও সাধ্যপ্রেম ফলও ভিন্ন ভিন্ন। বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্মে নাতি আসক্ত বা নাতি-বিরক্ত ব্যক্তি বৈধী ভক্তির অধিকারী, আর ব্রজভাবলুব্ধ শাস্ত্র-যুক্তি-নিরপেক্ষ ব্যক্তি রাগানুগা ভক্তির অধিকারী। প্রথমাধিকারী কেবল শাস্ত্র-শাসন-ভয়ে কর্ত্তব্যানুরোধে শাস্ত্র-যুক্তি-সিদ্ধ ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হন, কিন্তু উত্ত-

* সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচ॥
শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১৮।৬৬।

রাধিকারী শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা পরিহার পূর্ব্বক কেবল স্বাভাবিক আসক্তি ও রুচির বশবর্ত্তী স্বকীয় স্বভাবসঙ্গত প্রমাণাতিরিক্ত ভগবদ্ভজনে আসক্ত হন। যদি কোনব্যক্তি স্বাভাবিক আসক্তি লাভ করিয়াও শাস্ত্রানুশাসন কর্ত্তৃক নিয়মিত হন, তাহা হইলে তাঁহার সেই ভক্তি মিশ্রা হইয়া থাকে। রাগানুগাধিকারী ভক্ত শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা করেন না বটে, কিন্তু তাঁহার স্বভাব আপনা হইতেই বৈধ ভক্তি কথিত স্বযোগ্য অঙ্গ সমুদায় উদিত হইয়া থাকে। বৈধ ভক্ত্যাধিকারী ভক্ত প্রতিপদে শাস্ত্রমর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বিন্দুমাত্র তদুক্তবিধি-নিষেধের সীমা অতিক্রম করেন না। কিন্তু রাগানুগীয় ভক্ত এরূপ নহেন; তিনি শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধে জলাঞ্জলি দিয়া ভগবৎ-প্রেমোন্মত্ত গুরুর চরণে আত্ম সমর্পণ করেন—সাক্ষাদ্ভজনে দীক্ষিত হন। রাগানুগীয় ভক্তের ভক্তি ভক্ত কৃপাতেই উদয় হয়, তাহার সংসর্গেই পরিপুষ্ট হয়। বৈধী ভক্তির সাধ্য ফল চতুর্ব্বিধা মুক্তি। ইহার মধ্যে কেহ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা, কেহ বা প্রেমসেবোত্তরা মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর প্রেম মাধুর্য্যস্বাদ-সেবি-ভক্তগণ উক্ত দ্বিবিধা মুক্তির কোনটাই গ্রহন করেন না, তাই তাঁহারা শুদ্ধ প্রেম-সেবাই প্রাপ্ত হন। সাযুজ্য মুক্তি সকল প্রকার ভক্তিরই বিরোধী।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, বৈধী ভক্তিতেই রাগানুগাভক্তির উদয় হয়, একথা সম্পূর্ণ সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। বৈধী ভক্তি ও রাগানুগাভক্তি সম্পূর্ণ পৃথক; এক সাধনভক্তির বহির্ব্বৃত্তি, অপর উহার অন্তর্ব্বৃত্তি। যদিও উভয় ভক্তিতে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণের একতা আছে, তথাপি উহাদিগের মধ্যে উপাদানগত ভেদ বহু পরিমাণে লক্ষিত হয়। আনুমানিক উপাসনা বৈধী ভক্তির প্রধান অঙ্গ, কিন্তু রাগানুগামার্গে আনুমানিক উপাসনা নাই—সাক্ষাদ্ভজনই ইহার সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ অঙ্গ। প্রথম ভক্তি কর্ম্ম জ্ঞানাদিমিশ্রা, দ্বিতীয়া ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যা। প্রবল মহিমজ্ঞান বৈধী ভক্তিতে বর্ত্তমান, কিন্তু রাগানুগাভক্তিতে প্রায়ই মহিমজ্ঞান থাকে না। বিধিমার্গের গুণময় ভক্তের অনুগ্রহ হইতে বৈধী ভক্তির উদয় হয়, পক্ষান্তরে রাগমার্গের নির্গুণ ভক্তের অনুকম্পা হইতে রাগানুগা ভক্তির সঞ্চার হয়। সুতরাং বৈধীভক্তি হইতে রাগানুগা ভক্তি উৎপন্ন হয়, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? যাঁহারা বৈধী ভক্তিকে রাগানুগা ভক্তির কারণ রূপে নির্দ্দেশ করেন; তাঁহারা হয় রাগানুগা ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হন, না হয়—বৈধভক্তিজাতা প্রধানীভূতা ভক্তিকেই রাগানুগা বলিয়া অনুমান করেন।

বৈধী ভক্তি যে নিরবধি শাস্ত্র যুক্তি কর্ত্তৃক অনুশাসিত হয়, এরূপ নহে। বিধিমার্গের ভক্তগণ ভাবোদয় পর্য্যন্ত শাস্ত্র ও অনুকূল তর্কের অপেক্ষা করেন, তৎপর রতি জন্মিলেই তাঁহারাও শাস্ত্র যুক্তির অপেক্ষা পরিত্যাগ করেন। বৈধী ভক্তি পরিপাক দশায় কর্ম্ম-জ্ঞানাদি শূন্যা হইয়া শুদ্ধ ভক্তিতে পর্য্যবসিত হয় সত্য, কিন্তু উহাকে রাগানুগা বা রাগাত্মিকা ভক্তি বলা যায় না। বিধিমার্গের যে সমুদায় ভক্ত সিদ্ধি দশায় প্রধানীভূতা ভক্তির অধিকারী হইয়া আত্মারাম শান্ত ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হন, তাঁহাদিগের ভাবে প্রবল

মহিমজ্ঞান বিদ্যমান থাকে। সুতরাং বৈধী ভক্তি কদাপি রাগানুগা ভক্তির কারণ হইতে পারে না। যথা :—

সকল জগতে মোরে করে বিধি-ভক্তি।
বিধি-ভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি॥
শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

ভক্তি স্বরূপতঃ বিশুদ্ধা, নির্গুণা ও স্বতন্ত্রা; উহা সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্ব্বশ্রেষ্ঠা হ্লাদিনী শক্তি। ঐ শক্তির বহির্ব্বৃত্তি প্রধানীভূতা এবং অন্তর্ব্বৃত্তি কেবলা। প্রধানীভূতা ভক্তি ভক্তহৃদয়ের সত্ত্বাদি গুণ অবলম্বন করিয়া প্রকাশিতা হইলে ঈষৎ মলিনের ন্যায় আভাসমান হয়; তদবস্থায় ইহা বৈধী বা গুণময়ী বলিয়া অভিহিত হয়। ইহা মায়া সংস্পর্শজন্য ঈষৎ মলিন ও মৃদু। অপর, কেবলা ভক্তি স্ব-স্বরূপে অবিভূর্ত হয়, প্রবর্ত্ত ভক্তের মায়াময় হৃদয়ে অবস্থিতি করিয়াও সম্পূর্ণ মায়াস্পর্শশূন্য ও অবিকৃত থাকে। তাই এই ভক্তি প্রথম হইতেই কর্ম্মজ্ঞানাদি শূন্যা এবং তীব্রা। ভক্তহৃদয় যাবত গুণময় থাকে, তাবত ইহা রাগানুগা বলিয়া কথিত হয়। এরূপ স্থলে কেবল আধারের গুণময়তা হেতু আধেয় ভক্তি প্রাভাতিক সূর্য্যের ন্যায় অপেক্ষাকৃত মৃদু ভাবে প্রকাশিত হয় মাত্র। নচেৎ ইহা আধারের দোষে কদাপি স্ব-স্বরূপ হইতে পরিভ্রষ্ট হয় না; বরং আধারকে অচিরাৎ আত্ম-সদৃশ নির্গুণ করিয়া তুলে। এই বিশুদ্ধ ভক্তির প্রভাবে গুণময় ভক্তহৃদয়ও অচিরে মায়াতীত হয়।

মায়ার দুইটী বৃত্তি; এক অবিদ্যা, অপর বিদ্যা। অবিদ্যা মায়ার বহির্ব্বৃত্তি এবং বিদ্যা উহার অন্তর্ব্বৃত্তি। ভক্ত নির্গুণ ভক্তি বলে হৃদয়ের এই উভয় আবরণই ভেদ করিয়া থাকেন। ভক্তি সাধনে অবিদ্যা তিরোহিত হইলে বিদ্যার উদয় হয়। এই বিদ্যাই তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মজ্ঞান বলিয়া অভিহিত হয়। কিন্তু আরম্ভদশা হইতেই শুদ্ধ ভক্তের জ্ঞানে অনাদর বশতঃ ভগবন্মাধুর্য্য-পারাবারে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

শাস্ত্রে বৈধী ভক্তিকে মর্য্যাদামার্গ, আর রাগানুগা ভক্তিকে পুষ্টিমার্গ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ভাগ্যবান্ শ্রেষ্ঠাধিকারিগণই পুষ্টিমার্গ অবলম্বন করিয়া থাকেন। আর মর্য্যাদামার্গে আপামর সাধারণের অধিকার আছে। ঈশ্বর বিশ্বাসী যে কোন ব্যক্তি,—যাহার মন সর্ব্বদা না হউক সময়ে সময়ে ভগবানের দিকে আকৃষ্ট হয়, তাহারই ভক্তি সাধনে অধিকার আছে। ভক্তি-ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতিকে অপেক্ষা করে না, ভক্তি বিষয়ে মনুষ্য মাত্রেরই অধিকার আছে। ভক্তি সাধন সম্বন্ধে জাতিভেদ নাই। যথা :—

আনিন্দ্য যোন্যধিক্রিয়তে।
সাণ্ডিল্য সূত্র।

ভগদ্ভক্তিতে নিন্দ্যযোনি চণ্ডাল প্রভৃতিরও অধিকার আছে। চণ্ডাল যদি মনঃ প্রাণ তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া প্রেম-কারুণ্যকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকে, তাঁহার সাধ্য নাই তিনি স্থির থাকিতে পারেন, তাঁহার নিকট জাতি কুল মানের আদর নাই; তিনি একমাত্র ভক্তিতে বাধ্য। ভক্তিহীন ব্রাহ্মণ তাঁহার নিকট আদর পায় না, কিন্তু তিনি ভক্তিমান চণ্ডালকে সাদরে হৃদয়ে ধারণ করেন।

ভক্তিশূন্য মানবে সুধা দান করিলেও ভগবান্ গ্রহন করেন না, কিন্তু ভক্তে বিষ দিলেও অমৃত বোধে ভক্ষণ করিয়া থাকেন। নিষাদরাজ গুহকের ভক্তিতে দ্রব হইয়া শ্রীরামচন্দ্র মিতা বলিয়া তাহাকে আলিঙ্গন দান করিয়াছিলেন। শবরী চণ্ডালিনী হইয়াও ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়াছিল। ধর্ম্মব্যাধ ও চর্ম্মকার জাতীয় রুহিদাসের ভগবদ্ভক্তির কথা কোন হিন্দু অবগত নহে? হরিদাস মুসলমান গৃহে পালিত পালিত হইয়াও হরিনাম প্রচার করিয়া শ্রেষ্ঠ ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তিতে ভুলিয়া ভগবান গোপবালক ও হাড়ি, ডোম-চণ্ডালের উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়াছেন। ভক্তির সঞ্চার মাত্রেই চণ্ডাল পবিত্র হইয়া যায়। ভক্তিমান্ ব্যক্তিই যথার্থ পণ্ডিত ও ব্রাহ্মণ। যথা :—

অষ্টবিধাহ্যেষাভক্তির্যস্মিন ম্লেচ্ছেঽপি বর্ত্ততে।
স বিপ্রেন্দ্রো মুনিঃ শ্রীমান স যতি স চ পণ্ডিতঃ।
গরুড় পুরাণ।

অষ্টবিধা ভক্তি যে ম্লেচ্ছেতে প্রকাশ পায়, সে ম্লেচ্ছ ম্লেচ্ছ নহে, সে বিপ্রেন্দ্র, সে মুনি, সে শ্রীমান, সে যতি ও সে পণ্ডিত।

ভক্তিতে ধনী, দরিদ্র বিচার নাই। বরং ধনীর বাহ্য বস্তুর আসক্তি হেতু অন্য আসক্তি দৃঢ় হয় না, দরিদ্র সর্ব্বাসক্তি ভগবৎমুখী করিয়া উত্তমা ভক্তি লাভ করিয়া থাকে। ভগবান্ যে কাঙ্গালের বন্ধু, তাহা তাঁহার "দীনবন্ধু" "কাঙ্গালশরণ" নামেই পরিচয় দিতেছে। ধন-রত্ন নাই বলিয়া ভগবানের দয়া হইবে না? অর্থাভাবে পরমার্থ লাভে বাধা হয় না। বিশেষতঃ তাঁহার জিনিস তাঁহাকে দিয়া আমাদের বাহাদুরী প্রকাশের প্রয়োজন কি? অতএব ভক্তের ধন রত্নের দরকার কি—তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে চিন্ময় চিন্তামণির চরণে চিত্ত সমর্পণ করিয়া—প্রেম-কারুণ্যকণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বল,—

"রত্নাকর স্তবগৃহং গৃহিনী চ পদ্মা-
দেয়ং কিমস্তি ভবতে পুরুষোত্তমায়।
আভীর বামনয়নাহৃত মানসায়
দত্তং মনো যদুপতে ত্বমিদং গৃহাণ॥"

হে যদুপতে! রত্ন সকলের আকর সমুদ্র তোমার বাসস্থান, নিখিল সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী কমলা তোমার গৃহিণী তুমি নিজে পুরুষোত্তম, অতএব তোমাকে দিবার কি আছে। শুনিয়াছি নাকি আভীরতনয়া বামনয়না প্রেমময়ী রমণীগণ তোমার মন হরণ করিয়া লইয়াছেন,—তাহা হইলে তোমার কেবল মনের অভাব—অতএব আমার মন তোমায় অর্পণ করিতেছি, হে প্রেমবশ্য গোপীজনবল্লভ! তুমি কৃপা করিয়া ইহা গ্রহণ কর। ধনীও ঐরূপ দীনভাবাপন্ন না হইলে—ভিখারীর বেশ না ধরিলে ভগবানের কৃপা পাইতে পারে না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দুর্য্যোধনের রাজভোগ তুচ্ছ করিয়া বিদুরের 'ক্ষুদ' অমৃতময়—অতি আদরের দ্রব্যের ন্যায় ভক্ষণ করিয়াছিলেন।

ব্যবহারিক বিদ্যা বুদ্ধি ভিন্নও ভগবদ্ভক্তি লাভ হয়। সদ্বিদ্যা যে ভক্তি পথের সহায় তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। তবে মূর্খ যে ভক্তির অধিকারী হইতে পারে না, এরূপ নহে। বরং অনেক পণ্ডিত শাস্ত্রালোচনা দ্বারা হৃদয় এত কঠোর ও নীরস করিয়া

ফেলে যে, তাহাতে আর ভক্তি উদ্রেকের উপায় থাকে না। পিতা, মাতা, স্বামী পুত্রকে ডাকিতে কি কাহারও বিদ্যা বুদ্ধি প্রয়োজন হয়? ভক্তির আবির্ভাবে ভক্তের হৃদয়ে আপনা হইতেই জ্ঞানের ভাণ্ডার খুলিয়া যায়।

ভক্তি বয়সেরও অপেক্ষা করে না। একমাত্র পরিণতবয়স্ক বৃদ্ধ ব্যতীত অন্যে ভক্তির অনধিকারী, এরূপ ধারণা নিতান্ত ভ্রমমূলক। বরং বাল্যবয়সেই ভক্তি লাভের জন্য যত্ন করা কর্ত্তব্য। বালকের কোমল হৃদয়ে ভক্তি বীজ উপ্ত হইলে, অচিরেই বৃক্ষোৎপত্তির সম্ভাবনা। সয়তানের উচ্ছিষ্ট দেহ মন লইয়া বৃদ্ধ বয়সে ভগবৎ-সেবা করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। ভক্ত চূড়ামণি প্রহ্লাদ বলিয়াছেন;—

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদং॥

শ্রীমদ্ভাগবত।

বাল্য বয়সেই ভাগবত ধর্ম্ম আচরণ করিবে, জীবন কয় দিনের জন্য? মনুষ্য জন্মই দুর্ল্লভ, তন্মধ্যে সফলকাম জীবন নিতান্তই অধ্রুব। সারা জীবন অধর্ম্মাচরণ করিয়া বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যুভয়ে অস্থির হইলেও আর ভক্তি সাধনের সময় পাইবে না। বিশেষতঃ ভক্তিহীন হইয়া বিদ্যা বা ধনোপার্জ্জন করিলে, তাহা কেবল ধূর্ত্ততা ও শঠতার পরিপোষক হইয়া দাঁড়ায়।

অতএব ভক্তি উপার্জ্জন করিতে জাতি, কুল, বয়স, ধন, বিদ্যা প্রভৃতি কিছুরই অপেক্ষা নাই। ব্যাধের আচরণ, ধ্রুবের বয়স, গজেন্দ্রের বিদ্যা, সুদাম বিপ্রের ধন, বিদুরের বংশ; উগ্রসেনের পৌরুষ, কুব্জার রূপ—সাধারণের চিত্তাকর্ষক দূরে থাকুক, বরং উপেক্ষার বিষয়। তথাপি ইহারা ভগবৎ কৃপা লাভ করিয়া ভক্ত মধ্যে পরিগণিত হইয়াছেন। ভক্তিপ্রিয় ভগবান্ কেবল ভক্তি দ্বারাই সন্তুষ্ট হন, কোন গুণের অপেক্ষা রাখেন না। যথা:—

নাস্তি তেষু জাতিবিদ্যারূপকুলক্রিয়াদি ভেদঃ।

নারদভক্তিসূত্র।

অতএব ভক্তি বা ভক্তদিগের মধ্যে জাতি বিদ্যা, রূপ, কুল, ধন ও ক্রিয়ার ভেদ বিচার নাই। সরল বিশ্বাসের সহিত যে তাঁহাকে চায়, সেই তাঁহাকে পায়, তাঁহার নিকট কঠোর সাধনও পরাস্ত হয়। অতএব সংসারী-সন্ন্যাসী, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, মূর্খ-পণ্ডিত, ধনী-দরিদ্র, সুরূপ-কুরূপ, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলেই ভক্তি বিষয়ে অধিকারী। তবে মর্য্যাদামার্গের ভক্তগণ পরিপাক দশায় চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া স্বকীয় ভাবানুসারে কেহ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা, কেহ বা প্রেম-সেবোত্তরা গতি প্রাপ্ত হন। কিন্তু পুষ্টিমার্গের ভক্ত পরিপাক দশায় শুদ্ধ প্রেমসেবাই প্রাপ্ত হন।

গীতোক্ত আর্ত্ত, অর্থার্থী, জিজ্ঞাসু এই তিন ভক্ত মর্য্যাদামার্গের অধিকারী। আর একমাত্র জ্ঞানীই পুষ্টিমার্গের অধিকারী; সুতরাং সর্ব্বোত্তম ভক্ত। কারণ জ্ঞানী ভক্ত ভগবানের যথার্থ স্বরূপ অবগত আছেন। ভগবান্ দেশকালাদি দ্বারা অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও যে ভক্তেচ্ছাবশে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করেন, সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম হইয়াও যে শ্যামসুন্দরাকার ও মনোময়ী মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হন, এবং আত্মারাম ও আপ্তকাম হইয়াও যে ভক্তপ্রেম-

বৈবশ্যে অনাত্মারাম ও অনাপ্তকাম হন, অনন্ত হইয়া সান্ত হন, বিরাট্ হইয়া স্বরাট্ হন, ইহা ইনি সম্যকরূপে অবগত আছেন। অজ্ঞানী ভক্তের ইহা ধারণা করিবারও সাধ্য নাই। তাই পাশ্চাত্য দেশীয়গণ, তথাপাশ্চাত্য-শিক্ষা-বিকৃত-মস্তিষ্ক ভারতবাসীর মধ্যে অনেকেই তাঁহাদিগকে পৌত্তলিক, জড়োপাসক ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন বলিয়া তাচ্ছিল্য করিয়া থাকেন। কিন্তু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মতে এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ভক্ত আর নাই। তাই পুষ্টিমার্গের সাধককে ভক্ততম বলা হইয়াছে, সুতরাং ইহাঁরাই উত্তমাধিকারী।

———:0:———

সাধক-সঙ্গীত।

আমি আজ কেন এমন হ'লাম তারা।
আঁধার দেখি মা থাকিতে আঁখি তারা॥
অবশ ইন্দ্রিয় একি ধারা,—বুঝিতে না পারি মাগো,
রাত্তি কি দিবস এখন উলঙ্গ কি আছি বসন পরা॥
কণ্টক সম কেন শয্যা বিন্ধিছে গায়?
কণ্ঠ করিল রোধ কে যেন পাষাণের প্রায়,
কি যেন বলিতে চাই, আবার ভুলিয়ে যাই,
পলে পলে হতেছি জ্ঞান হারা॥
অনন্ত বৃশ্চিক যেন করিছে ঘন দংশন
অন্তর দাহেতে দেহ জরা;—
ফেলিলে নিঃশ্বাস আর তুলিতে নারি মা কেন?
হরনারি! এতই কি আজ হয়েছে মা নাড়ী ক্ষীণ?
উহুঃ! উহুঃ! মুহুর্মুহু পিপাসা প্রলাপ বহু;
অমৃতে অরুচি, বল কি করা?
কেন আজ দেখি মাগো জ্বলন্ত অনল রাশি—
চৌদিকে নরক খাদ ঘেরা?
গোবিন্দ কয় মন, তোমার নিকটে এসেছে শমন,
এ সংসারে পাপী জীবের পুরস্কার জে'নরে এমন,
যদি এ এড়াতে চাও, দুর্গা দুর্গা বলে এখন,
নয়ন মুদে শয়ন কর ধরা॥

———:0:———

উদ্দীপনা।

গতকল্য* একটী বালককে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম—"তুমি কোথায় যাইতেছ," বালক উত্তর করিল—"আমি হরিসভায় যাইতেছি." আমি যদিও পূর্ব্বেই অনুমান করিয়াছিলাম, বালক হরিসভায় চলিয়াছে, তথাপি—ফুলের মতন সুন্দর পবিত্রপ্রাণ—তাহার সম্ভাষণ-পিপাসা আমি ত্যাগ করিতে পারিলাম না জিজ্ঞাসা করিলাম—"কোথায় যাইতেছ।' বালক উত্তর করিল,—"হরি সভায় যাইতেছি এবং তাহার স্বভাব-সিদ্ধ হাস্যমুখে আপন মনে চলিয়া গেল তাহার প্রতি আমার জিজ্ঞাসার নিবৃত্তি হইল কিনা ইহার কিছুমাত্র চিন্তা না করিয়া বালক সরলমনে চলিয়া গেল, কিন্তু আমি কেমন যেন এক অন্যমনস্ক ভাবে কয়েক মিনিট পরে আবার বলিয়া ফেলিলাম—"তুমি কোথায় যাইতেছ।" বালক সে সময় দূরে চলিয়া গিয়াছে, চারিদিক জনহীন দেখিয়া ভাবিলাম—কি! আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি? এখানে ত কেহই নাই বালক ত অনেকক্ষণ হইল চলিয়া গিয়াছে, তবে আমি কাহাকে জিজ্ঞাসা করি তুমি কোথায় যাইতেছ? তবে কি কেহ আমাকে জিজ্ঞাসা করিল কোথায় যাইতেছি? একবার ভাবিলাম আমিই ত জিজ্ঞাসা করিলাম, আবার মনে হইল—আমি যেন উহা বলি নাই—অন্য কেহ আমাকে বলিয়াছে। যাহা হউক আমি কিছুই ঠিক করিতে না পারিয়া আমার গন্তব্য স্থানের অভিমুখে চলিতে লাগিলাম, কিন্তু ভাবিতে লাগিলাম বালক ত হরিসভায় যাইতেছে কিন্তু আমি কোথায় যাইতেছি। প্রাণের ভিতর হইতে প্রশ্ন উঠিল কোথায় যাইতেছি। বালক বলিয়া গেল হরিসভায় যাইতেছি। আমি ভাবিলাম ঠিক বলিয়াছে, পাপ মলিনতার বহির্ভূত সরল স্বভাব বালক হরিসভায় যাইতেছে ভাবিলাম হরিসভার প্রকৃত সভ্য আজ হরিসভায় চলিয়াছে। কিন্তু আমি কোথায় যাইতেছি? অবিশ্রান্ত তৈল-প্রবাহের ন্যায় স্রোত শত ধারায় হৃদয় প্লাবিত করিল কিন্তু এই চির-অভ্যস্ত চিরপরিচিত প্রশ্নের মীমাংসা হইল না। এই যে উন্মত্তের ন্যায় [illegible] আকাশের বক্ষে উল্কার ন্যায় সংসারের নানা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া ছুটিয়া যাইতেছি আমি কোথায় যাইতেছি? হায়, হায়! একবারও মনে ভাবি নাই আমি কোথায় যাইতেছি। এই যে দিনের পর দিন নূতন বৈচিত্র নয়ন-মনের চিত্রপটে উদ্ভূত হইতেছে, এই যে মাসের পর মাস বর্ষের পর বর্ষ নিত্য নূতনের ন্যায় আমি আমার জীবন পথে অগ্রসর হইতেছি—আমি কোথায় যাইতেছি? আমি এক দিন অই যে চলিয়া গেল বালক, উহাপেক্ষাও ক্ষুদ্র দেহ ও ক্ষুদ্র সামর্থ্য লইয়া নাকি মাতৃ-ক্রোড়শায়ী ছিলাম, একদিন নাকি উহারই মত কোমল দেহধারী আমি. কোমল প্রাণে সকলের মন কোমল করিয়া দিতাম। তারপর একদিন একদিন করিয়া কতদিন চলিয়া গেল আমি কেবল

* মানিকগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী স্কুলের অন্যতম শিক্ষক শ্রীযুক্ত যোগেশ্বর গাঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক তত্রত্য হরিসভায় পঠিত।

নূতন হইতে নূতনতর রাজ্য অতিক্রম করিয়া নিত্য নূতন দেহে নিত্য নূতন প্রাণে জীবনের এতদূর আসিয়াছি, কিন্তু আজিও জীবনের বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত একবার সমাহিত চিত্তে চিন্তা করি নাই যে, আমি কোথায় যাইতেছি। প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা এবং সন্ধ্যা হইতে প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত আমি যাইতেছি, আমি চলিতেছি, আমি হাসিতেছি, আমি কান্দিতেছি, আমি ক্রুদ্ধ হইতেছি, আমি লুব্ধ হইতেছি প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকারের ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্বের মধ্যে আমি আমার অস্তিত্বের উপলব্ধি করিতেছি—এই আমিত্ব জ্ঞানই আমার জীবন বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু এই যে আমিত্বের পরিচ্ছেদ পরিবর্ত্তন করিতে করিতে জীবন বর্ত্তমান অবস্থায় উপনীত হইয়াছে, ইহার ভবিষ্যৎ আমার নিকট অজ্ঞানতমসে আচ্ছাদিত। এই স্থল-জল-পূর্ণা জীবজন্তু-সমাকুলা, অনন্ত আকাশ পরিবেষ্টিতা বসুন্ধরা নানা বৈচিত্রের লীলা-রহস্যময়-পূর্ণ-রূপিণী সজ্জিত রাখিয়াছে, কিন্তু ইহার সকল রহস্যের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ হইয়াও মানবের জীবন রহস্য সর্ব্বাপেক্ষা দুজ্ঞেয় হইয়াছে। জীবন-রহস্যের দুইটী মাত্র অধ্যায় দেখিয়াছি, এক জন্ম, আর মৃত্যু। এই কুহেলিকময় রহস্যের প্রথম লীলা দেখিয়াছি সূতিকা গৃহে—আর শেষ লীলা দেখিয়াছি শ্মশানে। এই জীবন কোথা হইতে চলিয়াছে কোথায় যাইবে কেহ জানে না, কিন্তু আমি আছি,—আমি আছি, উপলব্ধি করিয়া, আমিই কর্ত্তা, আমিই ক্রিয়া করিতেছি, এই অহঙ্কারে মত্ত হইয়া জীব স্বাভাবিক গতি বশেই যেন জীবন কর্ত্তন করিয়া যাইতেছে। মরণ কি তাহা জানি না, মরণ সুখের কি দুঃখের, শান্তির কি অশান্তির তাহা জানি না। একমাত্র দেখিয়াছি মরণে দেহের বিনাশ সাধিত হইয়া থাকে। মরণান্তে কি হইবে তাহা জানি না, জীবনের পূর্ব্বে কি ছিল তাহাও জানি না। মানব জীবনের দুই প্রান্তস্থ এই দুই কুহেলিকা আমাদিগকে চক্ষু থাকিতেও অন্ধ করিয়া রাখিয়াছে, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ এবং জ্ঞান থাকিতেও অজ্ঞান করিয়া রাখিয়াছে। কোথা হইতে আসিয়া কিসের মধ্য দিয়া কোথায় যাইতেছি তাহা বুঝিতে পারিতেছি না; বুঝিতে চেষ্টাও করিতেছি না। হায়, হায়! আমারই মত অজ্ঞান হইয়া, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু না হইয়া উদ্‌ভ্রান্তের মত তোমরা কোথায় ছুটিয়াছ, তাহা একবারও ভাবিতেছ না কেন? এই যে তুমি অতৃপ্ত লালসার মোহ-মদিরায় উন্মত্ত হইয়া শারদ-চন্দ্রমার শুভ্রজ্যোৎস্নাকে তোমার পালঙ্ক-শয্যায় বদ্ধ করিতে প্রয়াস করিতেছ, এই যে তুমি মহা প্রভাবান পূর্ণ-উত্তাপ পিণ্ড সূর্য্যদেবকে তোমার গৃহকোণের আলোক-স্তম্ভে বসাইবার চেষ্টা করিতেছ, আকাশের বিদ্যুৎ ধরিয়া ক্রীড়নক নির্ম্মাণ করিয়াছ, মহাবল পবনকে আপনার ক্রীতদাস করিয়াছ, তুমি এই বিজ্ঞান-অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া একবার সুস্থ মনে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছ কি জীবন কোন রাজ্যের অভিমুখে নক্ষত্র বেগে ছুটিয়াছে? তোমার জীবনের অভিজ্ঞতা বিচার করিয়া দেখ তোমার প্রাণের আকাঙ্ক্ষা কি! জীবনের এক মুহূর্ত্তেও তুমি মনে করিতে পার নাই যে, তোমার এই আমিত্বের ধ্বংশ হইবে বা মরণ তোমার আমিত্বের লোপ করিতে পারে। সুতরাং মরণান্তে তোমার

অস্তিত্বের বিষয় তুমি দৃঢ়রূপে ধারণা করিয়া রাখিয়াছ, কিন্তু এই রক্ত-মাংসময়-দেহ-বিশিষ্ট-জীবন অতিক্রম করিয়া মরণান্তের সেই অশরীরী জীবন কিরূপ ভাবে চলিতে থাকিবে, আর কোথায় বা তাহার শেষ সীমা নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে; তাহা ক্ষণকালের জন্যও চিন্তা করিয়া দেখিতছ না। পল পল করিয়া পলকে পলকে নূতনত্ব ফলাইয়া এই যে কালস্রোত প্রবাহিত হইতেছে, তাহা কতকাল হইতে আরম্ভ হইয়াছে তাহার সংবাদ রাখিয়াছ কি? বর্ষের পর বর্ষ চলিয়া যায়, এই প্রকারের অযুত সহস্র বর্ষ ব্যাপী এক সত্য যুগ চলিয়া যায়, অযুত সহস্র বর্ষ ব্যাপী ত্রেতাযুগ চলিয়া যায়, দ্বাপর যায়, কলি যায়, এই প্রতি চারিযুগে এক দৈব যুগ যায়, ৭৪০০০ চুয়াত্তর সহস্র দৈবযুগে এক মন্বন্তর যায়। চতুর্দ্দশ মন্বন্তরে এক কল্প হয়, তখন মহাপ্রলয় সংঘটিত হয়, বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড অব্যক্তে পরিণত হয়। বর্ত্তমান সময়ে অষ্টম মন্বন্তরের প্রথম দৈবযুগ চলিয়াছে, তন্মধ্যে সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর অন্ত হইয়া কলিযুগের কাল প্রবাহ ছুটিয়াছে। ভ্রাতৃগণ! একবার মনে করিয়াচ কি যে, তুমি এই সহস্র বর্ষ ব্যাপী অক্ষয় ও অব্যয় জীবন অতিক্রম করিয়া পাপতমসাবৃত কলির ঘোর অজ্ঞানে মুগ্ধ হইয়া কেবল অহঙ্কারে উন্মত্ত রহিয়াছ। হায়, হায়! এই দীর্ঘকাল ব্যাপী অজ্ঞান মোহে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছ, একবার একান্তমনে চিন্তা করিয়া দেখ নাই কেন যে, তুমি কোনদিকে ছুটিয়াছ? তুমি সুখের আকাঙ্ক্ষী, দুঃখের অভিঘাতে তোমার প্রাণ আকুল ক্রন্দনে বিধ্বস্ত হয়, তুমি শান্তির পিপাসী, অশান্তির ক্ষণিক তাড়নায় তুমি অধীর হইয়া যাও, তুমি সৌভাগ্যের প্রত্যাশী, দুর্ভাগ্যের সীমায় পদক্ষেপ করিলে শত বৃশ্চিক তোমাকে দংশন করে; একবার বুঝিয়া দেখ তুমি দুঃখের ন-হ, সুখের প্রার্থী, অশান্তির ন-হ, শান্তির প্রার্থী, নিরানন্দের ন-হ আনন্দের প্রার্থী; ইহা তোমার আমিত্বের স্বভাব ইহা তোমার প্রাণের প্রবণতা। তুমি এই শান্তি ও আনন্দের আকুলআকাঙ্ক্ষার লোক হইতে লোকান্তরে, বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে, যুগ হইতে যুগান্তরে কোটি-গর্ভ-নিষ্ক্রান্ত হইয়া অজ্ঞানতার পথে ভ্রমন করিয়াছ, ভ্রান্ত হইয়া কোথায় যাইতেছ একবার ভাবিয়াছ কি? হায়, হায়! সূতিকাগৃহের অজ্ঞানতার মধ্যে একদিন জননী জঠর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছিলে, ধাত্রী তোমার নাভী-নাড়ী কর্ত্তন করিয়া তোমাকে মাতৃগর্ভের সংস্রব হইতে বিচ্যুত করিয়াছিল, একবার ভাবিয়াছ কি ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী লীলানাটক-সূত্র-ভেদনকরী মহাকালী-প্রকৃতির সূতিকা গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া তোমার আমিত্বের অজ্ঞানবিজৃম্ভিত অহঙ্কার করিয়া উঠিয়াছে। একবার ভাবিয়াছ কি তুমি এক পরম শান্তির আধার, আনন্দ নিকেতন, প্রেমময় আশ্রয়শূন্য হইয়া তুমি এই অতৃপ্ত লালসার আকুল আকাঙ্ক্ষায় উন্মত্তের ন্যায় বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে পরিভ্রমন করিয়াছ? তুমি তোমার আমিত্বের অহংকারে ইন্দ্রিয়ের শতমুখী প্রবণতায় সুখের অন্বেষণে ইতস্ততঃ ধাবিত হইয়াছ; কিন্তু প্রাণের পিপাসা তোমার কিছুতেই শান্তিলাভ করিতেছে না। পর্ব্বতমধ্যস্থ ভীষণ দাবানলের ন্যায় লেলিহান শত জিহ্বা বিস্তৃত করিয়া তোমার ব্যাকুল পিপাসা অধীরাক্রান্তা হইয়াছে। তুমি অর্থ, মান, যশ, জয়, রূপ, স্বাস্থ্য, আরোগ্য এবং কাম নিবৃত্তির

অবাধ গতিমুখী হইয়া যথোচ্ছভাবে বিচরণ করিতেছ। পুত্র, কন্যা, ভ্রাতা, ভগিনী, মাতা, পিতা এবং স্ত্রীর বক্ষ-আলিঙ্গন করিয়া দেখিয়াছ, একান্তভাবে আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তি কোথাও মিলিয়াছে কি? পৃথিবীর আদি হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান জ্বালা যন্ত্রনার অত্যাচার পর্য্যন্ত তোমার আমার মত কোটী কোটী জীব উন্মত্ততায় অধীর হইয়া দুঃখের চরম নিবৃত্তির আশায় নানা পথ অবলম্বন করিয়াছে, সকল দেশের সকল প্রাণী সকল সময়ে ইহার চেষ্টায় ধাবিত হইয়াছে, কিন্তু সকল দেশের পূর্ব্বে, সকল জাতীর পূর্ব্বে, ব্রহ্মাণ্ড জাগাইয়া এই ধন-জন-পূর্ণা-শস্য শ্যামলা প্রকৃতির চিরপ্রিয়া ভারতভূমি হইতে বেদের গম্ভীর বাণী উত্থিত হইয়াছে—"শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা, বেদাহং মহান্তং আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ"—হে বিশ্ববাসী অমৃতের পুত্রগণ একবার শুন—আমি সেই অন্ধকারের পরপারে অবস্থিত মহান্ আদিত্যবর্ণ প্রেমময়কে জানিয়াছি। গম্ভীর হুঙ্কারে দিগদিগন্ত কম্পিত করিয়া ধ্বনি উত্থিত হইয়াছে—"নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নাম"—হে ভ্রান্তজীব, হে মোহ মদিরাক্রান্ত উন্মত্ত জীব, তোমার এই দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় সেই প্রেম-ময়, কৃপাময়, প্রাণময়, আনন্দময়ের আশ্রয়, ইহা ভিন্ন অন্য উপায় নাই। উন্মুক্ত আকাশ-প্রাঙ্গনে ধূপের তীব্রগতিতে আকুল আকাঙ্ক্ষায় যাঁহার জন্য তুমি ধাবিত হইয়াছ, সেই চির-শান্তির আধারকে লাভ করিবার জন্য ব্যগ্র হও। তাঁহারই ঐন্দ্রজালিক প্রকৃতি অঘটন-ঘটন-পটিয়সী লীলার চাতুর্য্যে তোমাকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে, তুমি একবার মোহ-আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া জ্ঞান-বিস্ফারিত-নেত্রে অবলোকন কর—দেখিবে তোমার সেই প্রেম-ময় বিশ্ব ব্যাপিয়া তোমার আলিঙ্গনের অপেক্ষা করিতেছে। (ক্রমশঃ)।

—:0:—

মুক্তিরস্বরূপ ও তল্লাভের উপায়।

এই রোগ, শোক, জরা, মৃত্যুময় সংসারে জন্ম গ্রহণ করিয়া প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিগণ চির-কালই "মুক্তি" রূপ নিরাপদ স্থান লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়াছেন। সকল দেশের—সকল মনীষিগণই মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আপন আপন গভীর গবেষণাপূর্ণ যুক্তি সকল ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদিগের প্রদর্শিত যুক্তিতে মুক্তির ভাবপক্ষে অনৈক্য থাকিলেও অভাবপক্ষে সক-লেরই প্রায় ঐকমত্য আছে। আমরা এই প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য প্রদেশীয় সমস্ত প্রসিদ্ধ দার্শনিক বুধমণ্ডলীর মত উদ্ধৃত করিয়া মুক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে আলোচনা করিব। আশা করি, পাঠকগণ তাহা হইতে মুক্তির স্বরূপ বিষয়ে সার্ব্বভৌম ও সর্ব্ব সমন্বয়ী মত গ্রহণ করিয়া নিঃসংশয় হইতে পারিবেন।

হিন্দুশাস্ত্রানুসারে মুক্তি প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; যথা—জ্ঞানমুক্তি ও কর্ম্মজ-মুক্তি। প্রথম জ্ঞানমুক্তি অর্থাৎ জ্ঞানের দ্বারা যে মুক্তি আনীত হয়; তাহাকে "নির্ব্বাণ" বা "বিদেহ কৈবল্য" মুক্তি বলে এবং তাহা চরমতম

মুক্তি বুঝায়। এই মুক্তি অনন্তকাল-ব্যাপী মুক্তি। দ্বিতীয় কর্ম্মজ মুক্তি অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা একটা নির্দ্দিষ্ট কালব্যাপী মুক্তি। এই মুক্তির শ্রেণী বিভাগ। কর্ম্মজ মুক্তি অর্থাৎ যাগ, যজ্ঞ, তপস্যাদি দ্বারা যে মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা—সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি ও সাযুজ্য।

মাং পূজয়তি নিষ্কামং সর্ব্বদা জ্ঞানবর্জ্জিতঃ।
স মে লোকং সমাসাদ্য ভুঙ্‌ক্তে ভোগান্ যথেপ্সিতান্।
শিবগীতা, ১৩ অঃ, ৪ শ্লোঃ।

যেব্যক্তি অজ্ঞানবর্জ্জিত ও নিষ্কাম হইয়া সর্ব্বদা ভগবানের অর্চ্চনা করে সেই ব্যক্তি ভগবল্লোকে গমন পূর্ব্বক বাঞ্ছিত-ভোগ উপভোগ করিয়া থাকে, ইহাকেই সালোক্য মুক্তি বলে।

জ্ঞাত্বা মাং পূজয়েদ্যস্তু সর্ব্বকাম বিবর্জ্জিতঃ।
ময়া সমান রূপঃ সন্ মল্লোকে মহীয়তে॥
শিবগীতা, ১৩ অ, ৫ শ্লোঃ।

যে ব্যক্তি পরমেশ্বরকে জ্ঞাত হইয়া বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহার পূজা করে, সেইব্যক্তি স্বীয় ইষ্টদেবতার সদৃশ রূপ ধারণ করিয়া তদীয় লোকে গমন করে। ইহাকে সারূপ্য মুক্তি বলে। "সেব সালোক্য সারূপ্য সামীপ্য মুক্তিনিষ্যতে" অর্থাৎ এই সালোক্য ও সারূপ্য মুক্তিই সামীপ্য মুক্তি-স্বরূপ; তাই সামীপ্য মুক্তিকে আর একটা পৃথক মুক্তিরূপে গণনা করা হয় নাই।

ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মাণি মৎপ্রীত্যৈ কুরুতে তু যঃ।
যোহপি তৎফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা।
শিবগীতা ১৩ অঃ ৬ শ্লোঃ।

যে ব্যক্তি ভগবৎ-প্রীত্যর্থে ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্ম সমূহের অনুষ্ঠান করে, সেই ব্যক্তি উত্তম লোকে গমন পূর্ব্বক সেই সেই কর্ম্মের উপযুক্ত ফলভোগ করিয়া থাকে। ইহাকেই সার্ষ্টি মুক্তি বলে।

যৎ করোতি যদশ্নাতি যজ্জুহোতি দদাতি যৎ।
যত্তপস্যতি তৎসর্ব্বং যঃ করোতি মদর্পণম্।
মল্লোকে স শ্রিয়ং ভুঙ্‌ক্তে মত্তুল্য প্রভাববান্।
শিবগীতা, ১৩ অ., ৭ শ্লোঃ।

কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান, ভক্ষণ, হোম, দান ও তপস্যা ইত্যাদি যে কোন কর্ম্ম হউক না কেন, যে ব্যক্তি সেই সমস্ত কর্ম্ম ও কর্ম্মফল ভগবানে সমর্পণ করে, সেই ব্যক্তি তাঁহার তুল্য প্রভাবশালী হইয়া তদীয় লোকে গমন পূর্ব্বক সুখভোগ করিয়া থাকে। ইহারই নাম সাযুজ্য মুক্তি।

"ইতি চতুর্ব্বিধা মুক্তি নির্ব্বাণঞ্চ ততঃ পরং" অর্থাৎ এই চতুর্ব্বিধ মুক্তির পর নির্ব্বাণ মুক্তি। জ্ঞানিগণ নির্ব্বাণ ব্যতীত কখন একটা নির্দ্দিষ্টকাল স্থায়ী এই চারি প্রকার মুক্তির পক্ষপাতী নহেন। কেন না এই মোক্ষ কর্ম্মাদি দ্বারা লাভ হয়,—কিন্তু তাহার ক্ষয় আছে। পরিমিত কাল সুখ-সম্ভোগ ঘটিতে পারে, কিন্তু সেই পরিমিত কাল অন্তে আবার দুঃখ উপস্থিত হইয়া থাকে। অতএব এ সকল সম্যক্ মুক্তির উপায় নহে,—রোগ আরোগ্য হইয়া আবার হইলে তাহাকে প্রকৃত আরোগ্য বলে না। আত্যন্তিক দুঃখমোচন বা স্বরূপ প্রতিষ্ঠার নামই যথার্থ মুক্তি,—তাহাই নির্ব্বাণ নামে কথিত হয়। পরম পুরুষার্থই নির্ব্বাণের নামান্তর,—জগতের যাবতীয় জ্ঞানী ব্যক্তি চিরকালই এই নির্ব্বাণ রূপ নিরাপদ স্থান

লাভ করিবার জন্য যত্ন করিয়া গিয়াছেন। পরম পুরুষার্থ বিচারই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শন শাস্ত্রের বিশেষ অঙ্গ। তাঁহারা প্রথমতঃ মানব জীবনের লক্ষ্য স্থির করিয়া তদনুকূল বলিয়া শাস্ত্র বিচারের অবতারণা করিয়াছেন। অনুধাবন করিলে দেখা যায় যে, দার্শনিকেরা মূলতঃ বক্ষ্যমান তিনটী লক্ষ্য বিষয়ের একটীকে পরম পুরুষার্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; দুঃখনিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপাবাপ্তি (Self-realisation)।

প্রাচীন গ্রীক্‌দার্শনিকের মত।

এতদ্ব্যতীত পূর্ণত্ব-লাভ (Perfection) কেও কোন কোন দার্শনিক পরম পুরুষার্থ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এরিষ্টটল্ ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী গ্রীসীয় দার্শনিকগণ সাধারণতঃ পূর্ণত্বলাভকেই মূল লক্ষ্যরূপে উপস্থাপিত করিয়াছেন; ইহার কারণ এই যে, তাঁহারা কর্ত্তব্যানুষ্ঠান ও সুখলাভ, এতদুভয়ের বিরোধ সম্ভাবনা স্পষ্টরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন নাই; কাজেই কর্ত্তব্যতৎপরতা ও সুখাবাপ্তি এই দুইটীকে পরস্পরানুগামী রূপে গ্রহণ করিয়া, এতদুভয়ের ঐক্যরূপ পূর্ণত্ব লাভকে পরম পুরুষার্থ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। *

প্লেটোর মতে কেবল জ্ঞান অথবা সুখান্বেষণেই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য পর্য্যবসিত হয় না। বস্তুতঃ বৃত্তি সমূহের পরস্পরাপেক্ষ স্ফুরণ-রূপ পূর্ণত্বেই আত্মা প্রকৃত জীবন লাভ করে। যদিও প্লেটো স্থানে স্থানে দুঃখানুষঙ্গী ও ক্ষণস্থায়ী বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন, কিন্তু আদ্যোপান্ত দেখিতে গেলে জ্ঞানানুসারি-কর্ত্তব্য-তৎপরতা (Virtue) ও সুখলাভ, এতদুভয়ের অবিচ্ছিন্নত্ব প্রদর্শন করাই প্লেটোর অভিমত বলিয়া প্রতীয়মান হয়। এরিষ্টটলের মতে শুভলাভ (Endaimonia) ই মানব জীবনের চরম লক্ষ্য। এই শুভলাভ সুখলাভের নামান্তর নহে। এরিষ্টটল ইহাকে "Perfect activity in a perfect life" অর্থাৎ "সাধু জীবনে সাধু কর্ম্মানুষ্ঠান" বলিয়া ব্যাখ্যাত করিয়াছেন; সুখ ইহার নিয়ত অনুষঙ্গী মাত্র। —কাজেই দেখা যায়, উক্ত দার্শনিক দ্বয়ের কেহই সুখবিরোধি-কর্ত্তব্য-তৎপরতার বিচার করেন নাই, এবং কর্ত্তব্য-তৎপরতা ও সুখ এতদুভয়ের নিয়ত সহচারিত্ব বিষয়ে কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণও প্রদর্শন করেন নাই। বস্তুতঃ সুখলাভ ও স্বরূপাবাপ্তি এতদুভয় হইতে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিতে গেলে কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের চরমলক্ষ্যত্ব কিছুতেই উপপন্ন হয় না। †

এরিষ্টটলের পরে ষ্টোয়িক্ ও এপিকিউরিয়ান্ মত এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ষ্টোয়িক্ দিগের মতে স্বভাবের অনুবর্ত্তন করাই মনুষ্যের চরম লক্ষ্য; সুখানুসরণ ইহার বিরোধী। দুঃখে অনুদ্বিগ্ন হইয়া ও বিষানুষক্ত-পকান্নবৎ সুখলিপ্সা পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠানই মনুষ্যের শ্রেষ্ঠ পন্থা। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে দেখা যাইবে যে, দুঃখনিবৃত্তি ব্যতিরেকে ষ্টোয়িক্‌দিগের অন্য কোন প্রসিদ্ধ লক্ষ্য উপপন্ন হয় না। স্বভাবের অনুবর্ত্তনের (Comformity to

*Vide Sidgwick's Methods of Ethics:—P. 106 দ্রষ্টব্য।

† ঐ P. 392 দ্রষ্টব্য।

nature) প্রকৃত স্বরূপ কি তাহা নিতান্ত দুর্বোধ্য। ব্যাখ্যাতার ইচ্ছানুসারে ইহাকে যেদিকে ইচ্ছা ঘুরাইতে ফিরাইতে পারা যায়। ইউরোপের অধুনাতন রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে ইহার ছায়াপাত হইয়াছে; জানি না কি ঘোরান্ধকারে ইহার পরিণতি হইবে। এই ছায়াপাতের মূল ফরাসি মনীষি রুসো;—অমানুষী কল্পনাবলে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই ফরাসি পণ্ডিত মানব জাতির আদিম অবস্থার এক অদ্ভুত চিত্র অঙ্কিত করিলেন। সেই চিত্রে ধনী ও দরিদ্র, রাজা ও প্রজা, প্রভু ও ভৃত্য এই সমস্ত ভেদের অস্তিত্ব নাই। তাই অসামান্য, অমূলক প্রাধান্য তাঁহার মতে অত্যাচারের রূপান্তর, স্বার্থপরতার কুৎসিত পরিণাম। "Live according to nature" অর্থাৎ প্রকৃতির অনুবর্ত্তন কর, অন্যায় অমূলক অস্বাভাবিক তারতম্য দূরীকৃত কর, ইহাই তাঁহার মূল মন্ত্র।—বোধ হয় ইহা হইতেই পাঠকগণ ষ্টোয়িক্ মতের অস্পষ্টার্থত্ব বুঝিতে পারিবেন।

প্রাচীন গ্রীসীয় দর্শনে এপিকিউরাসের মত ষ্টোয়িক্ মতের প্রতিদ্বন্দ্বী। এপিকিউরাস্ বলেন যে, সুখলাভ (Happiness) ই মানবের শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। সুখ হইতে বিচ্ছিন্ন পুণ্যকর্ম্মের কোন মূল্য নাই। কিন্তু এই সুখের ব্যাখ্যা তাঁহার মতে স্বতন্ত্র;—প্রবৃত্তির অনুবর্ত্তন সাময়িক উত্তেজনার তৃপ্তিসাধন এপিকিউরাসের মতে দুঃখবৎ হেয় এবং দুঃখাসক্তিভিন্ন শান্তি (imperturbable tranquillity) ই সর্ব্বথা অনুসরণীয়। কাজেই একরূপ ধরিতে গেলে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি ই এপিকিউরিয়ান্ মতে পরম পুরুষার্থ।

আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকের মত।

এইত গেল প্রাচীন কালের কথা। আধুনিক পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা অনেকেই সুখ (Pleasure) কেই মানব যত্নের চরম লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। লক্, হিউম্, মিল্, বেন্থাম্, বেইন্ ও সিজ্উইক্ প্রভৃতি দার্শনিকগণের ইহাই অভিমত। অন্যদিকে জর্ম্মান্ পণ্ডিত হেগেল্ ও তদনুবর্ত্তী গ্রীন্, কেয়ার্ড্ প্রভৃতি দার্শনিকগণ আত্মার পূর্ণত্ব (Self-realisation) সাধনকেই সর্ব্ব প্রযত্নের শেষ লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন,—

"To selfconscious being, pleasure is a possible but not an adequate end; by itself, indeed, it cannot be made an end at all, except by a selfcontradictory abstraction" (Caird's Kant, Vol. 11, P. 230.)

চিন্তাশীল মনুষ্যের নিকট সুখ অন্যান্য লক্ষের মধ্যে একটী লক্ষ্য হইতে পারে বটে, কিন্তু ইহাকে পূর্ণ লক্ষ্য বলা যাইতে পারে না। সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করিতে গেলে ইহাকে লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করাও অসঙ্গত। বস্তুতঃ সুখ আত্ম-পূর্ণত্ব-লাভের আনুষঙ্গিক ফল হইলেও মূললক্ষ্য পরিত্যাগ করিয়া ইহাকেই একমাত্র চরম লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করা সঙ্গত নহে।

ভারতীয় দর্শন।

পরম পুরুষার্থ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য দার্শনিকগণের মত উদ্ধৃত হইল, এক্ষণে ভারতীয় দার্শনিকগণের মতাবলীও এই স্থলে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাউক। ভারতে ছয়খানি মূল দর্শন শাস্ত্র প্রচলিত আছে। যথাঃ—

গৌতমস্য কণাদস্য কপিলস্য পতঞ্জলে ।
ব্যাসস্য জৈমিনেশ্চাপি দর্শনানি ষড়েব হি ॥

গৌতমের ন্যায়, কণাদের বৈশেষিক, কপিলের সাংখ্য, পতঞ্জলির যোগ, ব্যাসের বেদান্ত এবং জৈমিনির মীমাংসক—এই ছয়-জন ঋষির ছয় খানি মূল দর্শনশাস্ত্র। আবার উহাঁদের শিষ্যোপশিষ্যগণ বিরচিত বহু দর্শন-শাস্ত্র বিদ্যমান আছে, তাহাও উক্ত নামধেয় শাস্ত্রান্তর্গত। এতদ্ব্যতীত চার্ব্বাকদর্শন, বৌদ্ধ-দর্শন, পাশুপত বা শৈবদর্শন, বৈষ্ণব বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন প্রভৃতিও দার্শনিক ইতিহাসে বিশেষ পরিচিত।

চার্ব্বাকদর্শনের মত।

চার্ব্বাক মতে অঙ্গনালিঙ্গন ও ঋণ করিয়াও ঘৃত সেবনই পরম পুরুষার্থ। কাজেই এতন্মতে পারতন্ত্র্যই বন্ধ ও স্বাধীনতাই মোক্ষ স্বরূপ। দেখিতে গেলে আত্মনাস্তিক-দেহাত্মবাদিদিগের পক্ষে দেহ-মুক্তিই চরম মুক্তি। ঈদৃশ মুক্তিবাদ সম্বন্ধে ভগবান্ দত্তাত্রেয় বলিয়াছেন,—"যা মুক্তিঃ পিণ্ডপাতেন সা মুক্তি শুনি শূকরে" অর্থাৎ দেহপাতে যে মুক্তি, তাহা শূকর কুকুরাদির-ও হইয়া থাকে।

বৌদ্ধ দর্শনের মত।

বৌদ্ধমতে সমস্ত বাসনার উচ্ছেদে যে শূন্য স্বরূপ পরিনির্ব্বাণ অধিগত হয়, তাহাই পরম পুরুষার্থ। নির্ব্বাণ আর আত্মোচ্ছেদ একই কথা। এই আত্মোচ্ছেদ অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির সাধনরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকিলে—বস্তুতঃ অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। তাহা না হইলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অন্তর হইতে অন্তরতম আত্মার উচ্ছেদে উদ্যুক্ত হইবে? বুদ্ধ-বংশ-লেখক বর্ত্তমান বৌদ্ধ-দিগের গৌরবস্থল রিজ্‌ ডেভিড্‌ সাহেব নির্ব্বাণ শব্দে এইরূপ অর্থ প্রকাশ করেন যে, মনুষ্যের সত্ত্বা বিলোপ বা একেবারে ধ্বংশ নহে, কেবলমাত্র ঘৃণা, ভ্রম ও তৃষ্ণা এই তিনটীর আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়।*

জৈন গণের দার্শনিক মত।

জৈন মতে আবরণমুক্তিই মুক্তি। এই আবরণ যাহাই কেন হউক না, দুঃখনিবৃত্তি বা সুখ লাভের সাধনরূপেই তন্মুক্তি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে।

বৈষ্ণব দার্শনিকের মত।

বৈষ্ণব মতে জীব ভগবানের নিত্যদাস, সুতরাং বন্দন অর্চ্চনাদি করিয়া জীব স্বরূপ অর্থাৎ-প্রেমসেবোত্তরা গতি লাভই পরম পুরুষার্থ। জীব ও ঈশ্বর পরস্পর ভিন্ন,—সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বর ও মূঢ়জীব পরস্পর বিরোধি-ধর্ম্মাপন্ন, তাই তাহাদের অভেদ উপপন্ন হয় না।

শৈব ও পাশুপত মতে পরমেশ্বর কর্ম্মাদি নিরপেক্ষ নিমিত্ত কারণ। পশুপতি ঈশ্বর

*"Nirvana is therefore the some thing as a sinless, calm, state of mind; and if translated at all, may best, perhaps, be rendered "holiness" holiness, that is, in the Buddhist sense, perfect peace, goodness, and wisdom." ("Buddhism" by Rhy's Devid, chap, IV, P. 1112.)

পাশুপত দর্শনের মত।

পশুপাশ বিমোক্ষের নিমিত্ত যোগের উপদেশ করিয়াছেন। যোগ ঐশ্বর্য্য ও দুঃখান্ত বিধান করে, ইহাই পরম পুরুষার্থ। শাক্ত মতাবলম্বীরাও এই মতের অনুসরণ করিয়া থাকেন।

ভট্টগণের দার্শনিক মত।

ভট্ট মতাবলম্বিগণ (প্রসিদ্ধ ভট্টপাদ কুমারিল এই মতের প্রবর্ত্তক বলিয়া, ইহা ভট্টমত নামে পরিচিত।) বলেন, নিত্য নিরতিশয় সুখাভিব্যক্তির নাম মুক্তি। বেদোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান তল্লাভের উপায়, কাজেই ইহাঁরা গৃহস্থাশ্রমকেই শ্রেষ্ঠ আশ্রম বলিয়া গ্রহণ করেন। এবং বলিয়া থাকেন যে, সন্ন্যাস ধর্ম্ম বা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য অন্ধ, পঙ্গু ইত্যাদি গৃহধর্ম্মে অক্ষম ব্যক্তিদিগেরই অবলম্বনীয়! ইহাঁরা ঈশ্বর-নাস্তিত্ব-বাদী।—এখন কথা এই—ভট্টাভিমত নিত্য-সুখ সম্ভাব্য কিনা?—বিচার করিলে দেখা যায় যে, সাপেক্ষ-সুখের নিত্যত্ব-সিদ্ধি কিছুতেই উপপন্ন হয় না;—বিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ যাহার মূল, সে সুখের অবিচ্ছিন্ন-প্রবাহ কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? কাজেই সুখলাভকেই পরম পুরুষার্থ রূপে নির্দ্দেশ করিতে গেলে, সুখের নিত্যত্বের দিকে না চাহিয়া পরিমাণাধিক্যই লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য।

পাতঞ্জল দর্শনের মত।

পাতঞ্জল দর্শনের যোগানুশাসনই মুখ্য-লক্ষ্য। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। যোগানুষ্ঠানের চরম অবস্থায় নির্ব্বীজ সমাধিলাভে অতুল আত্মানন্দ অনুভব করাই, এতন্মতে পরম পুরুষার্থ। ইহাঁরা আত্মার বহুত্ব ও ঈশ্বর স্বীকার করেন;—সেই ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্ব শক্তিমান্ ও সমস্ত জগতের নিমিত্ত কারণ। সুতরাং অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ মুক্তি তত্ত্বাভ্যাস অথবা ঈশ্বর প্রণিধান দ্বারা অধিগম্য। অতএব বলিতে হয়, বেদান্ত ব্যতীত ভারতীয় অন্যান্য দর্শনাপেক্ষা পাতঞ্জল দর্শনের সূক্ষ্ম লক্ষ্য উচ্চাসন প্রাপ্ত হইয়াছে। যোগানুশাসন বেদান্তবাদীরও অবলম্বনীয়।

সাঙ্খ্য, ন্যায়, বৈশেষিক ও মীমাংসক দর্শনের মতে অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এই দুঃখ নিবৃত্তির প্রকার ভেদ আছে। সাঙ্খ্য বলেন;—

অথ ত্রিবিধা দুঃখাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্ত পুরুষার্থঃ।

সাঙ্খ্য দর্শন, ১, ১।

সাঙ্খ্য দর্শনের মত।

ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) যে আত্যন্তিক-নিবৃত্তি, তাহারাই নাম পরম পুরুষার্থ। সাঙ্খ্যমতে ঈশ্বর স্বীকারের কোন প্রয়োজন নাই; আত্মা বহু ও পরস্পর ভিন্ন। আত্মা স্বামী, বুদ্ধি তাঁহার স্ত্রী; অবিবেকাবস্থাতে স্ত্রী জ্ঞান স্বরূপ নির্গুণ স্বামীতে আপনার কর্তৃত্বাদি-বিকারের আরোপ করিয়া অপরাধিনী ও তৎফলে দুঃখভাগিনী হয়। কিন্তু সাধ্বী অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্ত্ব-সম্পন্নাবুদ্ধি যখন পতি-আত্মার প্রকৃত স্বরূপ দেখিতে পান, তখন ইহজন্মে অপার আনন্দ অনুভব করিয়া, অন্তে পতিদেহে অর্থাৎ আত্ম স্বরূপে লীন হইয়া যান। ইহাই আত্যন্তিক দুঃখ-নিবৃত্তিরূপ পরম পুরুষার্থ। এতন্মতে আত্মার মুক্তাবস্থাই স্বাভাবিক, বন্ধ অজ্ঞান কৃত মাত্র—বন্ধই স্বাভাবিক হইলে শ্রুতিতে মোক্ষসাধনের উপদেশ বিহিত হইত

না। সুতরাং বিবেক দ্বারা অজ্ঞান প্রশমিত হইলে দ্রষ্টার আত্মস্বরূপে অবস্থানই মুক্তি।

ন্যায়দর্শনকার গৌতম বলিয়াছেন;—

সুখ-দুঃখ-প্রবৃত্তি,-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানাং—
উত্তরোত্তরাপায়ে তদনন্তরাভাবাদপবর্গঃ।
ন্যায়দর্শন, ১, ১, ২।

ন্যায়দর্শনের মত।

দুঃখ, জন্ম, প্রবৃত্তি, দোষ ও মিথ্যাজ্ঞানের অববর্জ্জন বা অভাবরূপ যে সম্পূর্ণ সুখাবস্থা, তাহার নাম অপবর্গ বা পরম পুরুষার্থ। ইহাঁরা অনুমান প্রমাণ-বলে ঈশ্বরের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতে যত্ন করিয়া থাকেন। তবে যে সংসারে দুঃখের ক্রীড়া দেখা যায়, সে প্রাণীকৃত কর্ম্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। পরমেশ্বরের অনুগ্রহবশে শ্রবণাদিক্রমে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে উক্ত দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি-রূপ নিঃশ্রেয়স লব্ধ হয়; কারণ, মিথ্যাজ্ঞানই অনাত্মপদার্থ দেহাদিতে আত্মবুদ্ধি উৎপন্ন করিয়া তদনুকূল পদার্থে রাগ, তৎপ্রতিকূল পদার্থে দ্বেষ ও তন্মুখে সর্ব্বপ্রকার দুঃখের কারণীভূত হইয়া থাকে। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি হইলে সর্ব্ব প্রকার প্রবৃত্তির নিরোধ হয়, পুনর্জ্জন্মের আর সম্ভাবনা থাকে না; তখন পুরুষ ঘটীযন্ত্রবৎ নিয়ত পরিবর্ত্তনশীল সর্ব্ব দুঃখের মূলীভূত সংসার হইতে মুক্তিলাভ করে—ইহারই নাম পরম পুরুষার্থ। ইহাঁরাও আত্মার বহুত্ব স্বীকার করেন।

বৈশেষিক-দর্শন-প্রণেতা কণাদ ন্যায়-দর্শনের ন্যায় অনুমান প্রমাণ দ্বারা ঈশ্বর সিদ্ধ করিতে প্রয়াস করিয়াছেন; এবং বহু বিষয়ে গৌতমের সহিত কণাদের বিশেষ ঐক্য আছে।

বৈশেষিক দর্শনের মত।

বৈশেষিক মতে আত্মা নিত্য, বিভু ও অনুমেয়—সুখ দুঃখ ইচ্ছা দ্বেষাদি তাঁহার লিঙ্গ। সুখ দুঃখাদি বৈষম্য ও অন্যান্য অবস্থাভেদের ব্যবস্থার্থ আত্মার নানাত্বও স্বীকার করিতে হইবে—আত্মচৈতন্য আগন্তুক; ইচ্ছাদ্বেষাদির ন্যায় চৈতন্যও আত্মার গুণমাত্র। এই গুণসঙ্গ নিরস্ত হইলে আত্মা আকাশের ন্যায় অবস্থান করেন, ইহাই বৈশেষিক মুক্তি। সুতরাং এতন্মতেও অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তিই পরম পুরুষার্থ।

মীমাংসক দর্শনের মত।

মীমাংসক-দর্শন-প্রণেতা জৈমিনি ঈশ্বর নিরাকরণ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার নিরীশ্বর-বাদিত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না; বস্তুতঃ বৈশেষিক মত নিরাকরণ করাই উঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য। তিনি বলেন,—ঈশ্বর না থাকিলেও মনুষ্য বিধি-বিহিত কর্ম্ম দ্বারা প্রপঞ্চ সম্বন্ধ বিলোপ-রূপ পরমপদ লাভ করিতে পারে—বেদের ইহাই অভিপ্রায়। জীব বহু ও কর্ম্মের অনুচর,—কর্ম্ম আপনা হইতেই ফল প্রদান করিয়া থাকে। মোক্ষাবস্থাতে মনোবিনাশ হয় না; বস্তুতঃ আত্মা তখন মনকে লইয়া স্বরূপানন্দ উপভোগ করেন। তাই তিনি বলিয়াছেন;—

"যন্ন দুঃখেন সম্ভিন্নং ন চ গ্রস্তমনন্তরম্।
অভিলাষোপনীতঞ্চ তৎ সুখং স্বপদাস্পদম্॥"

নিরবচ্ছিন্ন সুখ সম্ভোগই স্বর্গ এবং তাহাই মনুষ্যের সুখ-তৃষ্ণার বিশ্রামভূমি; তাহাই পরম পুরুষার্থ এবং তাহাই মুক্তি ও অমৃত।

বাস্তবিক মনে হয়, দুঃখ নিরোধ হইলেই মানুষ মুক্ত হয়। দুঃখ নিবারণ কল্লেই মানুষের আকুল-আকাঙ্ক্ষার ছুটাছুটি। ঐকান্তিক দুঃখ নিরোধের নামই মুক্তি। ইহা একটা অস্বাভাবিক তর্কজালজড়িত অদ্ভুত কথা নহে,—প্রাণের অতি নিকটের কথা। তাই জগতের যাবতীয় দার্শনিকগণ "দুঃখের আত্যন্তিক নিরোধকেই পরম পুরুষার্থ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রভেদ এই যে, বিভিন্ন দার্শনিকের মতে ইহা বিভিন্নোপায়-লভ্য। পাশ্চাত্য দার্শনিকের এই বিভেদ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে। ভারতীয় দার্শনিক মতেও অতি সূক্ষ্ম দুর্লক্ষ্য প্রভেদ আছে। মাধবাচার্য্যের বর্ণনানুসারে স্বয়ং ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সারদাপীঠাধিরোহন সময়ে এই বিভেদ প্রদর্শন করিতে আহুত হইয়া বলিয়াছিলেন;—

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের প্রদর্শিত অনৈক্য।

অত্যন্ত নাশো গুণ সঙ্গতে যা স্থিতির্নভোবৎ কণভক্ষ পক্ষে।
মুক্তি স্তদীয়ে চবণাক্ষ পক্ষে সানন্দ সম্বিৎ সহিতা বিমুক্তিঃ।
শঙ্করবিজয়।

গুণসঙ্গের সম্পূর্ণ নিরোধ হইলে আত্মার আকাশের ন্যায় শূন্য রূপে অবস্থান, ইহাই বৈশেষিক মুক্তি; ন্যায়মতে আনন্দ ও জ্ঞান সংমিশ্র পূর্ব্বোক্ত অবস্থাই মোক্ষাবস্থা। কিন্তু নৈয়ায়িক মতে মুক্তির এরূপ ব্যাখ্যান স্বীকার করিলে পূর্ব্বাপর সঙ্গতি দুর্ঘট হইয়া উঠে। নৈয়ায়িক মতে অদৃষ্টবশে আত্মার সহিত মনের সংযোগে চৈতন্যের উৎপত্তি হয়; ইচ্ছা দ্বেষ প্রযত্নাদির ন্যায় ইহা আত্মার একটী গুণ মাত্র। যদি বিমুক্ত অবস্থায় গুণসঙ্গতির অত্যন্ত নাশ হইল, তবে চৈতন্য কোথায় থাকে, আনন্দই বা কিরূপে উৎপন্ন হয়?—তবে যদি দুঃখাভাবকেই অনির্ব্বচনীয় আনন্দ বলা হয়, সে স্বতন্ত্র কথা; কিন্তু তাহা হইলে বস্তুতঃ বৈশেষিক ও নৈয়ায়িক মতে কি প্রভেদ রহিল? জৈমিনির মতে মন দিয়া আত্মার স্বরূপানন্দ ভোগই মোক্ষাবস্থা। কিন্তু মন'ত অনিত্য পদার্থ, সুতরাং মনের সাহায্যে নিত্যানন্দ উপভোগ অসম্ভব। সাংখ্য ও পাতঞ্জল মতে আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগই মুক্তি।

সুতরাং এতাবতা যতগুলি দার্শনিক মত আলোচিত হইল, তাহার আমূল বিবেচনা করিতে গেলে দেখা যায় যে, আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি, সুখলাভ ও স্বরূপাবাপ্তি এই তিনটীকেই বিভিন্ন দার্শনিক সম্প্রদায় পরম পুরুষার্থ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এখন দেখা যাউক উক্ত লক্ষ্য-ত্রয়ে সম্বন্ধ কি? এবং উহাদের কোন্‌টীকে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য রূপে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

সমস্ত দার্শনিক মতের মূল লক্ষ্য।

একদিকে দেখা যায় সংসার নানা দুঃখ-সঙ্কুল; জীব নিরন্তর আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক, এই ত্রিবিধ দুঃখে উপতাপিত; মনুষ্য জীবনের আদিতে অন্ধকার, অন্তে অন্ধকার, মধ্যে সুখ-খদ্যোত ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া নিবিয়া যায়। এই রূপে ক্ষণস্থায়ী বৈষয়িক সুখ দুঃখমূল, দুঃখানুষঙ্গ ও দুঃখ-লভ্য, ইহা বিবেচনা করিয়া পণ্ডিতেরা তাহাতে তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না। কাজেই পরিণামদর্শী-জ্ঞানিরা বৈষয়িক রাগানুবিদ্ধ সুখলাভ হইতে দুঃখ নিবৃত্তিরই অনুসরণীয়ত্ব উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত দুঃখনিবৃত্তি-কেই পরম পুরুষার্থ রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ।)

দুর্ভিক্ষ-সংবাদ।

(সেক্রেটারির পত্র।)

শ্রীশ্রীভগবানের অপার করুণার উপর নির্ভর করিয়াই আমরা কাছাড়-শ্রীহট্টের পার্ব্বত্যঅঞ্চলের দুর্ভিক্ষ কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলাম; আজ আমরা আনন্দের সহিত জানাইতেছি যে, অনাথ-নাথ শ্রীভগবান্ আমাদিগকে সেবা কার্য্য হইতে অবসর দিয়া স্বয়ংই দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারিগণের রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন,—আপনার মঙ্গল-ক্রোড়ে তাহাদিগকে টানিয়া লইয়াছেন। এ সম্বন্ধে দুর্ভিক্ষভাণ্ডারের সেক্রেটারি শ্রীযুক্ত বাবু আনন্দমোহন রায় (হাইলাকান্দির উকিল) মহাশয় আমাদিগকে যে পত্র লিখিয়াছেন, নানাস্থানাবস্থিত সেবকবৃন্দের অবগতির জন্য আমরা পত্রখানি নিম্নে অবিকল উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যথাঃ—

হাইলাকান্দি; ৭।৫।১৯

সবিনয় নমস্কার নিবেদনমেতৎ

আপনার প্রেরিত পত্র ও * * * প্রাপ্ত হইয়াছি। দেশের মঙ্গলের জন্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়া আপনারা যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন, তাহা নিতান্তই আনন্দদায়ক। শ্রীভগবান্ আপনাদের কার্য্যের পূর্ণ সহায় হউন।

এদিকে দুর্ভিক্ষের প্রকোপ হ্রাস প্রাপ্ত হইয়াছে। শ্রাবণের শেষ হইতে কিছু কিছু ফসল প্রাপ্ত হওয়ায়, বর্ত্তমান সপ্তাহে অতি সামান্য সাহায্য মাত্র দেওয়া হইয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে সাহায্য বন্ধ করা হইবে। আমরা এ পর্য্যন্ত প্রায় ২৭০০৲ টাকা বিতরণ করিয়াছি। সরকার হইতে প্রায় ১০০০৲ টাকা কৃষিঋণ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্যান্য লোক হইতে ঋণ লওয়ার সুবিধা হওয়ায় কোনমতে ইহাদের জীবন রক্ষা হইয়াছে। শ্রীভগবানের কৃপায় যে ইহারা এই বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহার চরণে আমাদের শত প্রণিপাত।

আপনারা এই কার্য্যে যে রূপ অর্থ-সাহায্য করিয়াছেন, তাহাতে আপনাদের মহত্ত্ব উজ্জ্বলাকারে লোকলোচনে প্রতিভাত হইয়াছে। অবশ্য আপনারা প্রশংসার প্রার্থী নহেন; আমিও প্রশংসা করিতেছি না, যাহা সত্য তাহাই বলিলাম। দেশে অনেক রাজা মহারাজা আছেন, তাঁহাদের নিকট হইতে এ ব্যাপারে এক কপর্দ্দকও পাই নাই। অলমিতি বিস্তরেণ। অত্র মঙ্গল, সময় সময় আশ্রমের কুশল বার্ত্তা লিখিয়া সুখী করিবেন।

বিনীত নিবেদক—

শ্রীআনন্দমোহন রায়।

এই দুর্ভিক্ষ কার্য্যে আনন্দ বাবু, কৈলাশ বাবু প্রভৃতি হাইলাকান্দির সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ যেরূপ অক্লান্ত পরিশ্রমে কার্য্য করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, শ্রীভগবানের করুণাবারি ইহাঁদিগের হৃদয়-উৎস হইতেই নিঃসারিত হইয়া দুর্ভিক্ষ-দাবানল নির্ব্বাপিত করিয়াছে।

ঢাকা বিধবাশ্রমের কর্তৃপক্ষও প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। জীব বড় দুঃখী, এই জীবকে যাঁহারা ভালবাসিতে শিখিয়াছেন,—এই প্রত্যক্ষ দেবতার পূজা করিতে যাঁহারা অভ্যস্ত হইয়াছেন; তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রীভগবানের আর অধিক প্রিয় কে? আমাদিগের প্রিয় সেবকবৃন্দ! সাবধান হও, অহঙ্কৃত হইও না। একবার ভাবিয়া দেখ, ঐ সকল গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ সকলপ্রকার ভার বহনকরিয়াও জীবসেবায় কিরূপ মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন; তোমরা সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া জীবসেবায় আর কি বাহাদুরী দেখাইবে? সমাজের এই সকল লোকের নিকট আমরা ক্ষুদ্র কাঠবিড়াল মাত্র; তবে ভরসা এই যে, নল, নীল, হনুমানাদির ন্যায় কোন কার্য্য সম্পাদনের সম্ভাবনা না থাকিলেও, তাঁহাদের সঙ্গে রামকার্য্যে সহায়তা করিতে কাঠবিড়ালও কুন্ঠিত হয় নাই। আশা করি তোমরা মাটি হইয়া মাটির দেহ খাটাইয়া আপন আপন জীবন-ব্রত উদ্‌যাপন কর। সম্প্রতি দুর্ভিক্ষের জন্য অর্থসংগ্রহ আর করিতে হইবে না। পূজার পর হইতেই প্রায় এদেশে ভয়ানক উলাওঠা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়; সুতরাং যে প্রদেশে যে অবস্থান করিতেছ, আপন আপন নিকটবর্ত্তী সেবকগণের সহিত মিলিত হইয়া প্রস্তুত হও; কার্য্যক্ষেত্র পাইলেই শ্রীভগবানের চরণারবিন্দ হৃদয়ে ধরিয়া কার্য্যে নিযুক্ত হইবে। এক্ষণে শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-সেবার জন্য অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হও। জয় জগদীশ!—তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

ভক্ত-কৃপা-ভিক্ষু—

দীন শ্রীস্বরূপানন্দ।

কার্য্যাধ্যক্ষ, শান্তি-আশ্রম।

—:0:—

নিবেদন।

৺শারদীয়া পূজোপলক্ষে প্রেস বন্ধ থাকিবে এবং আমাদের গ্রাহকগণের মধ্যে হয়তঃ অনেকে স্থানান্তরে যাইতে পারেন, সুতরাং পূর্ব্বকার বন্দোবস্ত মতে "আর্য্য-দর্পণ" প্রকাশিত হইলে, পত্রিকা পাইতে নিশ্চয়ই গোলযোগ হইবে; বিশেষতঃ যাহাতে **মা আনন্দময়ীর** শুভাগমনোপলক্ষে—পূজাবকাশে—বন্ধুবান্ধব সহ আমাদের প্রিয় গ্রাহকগণ "আর্য্য-দর্পণ" পাঠ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে পারেন, তাই আশ্বিন, কার্ত্তিক দুই সংখ্যা একত্রে বাহির করা হইল। ইহাতে পাঠকগণের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও বিশেষ সুবিধা এই হইল যে, আমরা অগ্রহায়ণ মাসের সংখ্যা পূজার ছুটীর পর যথাসময়ে গ্রাহকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতে পারিব। নতুবা অগ্রহায়ণ সংখ্যা যথাসময়ে বাহির করিতে পারিতাম না। **জয় মা আনন্দময়ী!!**

—:0:—

বিজ্ঞাপন।

বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। প্রতি মাসে ২।৩ ফর্ম্মার বাহির হয়। ছাপা কাগজ সুন্দর। প্রত্যেক সাহিত্যামোদী ইহার গ্রাহক হইয়া অর্থব্যয় সার্থক করুন, মূল্য অতি সামান্য ১৲ টাকা মাতৃভাষার সেবাকল্পে বৎসরে অর্পণ করা কাহারও সাধ্যাতীত নহে। মূল্য হিসাবে হিন্দুসখা গ্রহণে অনেক লাভ। তাহার উপর আবার মাত্র ডাক মাশুল।০ আনার এক গাদা পুস্তক উপহার। সকলে সত্বর হউন।

ম্যানেজার হিন্দুসখা।

কৈকালা; কৈকালা পোঃ (হুগলী জেলা) বঙ্গদেশ।—অন্যান্য বিক্রেয় পুস্তক—হিন্দু-সখা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

(১) তারকেশ্বর তথ্য—॥৵ আনা, বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৺তারকেশ্বর ধামের নানা রহস্য-ময় ইতিহাস ও তীর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য।

(২) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা—।৵ আনা। বাঙ্গালা পদ্যে প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ অভিনব পুস্তক।

(৩) প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলী—৷৹ আনা। নানা ভাবের নানা তথ্যের নানা জ্ঞেয়বিষয়ের আলোচনা পূর্ণ প্রবন্ধের একত্র সমবায়।

(৪) গীতগোবিন্দ—৷৹ (পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ) ভক্তকবি রসময় দাসের পদ্যানুবাদ সহ জয়দেবের পদাবলী।

(৫) গীতিকুঞ্জ—৵ আনা। দেব দেবী ও আত্মতত্ত্ব বিষয়ক গীতাবলী।

(৬) সামবেদসংহিতা—প্রতি খণ্ড ||০ আনা। মন্ত্রগাণ ভাবানুবাদাদি সম্বলিত। নানারসে মুদ্রিত। সুন্দর সংস্করণ।

—:0:—

হোমিওপ্যাথি-প্রচার-কার্য্যালয়।

২২৬ নং নবাবপুর, ঢাকা।

পত্র লিখিলে ৺ হরিপ্রসাদ চক্রবর্ত্তিকৃত যাবতীয় হোমিওপ্যাথিক পুস্তকের ক্যাটালগ পাঠান যায়। ডাঃ নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায় কৃত ১। হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা দর্পণ মূল্য ১৷৹ টাকা। ২। বাইওকেমিক ভৈষজ্যতত্ত্ব ও চিকিৎসা প্রদর্শিকা, মূল্য ৷৹ আনা। ৩। উপদেশ সংগ্রহ, মূল্য ৵৹ আনা। আমেরিকান বিশুদ্ধ ও টাটকা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ⁄৫, ⁄১০ ড্রাম, বাইওকেমিক ঔষধ ।০ ড্রাম।

জয়পুরের শ্রীশ্রীগোবিন্দ জীর হাফটোন ফটো—ছোট ⁄০, বড় ⁄১০ পয়সা।

ডাঃ এন্ রায়ের

১। পিযুষ-বিন্দু।

প্রমেহ, শুক্রমেহ ও স্মৃতিক্ষীণতার মহৌষধ। ছাত্রসম্প্রদায়ের পক্ষে বিশেষ উপকারী। দুই মাসের উপযোগী ১ শিশির মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

২। পেইন কিলার।

সর্ব্বপ্রকার উদর বেদনায় বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের যাবতীয় উদর বেদনায় সত্তফলপ্রদ মহৌষধ। ব্যবহার মাত্রই ফল পাওয়া যায়। প্রতি শিশির মূল্য ৷৹ আনা মাত্র।

ডাক্তার শ্রীনৃপেন্দ্র চন্দ্র রায়—

নাবাবপুর, ঢাকা।

৫ম বর্ষ। অগ্রহায়ণ। ৮ম সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

———:0:———

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। } { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৮ম সংখ্যা। | অগ্রহায়ণ। | বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

মুক্তিরস্বরূপ ও তল্লাভের উপায়।

(৭ম সংখ্যার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তি কি ?—ইহা ত অভাব-প্রাকৃতিক (negative) মাত্র। ভাব-স্বরূপ সুখ হইতে ইহার স্বতঃ প্রাধান্য স্বীকার করা যাইতে পারে না। সাঙ্খ্যবাদী ও নৈয়ায়িক প্রভৃতিরা যে দুঃখ-নিবৃত্তির চরমলক্ষ্যত্ব প্রতিপাদন করেন, তাহা বস্তুগত্যা সুখ-নিবৃত্তিও বটে। কাজেই দেখা যায়, একদল সুখের অনুরোধে দুঃখানুভব স্বীকার করিয়া সুখলাভকেই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্যরূপে নির্দ্দেশ করেন, অন্যপক্ষ দুঃখবাহুল্য দর্শনে সুখত্যাগ করিতেও সম্মত হইয়া অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির পরম পুরুষার্থ প্রতিপাদনে যত্নপর হন। এখন কথা এই যে, এই দুই বিরুদ্ধ পক্ষের সমন্বয় সম্ভবে কি না, আনন্দ ও অত্যন্ত দুঃখ-নিবৃত্তির যুগপদাবস্থান সংঘটিত হইতে পারে কি না ?

বেদান্তদর্শন এই বিরোধের সমন্বয় প্রদর্শন করিয়াছেন; বৈদান্তিক পরম পুরুষার্থ শুদ্ধ দুঃখ-নিবৃত্তিও নহে, ক্ষণ-ভঙ্গুর সুখস্বরূপও নহে। বস্তুতঃ দুঃখমূলচ্ছেদ ও নিত্যানন্দ সম্পাদনই বেদান্তদর্শনের চরম লক্ষ্য। তাই মাধবাচার্য্য বলিয়াছেন;—

বেদান্ত দর্শনের সমঞ্জসা ও সমন্বয়ী মত।

বিষয়োত্থ সুখন্তু দুঃখযুক্তেহপ্যলয়ং ব্রহ্মসুখং ন দুঃখযুক্তম্।
পুরুষার্থতয়া তদেব গম্যং ন পুনস্তুচ্ছক দুঃখনাশমাত্রম্॥
শঙ্করবিজয়।

বিষয়-জাত-সুখসমূহ দুঃখযুক্ত হইলেও লয়রহিত ব্রহ্মানন্দ দুঃখযুক্ত নহে। সেই ব্রহ্মসুখই পরম পুরুষার্থরূপে অধিগম্য, তুচ্ছ দুঃখনাশ পরম পুরুষার্থ নহে। এই পরমানন্দ আত্মাতিরিক্ত অন্য সাধন সাপেক্ষ

নহে; কাজেই ইহা বিষয় সুখের ন্যায় দুঃখসংযুক্ত ও ক্ষণভঙ্গুর হইতে পারে না। আত্মা ও অনাত্মীয় পদার্থে 'অহং' 'মম' এই অভিমান দুঃখের নিদান; জ্ঞানালোকে এই মিথ্যা অভিমান দূরীকৃত হইলে দুঃখবীজ সর্ব্বথা দগ্ধীভূত হয় এবং আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থান করেন। কিন্তু আত্মার স্বরূপ কি? বেদান্তে আত্মা ও ব্রহ্মের ঐক্য প্রদর্শনপূর্ব্বক আত্মার আনন্দ-স্বরূপত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে; কাজেই আত্মলাভ ও আনন্দলাভ একই কথা। এই অপূর্ব্ব আনন্দের বিনাশ অথবা হ্রাস সম্ভবে না; কারণ জ্ঞান দ্বারা একবার স্ব-স্বরূপ অধিগত হইলে আর তাহার বিচ্যুতি ঘটিতে পারে না, এবং ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞান-ফলে সমস্ত পদার্থ আত্মার সহিত ঐক্যভাব করিলে সুখ-বিরোধী অনাত্মীয় পদার্থসমূহ আত্মস্বরূপ লয় প্রাপ্ত হয়। আনন্দানুভব পূর্ণব্রহ্মজ্ঞানের নিত্য সহচর; পূর্ণত্ব ও পূর্ণকামত্ব ব্রহ্মাত্ম-জ্ঞানের অবশ্যম্ভাবী পরিপাক! কাজেই একদিকে সুখ হেতুর নিত্যসদ্ভাব, অন্যদিকে সুখ বিরোধীর অত্যন্তাভাব বিচার্য্য সুখের নিত্যত্ব সম্পাদন করে। একদিকে আত্মানাত্মবিবেক দুঃখ-বীজ উন্মূলিত করে, অন্যদিকে অদ্বৈত-জ্ঞান অদ্বৈতানন্দ উৎপাদিত করে। যে বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ও অদ্বিতীয় তাহাই সুখ; ত্রিবিধ ভেদবিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন বস্তু সুখ-স্বরূপ নহে। আত্মাই একমাত্র অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, কাজেই আত্মজ্ঞ ব্যক্তিই প্রকৃত সুখী। অতএব সুখসম্পাদক সমস্ত বস্তু আত্মতৃপ্তি সম্পাদনার্থই প্রিয়রূপে পরিগণিত হয়।

সকলেই আত্মাস্তিত্ব-সন্তান ইচ্ছা করে; আত্মবিনাশ কাহারই প্রার্থনীয় নহে। সুতরাং আত্মপ্রেম প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আবার সমস্ত বস্তু তাঁহারই প্রিয়সাধন করে, তাঁহার প্রীতি-সম্পাদনের উপযোগী বলিয়াই অন্য বস্তুতে প্রিয়ত্ব উপচরিত হয়, সুতরাং আত্মাই পরমানন্দ স্বরূপ। আত্মসাক্ষাৎকার হইলে কাজেই শোকমোহ দূরে পলায়ন করে। তাই শিবস্বরূপ শঙ্করাচার্য্য সূত্রিত করিয়াছেন, "আত্মলাভাং পর লাভালাভাং" অর্থাৎ-আত্মলাভ হইতে শ্রেষ্ঠলাভ নাই। আত্মলাভ, ব্রহ্মলাভ ও আনন্দলাভ একই কথা।—তাই মুনীশ্বর শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ বলিয়াছেন;—

ব্রহ্মজ্ঞঃ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্মবিৎ।
রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধা নন্দী ভবতি নান্যথা॥

পঞ্চদশী।

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি পরমানন্দ স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন, এবং আত্মবিৎ শোক হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। ব্রহ্ম রস স্বরূপ, সেই রসস্বরূপকে প্রাপ্ত হইলে সর্ব্বমত সমন্বয়ী জীব আনন্দই হইয়া যায়; ইহার নির্ব্বাণ মুক্তি। অন্যথা নাই। সুতরাং বেদান্ত-মতে আত্মসাক্ষাৎকার-লাভ বা স্ব-স্বরূপে অবস্থানই মনুষ্যের পরম পুরুষার্থ। ইহাই সর্ব্বমত সমন্বয়ী নির্ব্বাণ মুক্তি।

সর্ব্ব ধর্ম্ম সমন্বয়ী ও সর্ব্বভেদমত সমঞ্জসা বেদান্তশাস্ত্রের উদার গর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণ স্থান লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন। বেদান্তের পরম পুরুষার্থ বিচার প্রসঙ্গে যে নির্ব্বাণ মুক্তির কথা বলা হইল, তাহাতে বিভিন্ন দার্শনিকের চরমলক্ষ্যত্ব তন্মধ্যেই সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। আবার শুধু নির্ব্বাণ মুক্তি নহে, বৈদান্তিক সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা

মুক্তিকেও চরমমুক্তির অবস্থান্তর বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পরমেশ্বর সমুদায় স্থান অধিকার করতঃ সকল-লোকে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এবং পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতি ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহ পরমেশ্বরে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সাধক যখন এই মহান্ সত্যটী বিশেষরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে এবং এই ভাবটী ক্রমে যখন তাঁহার জীবনগত হইয়া পড়ে; তখনই তিনি পরমেশ্বরের সহিত একলোকে বাস করেন, ইহাই সালোক্য মুক্তি। এই অবস্থায় সাধক মহাসমুদ্রস্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় অনন্ত ব্রহ্ম সমুদ্রের গর্ভে ভূলোক ও দ্যুলোক সমূহকে ভাসমান দেখিতে পান। যদিও বাহিরে পৃথিবীই তাঁহার বাসভূমি থাকে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ অবস্থায় তিনি আর পৃথিবীর লোক থাকেন না। অনন্তকালের জন্য ব্রহ্মে আপনার বাসস্থান নির্দ্দেশ করতঃ নির্ভয়, নিশ্চিন্ত ও আনন্দযুক্ত হন। অতএব দেখা যাইতেছে যে, পরমেশ্বরের সর্ব্বব্যাপিত্ব ভাবটী ক্রমে যখন সাধকের সমগ্র হৃদয়কে অধিকার করে, তখনই তাঁহার সালোক্য-মুক্তি সিদ্ধ হয়। সাধকের এইরূপ সালোক্য-মুক্তির অবস্থা ক্রমে যখন অপেক্ষাকৃত গভীরতা প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মসত্ত্ব অনুভবের ভাব যখন সাধকের অন্তশ্চক্ষুর নিকট উজ্জ্বলতর মূর্ত্তি ধারণ করে; প্রেমময়ের প্রেমানন্দ যখন তিনি সকল স্থানেই নিঃসংশয় রূপে দেখিতে পান; যেদিকে দৃষ্টিপাত করেন, সেই দিকেই যখন তাঁহার চক্ষু "বিশ্বতশ্চক্ষুর" উজ্জ্বল চক্ষুর উপরে পতিত হইয়া থাকে; সেই অবস্থার নামই সামীপ্য মুক্তি। যখন সাধকের এইরূপ সামীপ্য মুক্তির অবস্থা ক্রমে আরও গভীর ভাব ধারণ করে; এবং যখন তিনি পরমাত্মায় সংলগ্ন হইয়া অবস্থিতি করতঃ আনন্দ-সুধা-পানে নিযুক্ত হয়েন, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে সার্ষ্টিমুক্তি কহে। আর যখন ব্রহ্মকে আপনার সহিত অভেদ রূপে অনুভব করেন, তখন সেই অবস্থার নাম সারূপ্য মুক্তি। তদনন্তর ক্রমে যখন সাধক ব্রহ্মসত্তা-সাগরে মগ্ন হইয়া আপনার নিজ সত্ত্বা পর্য্যন্ত হারাইয়া বসেন, অর্থাৎ যখন তাঁহার বুদ্ধি মন ব্রহ্মে লয় বিলয় প্রাপ্ত হয়, তখনই তাঁহার সেই অবস্থাকে নির্ব্বাণ বা চূড়ান্ত মুক্তি বলে। বৈদান্তিক বলিয়াছেন;—

সালোক্যাদি সর্ব্ব প্রকার মুক্তি সামঞ্জস্য ভাব।

ব্রহ্মৈব মুক্তি র্ন ব্রহ্ম কচিৎ সাতিশয়ং শ্রুতম্।
অতএকবিধা মুক্তি র্বেধসো মনুজস্য বা॥

বেদান্ত সার, ৩।৪।১৭।

বিশেষ রহিত যে ব্রহ্মাবস্থা বেদে তাহাকেই মুক্তি বলেন, সুতরাং মুক্তি পদার্থ এক প্রকার ব্যতীত নানা প্রকার হইতে পারে না; তবে সালোক্যাদি রূপ যে বিশেষ কথন আছে, তাহা কেবল সাধকের অনুরাগ বা জ্ঞানের গভীরতার তারতম্য মাত্র। নতুবা মুক্তি পদার্থ যাহাকে বলে, তাহা ব্রহ্ম হইতে মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলেরই একরূপ। জ্ঞানের পরিপুষ্টি অবস্থায় যখন সাধক ব্রহ্মস্বরূপে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি করেন, তখনই তাঁহার চূড়ান্ত। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ হয়।

এক্ষণে নির্ব্বাণ কি, তাহা আলোচনা করা যাউক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিকের ব্রহ্ম-

নির্ব্বাণ শুনিয়া অনেক অনধিকারী ব্যক্তি তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া,—কেহ বা কিরূপ অর্থে 'নির্ব্বাণ' শব্দ ব্যবহৃত হয় না বুঝিয়া অদ্বৈতমতে দোষারোপ করতঃ অনেক ঠাট্টা বিদ্রূপ করিয়া থাকে। অনভিজ্ঞের বিজ্ঞতা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ;—বিশেষতঃ বিজ্ঞব্যক্তি চিরকালই অজ্ঞের কথায় অবজ্ঞা করিয়া থাকেন। তাহাদিগের নিকট নির্ব্বাণ অনাস্বাদিত মধুবৎ, অর্থাৎ যে কখনও মধু খায় নাই, তাহার নিকট যেমন মধুর আস্বাদ—কুমারীর নিকট স্বামী-সহবাস-সুখ একটা 'কি জানি কি' রকমের; কাজেই তাহারা ব্রহ্মনির্ব্বাণ ধারণা করিতে না পারিয়া মুন্সিয়ানা চা'লে বলিয়া থাকে যে, "আমরা চিনি হব না, চিনি খাইতে চাই।" চিনি খাইতে মিষ্ট বটে, কিন্তু চিনি হইলে, তাহা সেবন করিয়া সমগ্র জীবের যে আস্বাদানন্দ তোমার ভিতরে অভিব্যক্তি হইবে। নিজের চিনির আস্বাদ কতটুকু? আর সমগ্র জীবের আস্বাদ নিজের ভিতরে উপলব্ধি করার সুখ তাহার কণাংশও নহে। চিনির আস্বাদ-লোলুপ স্বার্থপর ব্যক্তি কি আর ভক্তপ্রবর শ্রীমৎ কবিরাজগোস্বামীপাদের—

"গোপিকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে গোপিগণ কোটি আস্বাদয়॥"

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

এই গোপীভাবের নিগূঢ় স্বভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে? রাধা-কৃষ্ণের মিলনাত্মক আত্মার স্বরূপানন্দ উপভোগ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণ উপভোগ কখনই গোপীভাবের আদর্শ নহে। নির্ব্বাণ অর্থে নিবিয়া যাওয়া নহে, বিলীন ভাবকেই নির্ব্বাণ বলে। আচার্য্যপ্রবর শ্রীমৎ রামানুজস্বামীও নির্ব্বাণ শব্দের প্রকৃত অর্থ গ্রহণ না করিয়া বলিয়াছেন;—

"অহমর্থ বিনাশে চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবস্থতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষ কথা প্রস্তাব গন্ধতঃ॥"

'অহং' এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ (নির্ব্বাণ) স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ কথার প্রস্তাবের গন্ধ মাত্রে আমি পশ্চাৎপ্রস্থান করি। কিন্তু আমরা নির্ব্বাণ অর্থে 'অহং' বিনাশ না বুঝিয়া, বরং তদ্বিপরীত 'অহং' প্রতিষ্ঠাই বুঝিয়া থাকি; সমগ্র বেদান্তশাস্ত্রের ইহাই অভিপ্রায়। ফলকথা, যে আত্মার ক্ষয় নাই, বিনাশ নাই,—যে আত্মা অজর, অমর, তাহা, নিবিয়া যাইবে কিরূপে?

সমস্ত শ্রুতি, দর্শন, পুরাণ, উপনিষৎ, তন্ত্র প্রভৃতি শাস্ত্রে মুক্তি সম্বন্ধে যত কিছু বলা হইয়াছে; তাহাদ্বারা প্রকাশ হইতেছে যে,

মুক্তি সম্বন্ধে ভাবের ঐক্য।

জীবাত্মার স্বরূপ-অবস্থিতিই মুক্তি এবং স্বরূপত্যাগই বন্ধন। হৃদয়গ্রন্থিসমূহের অর্থাৎ—জড় ও চৈতন্যের বন্ধন গ্রন্থিসমূহের উচ্ছেদই মুক্তি এবং ঐ গ্রন্থির নাম বন্ধন। বস্তুর যথার্থ দর্শন বা ভ্রমবুদ্ধির অপনয়নই মুক্তি এবং অযথার্থ দর্শনই বন্ধন। চঞ্চলতাশূন্য মনের যে স্থির ভাবে অবস্থিতি তাহাই মুক্তি এবং বহু বিষয়ে মনের যে গমনাগমন তাহাই বন্ধন। মনের যে শান্তিরূপ নির্ম্মল আনন্দ তাহাই মুক্তি এবং মনের যে প্রকাশ তাহাই বন্ধন। পৃথিবীর কোন বস্তুর প্রতি আস্থা না থাকার নামই মুক্তি এবং [illegible] পদার্থের প্রতি বিন্দুমাত্র আস্থা থাকাও সুদৃঢ় বন্ধন। অনিত্য সংসারের সমস্ত সংকল্প ক্ষয় হওয়ার নাম মুক্তি এবং সংকল্প মাত্রেই বন্ধন;—এমন কি যোগাদি

সাধনের সংকল্পও বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে নিজের ইচ্ছা বা বাসনার ত্যাগই মুক্তি এবং বাসনা মাত্রেই বন্ধন। সকলপ্রকার আশাক্ষয় হইলে মনের যে ক্ষয় হয় তাহাই মুক্তি এবং আশা মাত্রেই বন্ধন। সম্পূর্ণরূপে ভোগচিন্তার যে বিরাম তাহাই মুক্তি এবং ভোগচিন্তাইবন্ধন। সকল প্রকার আসক্তি ত্যাগই মুক্তি এবং বিষয়-সঙ্গই বন্ধন। দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যবস্তুর যখন সম্বন্ধ না থাকে তখনই মুক্তি এবং দ্রষ্টার সহিত দৃশ্যবস্তুর যে সম্বন্ধ তাহাই বন্ধন। বিশেষ বিবেচনা করিলে ইহা স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এই সমস্ত বাক্যদ্বারা মুক্তির একই ভাব প্রকাশ পাইতেছে। আত্মর স্বরূপ ভাব হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াই বন্ধন এবং স্ব-স্বরূপে অবস্থানই মুক্তি। তবে স্বরূপ সম্বন্ধে মতানৈক্য থাকিতে পারে, কিন্তু স্ব-স্বরূপে অবস্থানই যে মুক্তি, ইহা সর্ব্ববাদীসম্মত। যথা:—

মুক্তির্হিত্বান্যথা রূপং স্বস্বরূপে ব্যবস্থিতঃ।

অর্থাৎ—অন্যথারূপ ত্যাগ করিয়া স্বরূপে অবস্থিতির নাম মুক্তি। দুর্ব্বাসা, দত্তাত্রেয়, উদ্দালক, আরুণি, শ্বেতকেতু, শুকদেব প্রভৃতি বহুব্যক্তি রক্ত-মাংসের দেহধারী হইয়াও "মুক্ত-পুরুষ" বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়া থাকেন। সুতরাং নির্ব্বাণ অর্থে যে 'অহং' নাশ নহে, ইহা আশাকরি বুঝিতে পারিয়াছেন। নির্ব্বাণ অর্থে যদি স্বরূপ প্রতিষ্ঠা হয়, তবে নিবিয়া যাইবে কে?—পার্থিব সুখদুঃখ, পার্থিব অভিলাষ প্রভৃতি সকল প্রকার পার্থিব ভাবের বিলীন অবস্থাকেই নির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। অদ্বৈতবাদিগণ বলেন, "নির্ব্বাণন্তু মনোলয়ঃ" অর্থাৎ—মনের লয়কেই নির্ব্বাণ বলিয়া থাকেন।

নির্ব্বাণ মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ।

ভগবান্ বুদ্ধদেব জরা, মরণ ও পীড়াজনিত দুঃখের হস্ত হইতে নিস্তার পাওয়াকেই নির্ব্বাণ বলিয়াছেন। সুতরাং নির্ব্বাণ শব্দে সত্তাবি-লোপ বা একেবারে মহাবিনাশ নহে; কেবল মাত্র ভ্রম, ঘৃণা ও তৃষ্ণা এই তিনটীর আত্যন্তিক উচ্ছেদই নির্ব্বাণ শব্দে কথিত হয়। প্রফেসার্ মোক্ষমুলার নির্ব্বাণ শব্দের অর্থ করিয়াছেন;—

"If we look in the dhamma-pada at every passage where. Nirvan is mentioned there is not one which would require that its meaning should be amihilation, while most of not all, would become perfectly unintelligible if we assigned to the word Nirvan, that Signification."
Buddha Ghosha's parables, P. XII

জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্টদেব বলিয়াছেন;—

এষ এব মনোনাশস্ত্ববিদ্যানাশ এব চ।
যদ্ যৎ সম্বিদ্যতে কিঞ্চিৎ তত্রাস্থা পরিবর্জ্জনম্।
অনাস্থৈব হি নির্ব্বাণং দুঃখমাস্থা পরিগ্রহঃ॥
যোগবাশিষ্ট।

যে যে বস্তু সৎরূপে বিদ্যমান আছে, তাহাতে যে আস্থা পরিত্যাগ তাহাই মনো-নাশ ও অবিদ্যা নাশ। এই অনাস্থারূপ যে মনোনাশ তাহাই নির্ব্বাণ। অতএব অবিদ্যা জনিত মন নিবিয়া যাওয়াকে নির্ব্বাণ শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অপিচ—

মনোলয়াত্মিকা মুক্তিরিতি জানীহি শঙ্করি॥
কামাখ্যাতন্ত্র, ৮পঃ।

যে অবস্থায় মনের লয় হয়, তাহাকেই মুক্তি বলিয়া জানিও। শিবাবতার ভগবান্

শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষ।

মণিরত্নমালা।

কাহার বিনাশে জীবের মুক্তি হয়? মনের নাশ হইলে। সুতরাং মুক্তির চরম অবস্থাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলা যাইতে পারে। সাধক যখন শান্ত্যাদি গুণযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরকে আত্ম-স্বরূপে অবলোকন করেন, সেই ব্যক্তি তখন পরম রসানন্দ স্বরূপ জ্যোতির্ম্ময় অদ্বৈত পর-ব্রহ্মে আত্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন; ইহাকেই ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। যথা:—

পুরুষার্থ শূন্যানাং গুণানাং প্রতিপ্রসবঃ।
নির্ব্বাণং স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা চিতি শক্তে রিতি॥

গুণ অর্থাৎ—প্রকৃতি দেবী যখন পুরুষ-ত্যাগিনী হ'ন, অর্থাৎ—যখন তিনি আর পুরুষের বা আত্মার সন্নিধানে মহৎ ও অহঙ্কা-রাদি রূপে পরিণতা হন না, পুরুষকে বা চিৎ স্বরূপ আত্মাকে রূপ-রসাদি কোন প্রকার আত্ম-বিকৃতি দেখাইতে পারেন না,—পুরুষ যখন নিগুর্ণ হন, অর্থাৎ—যখন প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক বিকার আত্ম-চৈতন্যে প্রদীপ্ত হয় না, আত্মাতে যখন কোন প্রকার প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক দ্রব্য প্রতিবিম্বিত না হয়,—আত্মা যখন চৈতন্য মাত্রে প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বিকার দর্শন হয় না, ঐরূপ নির্ব্বিকার বা কেবল হওয়াকেই কৈবল্য বা নির্ব্বাণ-মুক্তি বলে। ইহই সর্ব্বপ্রকার মতাবলম্বিগণের পরম পুরুষার্থ বিচারের বিশ্রামভূমি। অতএব নির্ব্বাণ মুক্তিই জ্ঞানী মাত্রেরই চরমলক্ষ্য হওয়া কর্ত্তব্য। ক্রমশঃ।

—:0:—

প্রার্থনা।

কেন দেব! তব স্মৃতি জাগিল অন্তরে
মোর এ নব প্রভাতে? কভু হেরি নাই
এ পোড়া নয়নে প্রভো! তোমার স্বরূপ,
সুশীতল পাদপদ্ম এ দগ্ধ হৃদয়ে
ধরি নাই কভু হে স্বামিন্! তবু চিত্ত
মাঝে কেন উঠে সদা তোমার ঝঙ্কার?
কেন মন, জাতি, কুল, মান আদি সব
পরিহরি, কলঙ্কিনী কুলবধূ প্রায়,
ঘুরে অহর্নিশ শুধু তোমারি সন্ধানে?
কেন লোমকূপগুলি অব্যক্ত বিরহে
তোমার প্রতীক্ষা দেব করে অনুক্ষণ?
কেন একমাত্র তব নাম উচ্চারণে
দেহ অভ্যন্তরে হয় বিদ্যুৎ প্রবাহ?
জানিনা কে তুমি কোথা বসি হে প্রেমিক!
অলক্ষ্যে করিছ মোরে হেন আকর্ষণ,
কিন্তু লইছনা টানি নির্ম্মম হৃদয়ে
তব চরণ-সরোজে! উপযুক্ত নাহি
হই যদি আমি উপজিতে তোমার সে
ধামে, তুমি কেন পদার্পণ নাহি কর
অধমের এ ভগ্ন কুটীরে? এ ভবের
মহাব্যাধি-আক্রমণে চিররুগ্ন আমি
পঙ্গু প্রায় পড়ি হেথা করি আর্ত্তনাদ!
গিরি লঙ্ঘিবার শক্তি (শুনি লোক মুখে)
ইচ্ছা ক্রমে দিতে ক্ষম পদহীন জনে।—
দেহ ইচ্ছাময় তবে এ অধম দীন
দুর্ব্বলেরে পরম মঙ্গলময় সেই
আশীর্ব্বাদ, যাহার প্রভাবে আমি মহা-
বায়ুসম এ ভবের বাধা বিঘ্ন লঙ্ঘি

ক্ষণ মাঝে, চলি তব আনন্দের নিত্য
নিকেতনে,—সরবস্ব করি বিসর্জ্জন
তব প্রেমসিন্ধু মাঝে মহামৃত যোগে।
এত ভাগ্য আমার কি হবে? কে না জানে
দুরভাগা আমি এ জগতে! উপায় কি
তবে প্রভো, কহ কহ এ দীন গোপীরে?
চঞ্চল প্রাণ, চকিত চিত, অথির এ
হিয়া ধরি, কেমনে করিব কহ আর
এ সংসার? প্রাণেশ্বর! মরমের মাঝে
জ্বালিয়াছ যে বিরহ, তা যে দুনির্ব্বার,
দুঃসহ বিষম!—নাহি মোর হেন ভাষা
সহায়ে যাহার করি স্বরূপ প্রকাশ।
আর তব পাশে প্রকাশি কি ফল? জান
সব তুমি অন্তর্য্যামী যখন যা ঘটে
মোর এ পোড়া অন্তরে! কহ সত্য করি
হে সত্যস্বরূপ! এখনো কি হয় নাই
আমার সে দশা—যখন আসিতে বাধ্য
তুমি হে বিধাতঃ মোর প্রতি রোধে বোধে।
সে দশা না হয় যদি দেব, যাতে হয়
কর,—কেন করিবে না ক? তব প্রেমে
এ গোপীর আছে যে হে চির অধিকার।
নব বিধান কি এবে হায় করি প্রবর্ত্তন,
স্বাধিকার হোতে আর্ত্তে করিবে বঞ্চিত?
সনাতননীতি করি পরিবরতন
ধরিবে না আর কিহে ব্রজের সে রূপ
এই গোপী সমুখে? এখন কি নাথ
শুধু বাজাইবে বাঁশী নেত্র-অগোচর
কোন গুপ্তস্থল হোতে, মাথা ভাঙ্গিলেও
কিন্তু নাহি দিবে দরশন! এযে বড়
মুস্কিলের কথা হে প্রাণেশ! মহাকাল-
লহরীর ঘুর্ণীপাকে পড়ি, ঘু'রে ঘু'রে
মরি অহর্নিশ! নাহি ছিল কোন কথা
ডুবে যদি পড়িতাম ভবার্ণব তলে।
কিন্তু দেব অদৃষ্টের বিড়ম্বনা বশে
ডুবিয়া না ডুবি, পুন নাহি পারি হায়!
অগ্রসর হোতে কভু দিব্য ধাম তটে।
গুরো! জীবন তরীর কর্ণধার! এস
মোর এ সঙ্কট কালে! আর ডাকিবার
যদি থাকে কোন ত্রুটী, তাহাও প্রকাশ
কর ত্বরা কৃপাবশে।—দাও শিক্ষা দীক্ষা
মোরে হে শিক্ষকোত্তম! ডাকিবার মত
ডাকি মনে প্রাণে সদা, একবার দিব্য
রূপখানি তব করি দরশন। এই
বাঞ্ছা, এ বাসনা, এই অভিলাষ দেব
শুধু এ জীবনে। ভক্ত বাঞ্ছা কল্পতরু!
মিটাও মিটাও তবে এ 'গোপীর' আশ,
রহিব তোমার চির চরণের দাস—

শ্রীগোপীবল্লভ বিশ্বাস।
হেড মাষ্টার; নদিয়া-রিফাইতপুর স্কুল।

———:0:———

ভক্তিরসাধন।

যখন কর্ম্ম যোগের দ্বারা গুণক্ষয় হইয়া চিত্তশুদ্ধি হইবে,—জ্ঞান-যোগের দ্বারা জানিতে পারিবে ভগবান্ সবের সকল—সকলের সব, তখন আর ভক্তি হৃদয়কে অধিকার না করিয়া থাকিবে কি প্রকারে? কিন্তু নীরস জ্ঞান অথবা নীরস কর্ম্ম করিয়া কাহারও কাহারও হৃদয় এত কঠিন হইয়া উঠে যে, ভক্তির কোমলতা তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। যাঁহারা কর্ম্মকে

চিত্তশুদ্ধির উপায় করিয়া জ্ঞান যোগে আরোহণ করেন, এবং আর একপদ অগ্রসর হইয়া ভক্তি যোগে আরূঢ় হইতে পারেন, তাঁহারাই ভক্তি লাভ করিয়া ধন্য হন। বিশুদ্ধভক্তি ভক্ত কিম্বা ভগবানের কৃপা ব্যতীত অন্য উপায় দ্বারা লাভ হয় না। পুত্র না জন্মিলে যেমন মানবের পুত্রস্নেহ উদ্রেক হয় না, তদ্রূপ ভগবান্ কিম্বা ভক্তসঙ্গ ব্যতীত ভক্তি-সঞ্চার হইতে পারে না। সূত্রকার লিখিয়াছেন;—

মহৎ কৃপয়ৈব ভগবৎ কৃপালেশাদ্বা। ভক্তিসূত্র।

মহৎ কৃপাদ্বারা কিম্বা ভগবানের কৃপালেশ হইতে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। ভক্তদিগের কৃপাও ভগবানের কৃপালেশের অন্তর্গত। পাষণ্ড জগাই মাধাই মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের কৃপায় মূহুর্ত্তে ভক্ত হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু কখন—কিরূপে ভগবানের কৃপা হয়, তাহা মানববুদ্ধির অতীত। তাই শাস্ত্রকারগণ ভক্তিলাভের জন্য সাধনারও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন। সে সাধনা আর কিছুই নহে, ভক্তিবাধক প্রতিকূল বিষয় পরিত্যাগ করিয়া অনুকূল বিষয় গ্রহণ করিলেই ভক্তির সঞ্চার হইবে। কেন না ভক্তি জীবের স্বাভাবিক সম্পত্তি, কেবল মায়াময় গুণের দ্বারা আবরিত থাকায় ভক্তির অভাব অনুভূত হইয়া থাকে; সাধনার দ্বারা প্রতিকূল গুণগুলি অপসারিত করিতে পারিলেই ভক্তির বিকাশ হইবে। ভক্তিলাভেচ্ছুব্যক্তি প্রথমতঃ

চিত্তশুদ্ধি।

সম্পাদনের জন্য চেষ্টা করিবে। হিন্দুধর্ম্মের সার চিত্তশুদ্ধি। যাহারা হিন্দু ধর্ম্মের যথার্থ মর্ম্মগ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাদিগকে এই কথার প্রতি বিশেষ মনোযোগ করিতে হইবে। যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই, সে উচ্চধর্ম্মে উঠিতে পারে না। চিত্তশুদ্ধির সাধনাই হিন্দুধর্ম্মের প্রধান সাধনা ও মূলকথা। ইন্দ্রিয়দমন ও রিপুসংযম করিতে না পারিলে হিন্দুধর্ম্মের সাধন পথে অগ্রসর হইবার উপায় নাই। সুতরাং চিত্তশুদ্ধির সাধনাই প্রবৃত্তিপথের সংযম ও তপস্যা। যাহার চিত্ত শমিত ও ইন্দ্রিয় দমিত হয় নাই, তিনি সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ হইলেও ঘোর মূর্খ। যাহার রিপুরশাসন ও ইন্দ্রিয়দমন নাই, সে ভক্তিপথ বলিয়া কেন,—কোন পথেই গ্রহণীয় নহে। আর যে সংযমী—যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে, সে হিন্দুসমাজে ও হিন্দু-মতে সাধু বলিয়া গণ্য এবং সকল পথেই অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে। সংযমী হইয়া প্রবৃত্তিকে ভক্তিপথে ঈশ্বর-পরায়ণ করিয়া আনাই ধর্ম্মের প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ তমঃ ও রজঃ গুণ বিশিষ্ট আহার্য্য ও চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া সাত্বিক আহার গ্রহণ ও সাত্বিক চিন্তা অভ্যাস করিবে। অন্তঃকরণ সাত্বিকভাবে পূর্ণ হইলেই ভক্তির বিকাশ হইবে দয়ার সাগর ভগবান্ তাঁহার সাধের জীবগণকে সর্ব্বদা মঙ্গলের পথে—আনন্দের পথে করুণা-বাঁশরীর স্বরে আকর্ষণ করিতেছেন; কিন্তু লৌহ যেমন কর্দ্দমলিপ্ত হইলে চুম্বকের আকর্ষণে তাহাতে লাগিয়া যাইতে পারে না, তদ্রূপ জীব-হৃদয় পাপাদি মলে দূষিত বলিয়া তাঁহারদিকে আকৃষ্ট হইতে পারে না। সাধনাভ্যাসে যাহার চিত্তশুদ্ধি হইয়াছে—হৃদয়ের ময়লা ধুইয়া গিয়াছে, তাহার হৃদয় ভগবানে আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। আকৃষ্ট হইয়া তৎপ্রতি আসক্ত হইলেই ভক্তিলাভ হইল। চিত্ত-

শুদ্ধির সাধনায় পাপমল দূর হইলেই ভক্তি অমনি সাধকের হৃদয় আলো করিয়া প্রকাশিত হয়। কামই মানবের চিত্ত দূষিত করিবার বিশেষ কারণ; কাজেই ভক্তিলাভের প্রধান কণ্টক। কারণ কাম ভক্তির সম্পূর্ণ বিপরীত বৃত্তি। সুতরাং একটী থাকিতে অন্যটী বিকাশ হইতে পারে না। তুলসীদাস বলিয়াছেন;—

যাঁহা কাম তাঁহা রাম নহিঁ যাঁহা রাম তাঁহা নাহি কাম।
দোনো একত্র নাহি মিলে রবি রজনী একঠাম॥

রাত্রিতে সূর্য্যদর্শনের ন্যায় কামুকের ভক্তি অসম্ভব। অতএব কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া কাম দমন করিবে। একমাত্র ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে সম্যক্ প্রকারে চিত্তশুদ্ধি হইবে। চিত্তশুদ্ধি হইলে পাপদমন হইবে এবং ভক্তি-লাভের প্রধান কণ্টক কুসঙ্গ, কুচিন্তা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, হিংসা, নিন্দা, উচ্ছৃঙ্খলতা, সাংসারিক দুশ্চিন্তা, পাট-ওয়ারি বুদ্ধি, মিথ্যাভাষণ, পরস্বাপহরণ, বহু-আলাপের প্রবৃত্তি, কুতর্কেচ্ছা, ধর্ম্মাড়ম্বর প্রভৃতি চিত্ত হইতে দূরীভূত হইয়া যাইবে। তখন সাধক-হৃদয়ে স্নিগ্ধ ও শান্তি আলোক বিকীর্ণ করিয়া ভক্তি বিকশিত হইয়া উঠিবে।

স্ব স্ব বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম ও ব্রহ্মচর্য্য সাধন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইয়া ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত ভক্তি শাস্ত্রে ভক্তি লাভার্থ বহু প্রকার সাধনাঙ্গ উল্লিখিত আছে। অভ্যাসে যেমন জগতে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তেমনি ভক্তিও লাভ করা যায়। কাঙ্গালের ঠাকুর, প্রেমাবতার চৈতন্যদেব বর্ত্তমান যুগের প্রথম সন্ধ্যায় জগতে আবির্ভূত হইয়া প্রেমভক্তি লাভের সুগম পন্থা প্রচার করিয়াছেন। তিনি প্রভুপাদ শ্রীমৎ সনাতন গোস্বামীকে বলিয়াছিলেন;—

"সৎসঙ্গ কৃষ্ণসেবা ভাগবত নাম—
ব্রজেবাস, এই পঞ্চ সাধন প্রধান।
এই পঞ্চ মধ্যে যদি এক স্বল্প হয়;
সুবুদ্ধি জনের হয় কৃষ্ণ প্রেমোদয়।"

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজেবাস, এই পঞ্চবিধ উপায়ে প্রেমভক্তি লাভ হয়।

সৎসঙ্গ। সূর্য্য কিরণমালা দ্বারা যেরূপ বাহিরের অন্ধকার নাশ করেন, তদ্রূপ সাধুগণ তাঁহাদিগের সদ্ভক্তি রূপ কিরণজালের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে হৃদয়ের অন্ধকার নাশ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

সতাংপ্রসঙ্গান্মমবীর্য্য সম্বিদোভবন্তি—
হৃৎকর্ণ রসায়ণাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গ বর্ত্মনি—
শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি

শ্রীমদ্ভাগবত।

সাধুদিগের সংসর্গে আমার (ভগবানের) শক্তি সম্বন্ধীয় হৃদয় ও কর্ণের সুখজনক কথা হইয়া থাকে, সেই কথা সম্ভোগ করিলে শীঘ্রই মুক্তির পথে ক্রমে ক্রমে শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে পর্য্যন্ত নিষয়াভিমানহীন সাধুদিগের পদধূলি দ্বারা অভিষিক্ত না হইবে, সেই পর্য্যন্ত কাহারও মতি সংসারবাসনা নাশের উপায় যে ভগবানের চরণপদ্ম তাহা স্পর্শ করিতে পারিবে না। অতএব ভক্তি ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেতে জন্মিয়া থাকে। যথাঃ—

ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্ত সঙ্গেন পরিজায়তে।

নারদপুরাণ।

কাজেই ভক্তি সাধন করিতে হইলে সর্ব্বদা সৎসঙ্গ করা একান্ত কর্ত্তব্য। জীবন ধারণের কার্য্যকাল ব্যতীত যখনই অবকাশ পাইবে, তখনই সাধুসঙ্গ বাসে শ্রীভগবানের গুণগান করিবে; কেন না ভগবচ্চিন্তা হইতে বিশ্রাম পাইলেই মন স্বভাবতঃই রজঃ ও তমো-গুণের আবেশে বিমুগ্ধ হয়, অমনি বিষয়-চিন্তায় মন বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। সকল কার্য্য ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণ সহ মন ভগবচ্চরণে সংলগ্ন থাকে, তবে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয়। যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভক্তিভাবের উদয় না হয়, ততদিন সাধুসঙ্গে ভগবদ্গুণ-গান শ্রবণ করিলে ক্রমশঃ আসক্তি বাড়িবে ও ভক্তি দৃঢ়া হইবে। শাস্ত্রে আছে—

গীতায়াং শ্লোক পাঠেন গোবিন্দ স্মৃতি কীর্ত্তনাৎ।
সাধু দর্শন মাত্রেন তীর্থ কোটী ফলং লভেৎ॥
কাশীখণ্ড।

গীতার শ্লোক পাঠ করিতে হয়, গোবিন্দ নাম স্মরণ করিতে হয়, তবে পাপবিনষ্ট হয়, কিন্তু সাধুদিগের দর্শন মাত্রেই কোটি কোটি তীর্থের ফল লাভ হয় এবং সর্ব্ব পাপ দূর হয়। অতএব সৎসঙ্গই ভগবদ্ভক্তির জনক, পোষক, বিবর্দ্ধক ও রক্ষক। সৎসঙ্গের ন্যায় ভগবদ্ভক্তি লাভ করিবার প্রকৃষ্ট উপায় আর নাই। সাধুর দর্শন—স্পর্শনে তাহার সাত্ত্বিক পরমাণু সাধারণের তামস পরমাণুকে অভি-ভূত করিয়া ফেলে, সুতরাং অচিরে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। কুমরিকা পোকা যেমন অন্য পোকাকে আপনার মত করিয়া লয়, তেমনি সাধুগণও অন্য ব্যক্তিকে অচিরে সাধুর বরণ ধরাইয়া লন। কত পাষণ্ড নাস্তিক যে, সাধুসংসর্গে অমর জীবন লাভ করিয়াছে, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। সাধু সংস্পর্শে দেহবিক্রয়কারিণী বেশ্যার ঘৃণিত জীবন পর্য্যন্ত মধুময় হইয়া গিয়াছে। সাধুসংসর্গের গুণে অস্পৃশ্যা কুলটাও পরমা ভক্তির অধিকারিণী হইয়াছিল।

সাধু ব্যক্তির চরিত্র-আলোচনা, সৎগ্রন্থ-পাঠ, পবিত্রচিত্রদর্শন, ভগবৎ-কথালোচনা এবং তীর্থভ্রমনাদিও সৎসঙ্গের অন্তর্গত।

কৃষ্ণ সেবা। কৃষ্ণসেবা অর্থে ভগ-বানের সচ্চিদানন্দ বিগ্রহের পরিচর্য্যা, গুরু-সেবা ও ভক্তসেবা বুঝিতে হইবে; ইহা বাহ্যেন্দ্রিয় দ্বারা সম্পন্ন হইবে। আর অন্তরে-ন্দ্রিয় মন দ্বারা মনোময়ী মূর্ত্তির সেবা করিবে। জগতের সকল জীবকে ভগবান মনে করিয়া শ্রদ্ধার সহিত সেবা করিতে পারিলে প্রকৃত কৃষ্ণসেবা হইয়া থাকে। এতদপেক্ষা ভক্তি লাভের উৎকৃষ্ট পন্থা আর কি হইতে পারে?

শ্রীমদ্ভাগবৎ গ্রন্থে মহারাজ অম্বরীশের উপাখ্যানে লিখিত আছে যে, তিনি কৃষ্ণ পদারবিন্দ চিন্তায়—মন, বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে বাক্য, হরির মন্দির মার্জ্জনাদিতে—কর, তদীয় গুণানুবাদ শ্রবণে—কর্ণ, শ্রীমূর্ত্তির মন্দির দর্শনে—নয়নদ্বয়, ভক্ত গাত্রস্পর্শে—অঙ্গ, শ্রীমূর্ত্তির পাদপদ্মে অর্পিত তুলসীর গন্ধে—নাসিকা, তাঁহাকে নিবেদিত অন্নাদিতে—রসনা, শ্রীহরির ক্ষেত্র পরিক্রমনের জন্য—পদদ্বয় ও তাঁহাকে প্রণামের জন্য—মস্তক নিযুক্ত করিলেন এবং ভোগ্য বিষয় গুলি ভোগলিপ্সু না হইয়া ভগবানের দাসভাবে ভোগ করিতে লাগি-লেন। এইরূপ করিতে করিতে গৃহ, স্ত্রী,

পুত্র, বন্ধু, হস্তী, রথ, অশ্ব, সৈন্য, অক্ষয়-রত্নাভরণ, অন্নাদি, রত্ন ভাণ্ডার কিছুতেই আর আসক্তি রহিল না। ক্রমে পরমাভক্তি তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল, মন একমাত্র হরি-পাদপদ্মে মগ্ন হইয়া রহিল। এই উপাখ্যান হইতে কৃষ্ণসেবার সাধন-প্রণালী সহজেই বোধগম্য হইবে।

ভাগবত। নিগম কল্পতরোর্গলিতং ফলং, অর্থাৎ—এই ভাগবত শাস্ত্র বেদরূপ কল্পবৃক্ষের অমৃত ফল। অমৃত রসান্বিত রস-স্বরূপ এই ফল প্রেমভক্তি লাভের জন্য পুনঃ পুনঃ পান কর। ভাগবতে কত ভক্ত এবং তাঁহাদের চরিত্র আখ্যাত রহিয়াছে; কোন ভক্তকে ভগবান্ কিরূপে কৃপা করিলেন; কোন্ ভক্ত কিরূপে ভক্তিলাভ করিলেন; বিশেষতঃ তাহাতে শ্রীভগবানের অনন্ত গুণ, অহেতুক কৃপা এবং অসমোর্দ্ধলীলা মাধুর্য্য গাথা রহিয়াছে; তাহা পাঠ করিতে করিতে অতি পাষণ্ডের হৃদয়ও দ্রব না হইয়া পারে না। ভগবানের স্বরূপবর্ণন, লীলাকীর্ত্তন, শক্তি-প্রচার ও ভক্তদিগের কাহিনী যে সকল গ্রন্থে প্রচুর পাওয়া যায়, তাহাই ভাগবত শাস্ত্র। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে তৎসমস্তই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে রহিয়াছে; তাই কলি-পাবন চৈতন্য-দেব ভাগবতকে ভক্তির একটী প্রধান সাধন বলিয়াছেন। ভাগবত গ্রন্থ শ্রবণ ও অধ্যয়ন করিলে মন ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। একমাত্র ভাগবত শ্রবণে মহারাজা পরীক্ষিৎ ভগবচ্চরণারবিন্দ লাভ করিয়াছিলেন। যে ব্রহ্মলাভের জন্য যোগী-ঋষি-জ্ঞানিগণ আত্মহারা, ভাগবতগ্রন্থ সেই ব্রহ্মকে চিদ্ঘনানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের তনুর আভা বলিয়া একমাত্র ভক্তিপথ প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিলাভের জন্য ভাগবত-পাঠ একান্ত কর্ত্তব্য। আমা-দিগের পুরাণ, উপপুরাণ সমস্তই ভাগবত শাস্ত্রের অন্তর্গত। প্রত্যেক পুরাণেই ভগবান্ ও ভক্তের কাহিনীতে পূর্ণ। তবে শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থখানি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

নাম। কীর্ত্তন, শ্রবণ ও জপ নাম-সাধনার অন্তর্গত; সুতরাং ভক্তিপথের সহায়। নাম-রূপ ও গুণাদির উচ্চরবে উচ্চারণ করাকে কীর্ত্তন, শ্রদ্ধাসহকারে তাহা শুনাকে—শ্রবণ এবং নাম বা মন্ত্রাদির লঘু উচ্চারণকে—জপ বলে। ভগবান্ শ্রীমুখে বলিয়াছেন;—

গীত্বা চ মম নামানি বিচরেন্মম সন্নিধৌ।
ইতি ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তস্যচার্জ্জুন॥
আদিপুরাণ।

"হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি আমার নাম গান করতঃ আমার নিকটে বিচরণ করে, তোমাকে সত্য বলিতেছি, আমি তাহার নিকট ক্রীত হইয়া অবস্থিতি করিয়া থাকি।" নাম ও নামীতে ভেদ না থাকাপ্রযুক্ত নামই চিন্তামণি স্বরূপ অর্থাৎ—সমস্ত পুরুষার্থ প্রদা-য়ক। ঐ নাম চৈতন্যরস স্বরূপ, অপরিচ্ছিন্ন এবং মায়া সম্বন্ধ বিরহিত ও মায়া হইতে অতীত। নামকীর্ত্তন ভক্তিপথের বিশেষ সহায়। নাম সংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়, চিত্তের সমস্ত কলঙ্ক দূর হয়; যে বিষয় বাসনা মহাদাবাগ্নির ন্যায় আমাদিগকে নিরন্তর দগ্ধ করিতেছে, সেই বিষয় বাসনা নির্ব্বাপিত হয়; চন্দ্রের জ্যোৎস্নায় যেমন কুমুদ ফুটিয়া উঠে, ভগবৎ-নামকীর্ত্তনে সেইরূপ আত্মার মঙ্গল প্রস্ফুটিত হয়; ব্রহ্মবিদ্যা অসূর্য্যম্পশ্যরূপা বধূর ন্যায়, কুলবধূ যেমন অন্তঃ-

পুরের অন্তঃপুরে অবস্থিতি করে, ব্রহ্মবিদ্যাও তেমনি হৃদয়ের অতি নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে লুক্কায়িত থাকেন, সাধারণের নিকট প্রকাশ করিবার বিষয় নহে, নামসংকীর্ত্তন সেই ব্রহ্মবিদ্যার জীবনস্বরূপ; ইহাদ্বারা আনন্দসাগর উথলিয়া উঠে; ইহার প্রতি পদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন এবং ইহাতেই মানুষ প্রেমরসে ডুবিয়া আত্মহারা হইয়া যায়। ক্রমাগত নামকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তিলাভ করতঃ অবশ্যই মানুষ পরম পদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়।

শাস্ত্র-সাগর-মন্থন করিয়া হরিনাম-সুধার উদ্ভব হইয়াছে। এই সুধাপানে মর-জগতের মানব অমরত্ব লাভ করিয়াছে, করিতেছে ও করিবে। এ কারণ সকল সম্প্রদায়ের ভক্তগণই হরিনাম-সংকীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইহা ভক্তি সাধনের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ।

যেই নাম সেই কৃষ্ণ ভজ নিষ্ঠা করি।
নামের সহিতে আছে আপনি শ্রীহরি॥
নাম ভজ নাম চিন্ত নাম কর সার।
অনন্ত কৃষ্ণের নাম মহিমা অপার॥

শ্রীনরোত্তম ঠাকুর।

নাম ও নামী যে অভিন্ন বস্তু, তাহা সর্ব্ব শাস্ত্র সম্মত। সুতরাং ভগবানের সমুদায় শক্তিই তদীয় নামমধ্যে নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু নাম সর্ব্বত্র শক্তি প্রকাশ করেন না, পাত্রের অনুরূপ ভাবেই শক্তি প্রকাশ করেন। যেরূপ জ্যোতির্ম্ময় সূর্য্য স্ফাটিক, কাচ, জল প্রভৃতি স্বচ্ছপদার্থে তাহাদিগের নির্ম্মলতানুসারে তারতম্যে প্রতিফলিত হয়, তদ্রূপ নামও ভক্ত হৃদয়ের স্বচ্ছতানুসারে শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই হরিনাম পরম ভাগবত জনের শুদ্ধসত্ত্বময় চিত্তক্ষেত্রে উদিত হইয়া তদীয় দেহেন্দ্রিয় প্রেমামৃতে প্লাবিত করেন, অথচ শ্রদ্ধাবান্ কনিষ্ঠ ভক্তের হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া ঈষন্মাত্র দ্রবীভূত করিয়া থাকেন, আবার ঘোর অজ্ঞানান্ধ অপরাধী জীবের হৃদয়ে উঁহার কোন শক্তিই আশু প্রকাশিত হইতে দেখা যায় না। এইহেতু ভগবৎ-নাম প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য হইতে পারে না। তবে সাধারণ জনগণকে নামাদি গ্রহণ করিতে দেখা যায় তাহার কারণ এই যে, ভগবন্নামাদি গ্রহণে রসনাদি ইন্দ্রিয় উন্মুখ হইলে নামাদি তাহাতে স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাহা হউক প্রবর্ত্ত, সাধক এবং সিদ্ধ, কাহারও পক্ষে এতদপেক্ষা অন্য পরম মঙ্গল আর নাই। "হরের্নামৈব কেবলং কলৌ নাস্ত্যেব গতিরন্যথা" অর্থাৎ—হরিনাম-ব্যতীত কলিগ্রস্থ জীবের আর অন্য গতি নাই, ইহা ত্রিসত্য করিয়া বলা হইয়াছে। নামের অসাধারণ মহিমা। বৈষ্ণবগণ বলেন, "এক হরি নামে যত পাপ বিনাশ করে, জীবের তত পাপ করিবার সাধ্যই নাই।" তাই রাজা দশরথকে ব্রহ্মহত্যা পাপ বিনাশার্থ বামদেব তিনবার রামনাম করিতে উপদেশ দিয়া নামের অমর্য্যাদা করিয়াছেন বলিয়া পিতা বশিষ্ঠ কর্ত্তৃক অভিসপ্ত হইয়াছিলেন।

হরিনাম ভক্তিলতিকার বীজ স্বরূপ। অতএব সেবাপরাধ ও নামাপরাধ পরিবর্জ্জন করিয়া প্রতিদিন হরিনাম সংকীর্ত্তন করিবে। হরিনাম সংকীর্ত্তন-প্রভাবে সর্ব্বাভীষ্ট পূর্ণ হয়—সমুদায় পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তাই সকল শাস্ত্রেই নামের মহিমা,—সকলের কণ্ঠেই নামের গৌরব-গীতি শুনিতে পাওয়া যায়। ক্রমাগত নাম লইতে লইতে আপনা হইতেই

প্রেমভক্তির সঞ্চার হইবে। অতএব ভাবানুযায়ী বন্ধুবান্ধব লইয়া প্রত্যহ নাম সংকীর্ত্তন করা ভক্তি লাভের সর্ব্ব প্রধান উপায়। নাম করিতে করিতে আনন্দসাগর উথলিয়া উঠিবে, প্রাণে শান্তি পাইবে, বিষয় বাসনা তিরোহিত হইয়া শুদ্ধাভক্তির সঞ্চার হইবে।

আজকাল বাঙ্গলাদেশের প্রায় সর্ব্বত্র হরিনাম সংকীর্ত্তনের ধূম পড়িয়া গিয়াছে; সুখের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু অধিকাংশ স্থলে নাম সংকীর্ত্তনের জন্য কীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয় না, সঙ্গীত সুখ বা বাহ্য আনন্দের জন্য কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অস্বাভাবিক ভক্তির উচ্ছ্বাসে নাম গ্রহণ এবং নৃত্যাদির রঙ্গে অনেক ভক্তের প্রকৃত ভাব ভঙ্গ হইয়া যায়। কেহ বা একটু ভক্তির উচ্ছ্বাসে দশা প্রাপ্ত হয়,—কত রঙ্গ ভঙ্গী করিতে থাকে; নির্ব্বোধ লোক তাহাদিগকে অবতার বিশেষ মনে করিয়া সেবাভক্তি আরম্ভ করিয়া দেয়। দশাগ্রস্থ ব্যক্তিও আপনাকে বুঝিতে না পারিয়া নিজকে 'গৌর' বা 'নিতাই' মনে করিয়া অহঙ্কারে ধরাকে সরাজ্ঞান করিতে থাকে। অহঙ্কারের সঞ্চার মাত্রেই ভক্তির দফা সারা হইয়া যায়। শাস্ত্রে আছে—

অভিমানং সুরাপানং গৌরবং রৌরবং ধ্রুবং।
প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্তা হরিং ভজেৎ।

অভিমানকে সুরাপান সম, গৌরবকে রৌরব নরক সম এবং প্রতিষ্ঠাকে শূকরী বিষ্ঠা সম মনে করিয়া হরির ভজন করিবে। কিন্তু বিন্দুমাত্র অহং ভাবের প্রতিষ্ঠা প্রত্যাশা করিলে ভক্তির আশা বিড়ম্বনা মাত্র। কাঙ্গালের ঠাকুর প্রেমাবতার চৈতন্যদেব ও তদীয় ভক্তগণ প্রেমাবেশে ভাবোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতেন; ভাব-ভক্তিবিহীন জীব অনর্থক সে অভিনয় কর কেন? বরং ভাব বা মত্ততা প্রকাশ পাইলে চাপিয়া যাইতে চেষ্টা করিবে। তুমি ইচ্ছা করিয়া তাহাতে যোগদান করিলে অচিরে উদ্রিক্ত ভক্তি অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। আর চাপিয়া থাকিতে পারিলে ভাব ক্রমশঃ মহাভাবে পরিণত হইয়া ভক্তকে আত্মহারা করতঃ হৃদয়ে প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিবে। সে অবস্থা দর্শনে বন্ধুবান্ধবও ধন্য হইয়া যাইবে। নতুবা লোকের নিকট বাহাদুরী লইবার জন্য এরূপ ধর্ম্মের আড়ম্বর বড়ই ঘৃণার্হ। নাস্তিকতা অপেক্ষাও ধর্ম্মের ভান অনিষ্টকারক। অতএব লোকদেখান ভণ্ডামী—লোক ভুলান ভোগলামী ত্যাগ করিয়া সরল বিশ্বাসে সমাহিত চিত্তে দীনতাবলম্বন করিয়া নাম সংকীর্ত্তন করিবে। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব বলিয়াছেন;—

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ শিক্ষাষ্টক

"তৃণ হইতেও নীচ এবং বৃক্ষহইতে সহিষ্ণু হইয়া, নিজে অভিমান ত্যাগ করিয়া, পরকে সম্মান দিয়া সদা হরিনাম কীর্ত্তন করিবে।" এই রূপে নাম করিতে আরম্ভ করিলে সকল লোকের অখিল পাপ দূর হয়, বিষয় বাসনা দূরীভূত হইয়া চিত্তদর্পণ মার্জ্জিত হয়। নাম করিতে করিতে প্রেমের সঞ্চার হয় এবং পরমপদ লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে।

ব্রজবাস। ব্রজধামে একদিন প্রেমভক্তির প্রবল জোয়ারে যমুনা উজান বহিয়াছিল,—পশুপক্ষী পর্য্যন্ত হরিনাম গাহিয়াছিল,—

বিনা বসন্তে বৃক্ষলতা ফলপুষ্প প্রসব করিয়াছিল। ব্রজধামের কথা শুনিলেই প্রাণে ভক্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। আজিও ব্রজের প্রতি ধূলি-কণায়—প্রতি পরমাণুতে রাধাকৃষ্ণের প্রেমকণা জড়িত হইয়া আছে; সুতরাং তথায় বাস করিলে,—ব্রজে লুটাইলে যে ভক্তের হৃদয়ে প্রেম সঞ্চার হইবে, ইহা বিজ্ঞান সম্মত কথা। সকল তীর্থই পাপনাশক ও ভক্তিউদ্দীপক। ভূমির কোন অদ্ভুত প্রভাব, জলের কোন অদ্ভুত তেজ, কিম্বা মুনিগণের অধিষ্ঠান জন্য তীর্থ পুণ্যস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। প্রত্যেক তীর্থ-স্থানই ভগবান্ বা ভগবৎসদৃশ কোন মহাত্মার লীলাভূমি। সুতরাং তথায় তাঁহাদের অসাধারণ শক্তি, জ্ঞান বা ভক্তি পুঞ্জীকৃত হইয়া আছে; কোন ব্যক্তি তথায় যাইবামাত্র সেই পুঞ্জীকৃত শক্তি তাহাকে অনুপ্রাণিত করিয়া ফেলে। তাহার ফলে সেইব্যক্তির তত্ত্বংবৃত্তি জাগ্রত হইয়া পড়ে। সুতরাং আপন আপন ভাবানুযায়ী তীর্থে বাস বা ভ্রমন করিলে হৃদয়ে ভক্তির ভাব জাগ্রত হয়। তবে যাঁহারা প্রেম-ভক্তি বা গোপীভাবনিষ্ঠ প্রেমরস লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদিগকে ব্রজেই বাস করিতে হইবে। কারণ প্রেমভক্তির উত্তালতরঙ্গ এক ব্রজধাম ভিন্ন অন্য কোথাও উঠে নাই।

এইপাঁচটী ভক্তির অঙ্গ সাধন করিলেই সর্ব্বাভীষ্ট সিদ্ধ হইয়া থাকে। এমন কি এই পাঁচ-টীতে অল্পমাত্র শ্রদ্ধা থাকিলেও মনুষ্যের পরম শ্রেয়োলাভ হয়। যথাঃ—

দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধাদূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

দুরূহ অথচ অদ্ভুত বীর্য্যশালী এই সাধন পঞ্চক অর্থাৎ—সৎসঙ্গ, কৃষ্ণসেবা, ভাগবত, নাম ও ব্রজে বাস এই পাঁচ প্রকার অঙ্গ, তাহাতে শ্রদ্ধা দূরে থাকুক, অল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও ভক্ত-দিগরে অন্তকরণে অচিরাৎ ভাবের আবির্ভাব হইয়া থাকে। ভাবের উদয় হইলে প্রেমলাভের জন্য ভাবের সাধনা করা কর্ত্তব্য।

—:০:—

সাধক-সঙ্গীত।

[৭]

মন মীন দুরাশয়।
সংশয় পূর্ণ বিষয় হ্রদ পরিহরি, আশ্রয় কর হরিপদ জলাশয়॥
(তাতে) কাল জাল ফেলে না দেখিয়ে গভীর, ভাসে না সে জলে কামাদি কুম্ভীর,
ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষময় নীর, সুনির্ম্মল অতিশয়॥
সেই জলাশয়ের মধ্য, যোগীর মানস পদ্ম, বিকশিত আছে সর্ব্বস্থান;
সেই পদ্ম মাঝে, ভক্তি মধু সাজে, অলিরূপে হরি করেন পান;—
সাঁতারিছে তাতে সদা সাধনহংস, বাঁধা তার প্রেমে আছে 'সোহহং' হংস,
অণিমাদ অষ্টসিদ্ধির তরঙ্গ, অষ্ট প্রহর স্থির ভাবে রয়॥

সাংখ্য পাতঞ্জল, মীমাংসাদি প্রবল, দর্শন শাস্ত্র চারি তীর তার ;
ঋক্ যজু শাম, অথর্ব্বে নির্ম্মান চারিঘাট অতি সুবিস্তার ;—
(জীবের) সে ঘাটে নামিবার আছে সুবিধান, স্বাহা স্বধা বৌষট্ মন্ত্রেরি সোপান,
ওঙ্কার অমৃতকুণ্ডে নিলে স্নান, চিন্তাপঙ্ক ভোজন দূর হয় ॥
সার্ষ্টি সারূপ্য, সালোক্য সামীপ্য, মুক্তি রূপা মুক্তা আছে তায় ;
চারিদিকে বরাভয়ের কূপ ব্রহ্মানন্দের রূপ, মহারত্ন কত আছে তায় ;
(জীবের) অন্য পঙ্ক শূন্য সেই জলাশয়ে যেতে, যাওরে উপনিষদ্-প্রণালীর পথে,
তুই গেলে গোবিন্দ যাবেরে তোর সাথে, ত্যজে বিষয় আশয় বিষময় ॥

—:0:—

উপদেশ সংগ্রহ ।

(পূর্ব্বে প্রকাশিতের পর)

৮৪ । সমুদ্রের সঙ্গে যে নদীর যোগ থাকে ভাটার সময় সমুদ্র তাহার সমস্ত জল টানিয়া লয় সত্য, কিন্তু সমুদ্রে জোয়ার আসিলে জল স্রোতে নদীর দুকুল ভাসিয়া যায়, তদ্রূপ সাধু মহাত্মাদিগের সংসর্গে সাধারণ জীবেরও এই দশা হয় ।

৮৫ । অসুরের পক্ষেই কালী করাল বদনী; কিন্তু সন্তানের কাছে তিনি বরাভয় প্রদায়িনী শান্তি দায়িনী জননী মূর্ত্তি । বাঘিনী অন্যের কাছে যতই হিংস্রা হউক না কেন, আপন শাবকের কাছে স্নেহময়ী জননী ।

৮৬ । জ্ঞানলাভের ইচ্ছা মানবের স্বাভাবিক ; অন্ধকার গৃহে কোন বৃক্ষ কি লতা জন্মিতে দিলে, সে আলো পাইবার জন্য জানালা কপাট ইত্যাদির ফাঁক দিয়া মাথা বাহির করিতে আকুলি বিকুলি করিয়া থাকে, সেই রূপ অবোধ শিশু জানিতে ইচ্ছুক হইয়া 'এ'টা কি' 'ও'টা কি' বলিয়া পিতামাতা প্রভৃতি আত্মীয়জনকে নানা প্রশ্ন করিয়া থাকে ।

৮৭ । কলির জীবের নামই সম্বল ।

৮৮ । নাম মহাত্ম্য বুঝিতে চাও ত শিব হও ।

৮৯ । হৃদয়ে সত্যের জোর থাকিলে ন্যায্য কথা বলিতে ভয় হয় না; কেননা, যে সত্যের বলে বলীয়ান্, ভগবান্ তাহার সহায়; ভগবান্ সত্যে প্রতিষ্ঠিত ।

৯০ । জীব আর ব্রহ্ম একই জিনিষ, তবে প্রভেদ এই যে, জীব খাদ মিশান সোণা, আর ব্রহ্ম খাঁটি সোণা । তবে কেহ বা অল্প খাদের কেহ বা বেশী খাদের, তাই জীবে জীবে বিভেদ দৃষ্ট হয় । অনেক খাদে অল্প মূল্যের সোণা আর অল্প খাদে অধিক মূল্যের সোণা ।

৯১ । স্বর্ণকার যেমন আগুণে গলাইয়া পদার্থ বিশেষের সাহায্যে খাদ মিশান সোণাকে

পাকা সোণা করিতে পারে, সেইরূপ সদ্‌গুরুর কৃপায় জ্ঞানের উপরে গলাইয়া কামনা বাসনা বা অবিদ্যার খাদ দূরীভূত করতঃ, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে। ইহাই মোক্ষ লাভ।

৯২। দ্বৈত ভাব জীবের স্বাভাবিক, তাই সুখ-দুঃখ, সৎ-অসৎ, লাভ অলাভ, ভাল-মন্দ ইত্যাদি বিচার।

৯৩। জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি, অর্থাৎ জ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়।

৯৪। শাকান্নে উদরের পরিতৃপ্তি হইতে পারে, মনের তৃপ্তি কিছুতেই হয় না, তাই জীবের যত দুঃখ।

৯৫। আন্তরিক প্রবল ইচ্ছা থাকিলে কিছুতেই কার্য্য হানি ঘটাইতে পারে না; প্রাণের অভাবেই হয়।

৯৬। মেলা প্রভৃতি স্থানে লোকের বড় ভিড় হয়, সেখানে লোক ঠেলিয়া পথ চলা বড় দুষ্কর, কিন্তু যদি সেই পথে একটী হাতী চলিয়া যায়, তাহা হইলে আপনা হইতেই পথ পরিষ্কার হয়। তখন কেবল হাতীর অনুগমন করিলেই হইল, পথের জন্য আর ভাবিতে হয় না। সংসার ক্ষেত্রেও এইরূপ; সাধু মহাপুরুষের পদাঙ্ক অনুসরণ করিলে আর কোন বিপদের ভয় থাকে না; তাই 'মহজনাঃ গতাঃ যেন স পন্থা'।

৯৭। এক সময়ে একই স্থানে দুই বস্তু থাকিতে পারে না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ; তাই বিষয়ীর মনে ঈশ্বরচিন্তা বা ভক্তের মনে বিষয়চিন্তা স্থান পায় না।

৯৮। জ্ঞান অর্থে ভগবানকে জানা। জ্ঞান লাভ করিতে চাও ত প্রকৃতি-গ্রন্থ অধ্যয়ন কর; সৃষ্ট জগতে এক একটী পদার্থ অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার। মানুষ ত দূরের কথা, সামান্য একটী বৃক্ষপত্র অনন্ত জ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

৯৯। মানুষ বড় অহঙ্কারী, তাহারা আপন ছাঁচে জগৎটাকে তুলনা করে; তাই না বুঝিয়া সাধারণ লোকের ত দূরের কথা, সাধু মহাপুরুষদিগের কার্য্যেরও দোষ ধরিয়া থাকে। তাহারা একবার চিন্তা করিয়া দেখে না যে, তাহাদের বিদ্যা বুদ্ধির দৌড় কতদূর। যে নিজকে জানে না, অন্যের চরিত্র কি কার্য্যের দোষ ধরিতে যাওয়া তাহার পক্ষে ধৃষ্টতা নয় কি?

১০০। অহঙ্কারী মানব সহজে ভগবানে নির্ভর করিতে চায় না, যখন আর গত্যন্তর নাই, তখনই বলে, "কি করিব অদৃষ্টে বা কপালে ছিল,"—এই খানেই নির্ভরতার আরম্ভ, না ঠেকিলে কেহ শিখিতে চায় না; তাই লোকে কথায় বলে "শিখ্‌ছ কোথায় ঠেক্‌ছি যথায়"।

১০১। রক্ষার আগেই পরীক্ষা।

১০২। পরকেই ডাকিতে হয়, আপনার জনকে ডাকিতে হয় না; সে ত সংবাদ শুনিয়া আপনিই আসিবে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রভাস-যজ্ঞে ত্রিলোকবাসিদিগের নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ব্রজবাসিদিগকে কোন সংবাদই দেন নাই; তাঁহারা বিনা নিমন্ত্রণে কৃষ্ণ দরশনে আসিয়াছিলেন। পিতা নন্দ, মাতা যশোমতী, প্রেমময়ী রাধা ও অন্যান্য ব্রজ

গোপ গোপিনিগণ যজ্ঞস্থলে দ্বারবানের হাতে কতই না অপমানিত, লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, কই তবু ত তাহারা আপনজনের প্রতি রাগ বা অভিমান করেন নাই! আহা! এ দৃশ্য কত মধুর! এবং ইহার পরিণাম কতই না মধুময় হইয়াছিল। ইহাই আপন পরের পরীক্ষা।

১০৩। পরকে মারিতে হইলে কত অস্ত্র শস্ত্রেরই না প্রয়োজন হয়, কিন্তু আত্ম-হত্যা করিতে হইলে সামান্য নরুণের সাহায্যেই হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমার বন্ধন রজ্জু খুচিয়া গেল বটে, কিন্তু আমি বৃদ্ধার অত্যাধিক আদর-সোহাগে বড়ই অবাধ্য হইয়া উঠিলাম। পিতামাতার শাসন গ্রাহ্য করিতাম না; যখন যে বাসনা হইত বৃদ্ধার প্রশ্রয় পাইয়া অবাধে তাহা পূর্ণ করিতাম। আমার জেঠীমা হরকুমারী দেবীর সন্তানসন্ততি না থাকায় তিনি আমাকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। আমার দুষ্টুমিতে বিরক্ত হইয়া পিতা কিম্বা মাতা শাসন করিতে যাইলে, ইঁহার জন্য পারিতেন না।

চীনীশপুর-কালীবাড়ী।

বৃদ্ধার সহিত সময়ে সময়ে আমি পার্শ্ববর্ত্তী গ্রাম গুলিতে বেড়াইতে যাইতাম। একদা দিনাদ্দী গ্রামে যাইয়া তত্রত্য অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তীর স্থাপিত কালীমূর্ত্তি দর্শন করিলাম। তৎপরে যখন আমার একাদশ বৎসর বয়স সেই সময়ে একদিন বৃদ্ধা পাড়ার আরও কয়েকটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের সহিত চীনীশপুর কালীবাড়ী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইল; সঙ্গে আমার জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্ত্তীও চলিলেন। "আমিও যাব" বলিয়া বায়না ধরিলাম। বৈশাখ মাস, দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্র, অনেক রাস্তা—হাঁটিয়া যাইতে কষ্ট হইবে বলিয়া অনেকেই আমাকে যাইতে নিষেধ করিল। কিন্তু আমার স্বভাব অন্যরূপ, আমাকে যে কার্য্য করিতে যত নিষেধ করিবে, তাহাতে আমি তত অনুরক্তি প্রকাশ করিব। সুতরাং আমারই জয় হইল। আমিও তাহাদের সহিত চীনীশপুর কালীবাড়ী দেখিতে যাত্রা করিলাম।

কিছুদূর চলিয়া বুঝিতে পারিলাম বড়ই অন্যায় কার্য্য করিয়াছি, রৌদ্রে শরীর যেন আগুণে ঝলসিতে লাগিল; পিপাসায় কণ্ঠ-তালু শুকাইয়া আসিল, চ'খে আঁধার দেখিতে লাগিলাম। সঙ্গের মেয়েরা নানা মেয়ের নানারূপ কুৎসা করিতে করিতে উৎসাহে কালীদর্শনে চলিয়াছে। কাজেই তাহারা তত কাতর হইল না, এবং আমার কাতরতা বুঝিতে পারিল না। দাদা একবার বলিলেন, "কেমন জব্দ, কথা না শুনিলে এইরূপ দশাই

হয়।” দাদার কথায় কান্না আসিতেছিল, কিন্তু সহসা, ক্রোধের সঞ্চার হওয়ায় মান রক্ষা হইল। কেবল বৃদ্ধা নানারূপ প্রবোধ বাক্যে উৎসাহিত করিয়া লইয়া চলিল। অনন্তর একটী ক্ষুদ্র নদীর তীরে উপনীত হইয়া বৃদ্ধা সোৎসাহে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করতঃ দেখাইয়া বলিল, “ঐতো রামপ্রসাদের কালীবাড়ী।”

আমরা অনতিবিলম্বে একটী জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। এই বনের মধ্যেই কালী-বাড়ী; আমরা মন্দির সমীপে উপনীত হইলে বৃদ্ধা,—“জয়মা চীনেশ্বরী” বলিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিল। আমিও অন্যান্যের সহিত মস্তক নত করিলাম। মন্দিরের কিয়দ্দূরে প্রকাণ্ড একটা বটবৃক্ষ ছিল, বৃদ্ধা তন্মুলে প্রণাম করিয়া আমাদের লইয়া বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। জন প্রাণীবিহীন নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গল মধ্যে একমাত্র অট্টালিকা এবং পান্থ-বিহগ-বিরামদায়ী বহুদূরব্যাপী ছায়াবিস্তার-কারী বটবৃক্ষত্রয় যন্ত্রাকারে অবস্থিত। এখানে মধ্যাহ্নের সূর্য্য কিরণও প্রবেশ করিতে পারে না। শীতল বায়ু বনফুলগন্ধ-সম্পৃক্ত হইয়া প্রাণ তৃপ্ত করিল; পিপাসার কথা ভুলিয়া গেলাম।

ইত্যবসরে পূজোপকরণ সহ পূজারী, ভাণ্ডারী এবং কয়েক জন যাত্রী আসিয়া উপস্থিত হইল। আনন্দময়ীর আনন্দকানন জন-কোলাহলে মুখরিত এবং হুলুধ্বনির সঙ্গে কাঁসর ঘণ্টারবাদ্যে এক অপূর্ব ভাব ধারণ করিল।

সহসা বটবৃক্ষের অন্তপ্রান্তে আমার দৃষ্টি পড়িল। তথায় অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট সুদীর্ঘ দেহে জটাধারী একজন অবধূতকে সমাসীন দেখিলাম। তিনি সঙ্কেত করিয়া আমাদিগকে নিকটে ডাকিলেন; আমি দাদার সঙ্গে তাঁহার কাছে গেলাম। তখন সন্ন্যাসী বলিলেন,- “একটী পয়সা দিয়া এখানে প্রণাম কর, এই স্থানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ হয়েন,।”

দাদা বলিলেন, “ঐ মন্দিরের মধ্যে যে সিদ্ধপীঠ; এই স্থানে সিদ্ধ হইলে লোকে এখানে পূজা না দিয়া, মন্দিরের মধ্যে পূজা করে কেন?”

সন্ন্যাসী বলিলেন, “রামপ্রসাদ প্রথমতঃ এই স্থানেই আসন করিয়া ছিলেন; তৎপরে ঐ পীঠস্থানে সিদ্ধি লাভ করেন।”

বৃদ্ধা এই সময়ে বলিয়া উঠিল, “শুনিয়াছি পাকড়াশী মশায় এই সম্পত্তি হারাণকে লিখিয়া দিবে।” দাদা কিছু বিমর্ষ হইলেন। রাজচন্দ্র পাকড়াশী এই কালীবাড়ী ও তৎসংক্রান্ত জায়গীরবন্দোবস্তী তালুকাদির বর্ত্তমান মালীক ও সেবায়েত। ইনি আমার পিতার সাক্ষাৎ মাতুল; আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। ইহাঁর কোন উত্তরাধিকারী না থাকার আমাকেই সমস্ত লিখিয়া দেওয়ার কথা চলিতেছিল।

পূজান্তে প্রসাদ গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া বৃদ্ধা আমাদের লইয়া বাটী রওনা হইল। আমি রাস্তায় বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, “বুড়ী দিদি! দিনান্দী কালী দেখিয়াছি, এখানে কালী তো দেখিলাম না, কালী কৈ?”

দাদা বলিলেন, “এ যে সিদ্ধপীঠ, এখানে মূর্ত্তি নাই, পীঠস্থানে মূর্ত্তি থাকে

না।” বৃদ্ধা বলিয়া উঠিল, ঐ যে বেদী দেখ্‌লি উহাই পীঠস্থান; যখন যাত্রিগণ পূজা দেয়, তখন এখানে মায়ের আবির্ভাব হয়। সিদ্ধপুরুষ ব্যতীত অন্য কেহ তাহা দেখিতে পায় না। রামপ্রসাদ দেখিয়াছিলেন; এখানে তাঁহার কামনা সিদ্ধ হইয়াছিল, তাই ইহা রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ। রামপ্রসাদ কালীমূর্ত্তি প্রস্তুতের জন্য একখণ্ড নিমকাঠ সংগ্রহ করিয়া ছিলেন; দিনার্দ্দী নিবাসী অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তী সেই কাঠখানা রামপ্রসাদের অজ্ঞাতসারে নিজ বাড়ীতে লইয়া যান। অক্ষয়রাম বিশ্বাস করিতেন, রামপ্রসাদ ঐ কাঠখানার বলেই বাক্‌সিদ্ধ ও ভবিষ্যদ্বক্তা। এই কাষ্ঠখণ্ড প্রসাদাৎ তিনি দৈববাণী শ্রুত হন এবং তজ্জন্যই লোক সমাজে যথেষ্ট সম্মান। দিনার্দ্দী যে কালী দেখিয়াছিস্‌ তাহা রামপ্রসাদের সংগৃহীত সেই নিমকাঠের ছিল। অল্পদিন হয় উহা আপনা আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ে। পরে নীলকমল বাবু ঐ স্থানে পাথরের মূর্ত্তি স্থাপন করেন; কিন্তু বিফল মনোরথহেতু রামপ্রসাদ তদবধি আর কোন মূর্ত্তি স্থাপনের চেষ্টা করেন নাই।”

“মূর্ত্তি স্থাপনে ব্যাঘাত হওয়ায় তিনি একটী গান রচনা করেন, রামপ্রসাদের অনেক মালসী গান আছে; গানগুলি বড় ভাল, গা লো গাঁ মুক্তর মা” বলিয়া বৃদ্ধা সর্ব্বলোক প্রসিদ্ধ “মন তোর এত ভাবনা কেনে” এই গানটী গাহিতে আরম্ভ করিল। মুক্তর মা ও গঙ্গার মা তাহাতে যোগ দিল। গান শেষ করিয়া বৃদ্ধা বলিল, “ঐ দেখ্‌ ঠাকুরবাড়ী। রামপ্রসাদকে লোকে ‘ঠাকুর’ বলিয়া ডাকিত, সেই হেতু তাঁহার বাড়ী ঠাকুরবাড়ী বা পেহ্ন ঠাকুরের বাড়ী বলিয়া প্রসিদ্ধ।” দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, “কালীর দালান কে দিয়াছে?” বৃদ্ধা বলিল, “ওয়াট্‌ (মিঃ জে, পি, ওয়াইজ) সাহেবর দেওয়ান রামকৃষ্ণ রায় এই মন্দির দিয়াছেন।”

দাদা। কত দিন হইয়াছে?

বৃদ্ধা। যখন এ দালান প্রতিষ্ঠা হয়, তখন আমার বয়স ১৪।১৫ বছর। শম্ভুনাথ ঠাকুরের আমলে এ দালান প্রতিষ্ঠা হয়। তৎপূর্ব্বে খড়ো ঘর ছিল। শুনিয়াছি দেওয়ান রামকৃষ্ণ ৺ দুর্গোৎসব পূজোপলক্ষে বাড়ী যাইবার কালে পদ্মানদী গর্ভে নৌকা সহ ডুবিয়া যান; তিনি খুব মোটা ছিলেন, বিশেষতঃ সাঁতার জানিতেন না। বিপদে পড়িয়া মানস করিলেন, যদি এ যাত্রা রক্ষা পাই মায়ের মন্দির গড়াইয়া দিব। মায়ের মহিমা!—তিনি রক্ষা পাইলেন; বাড়ী হইতে আসয়াই এই দালান দিয়াছেন।

বৃদ্ধার কথা শেষ না হইতেই গঙ্গার মা বলিল, “না-গো না, আমরা শুনিয়াছি, শম্ভু ঠাকুরের নিষেধ সত্ত্বেও নীলকুঠীর সাহেবের ছেলে মায়ের মণ্ডপের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করে; অধিকন্তু দেবীকে অবজ্ঞা ও শম্ভুঠাকুরকে গালাগাল করিয়াছিল। বাটী পৌঁছিতেই সাহেবের ছেলের প্রস্রাবেন্দ্রিয় ফুলিয়া উঠিল; সে যাতনায় ছট্‌ ফট্‌ করিতে লাগিল। বালকের মাতা পূর্ব্বেই পুত্রমুখে বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়াছিলেন। শম্ভুঠাকুরের প্রভাব এবং দেবীমাহাত্ম্য মেমসাহেব বিদিত ছিলেন; ঔষধ প্রয়োগে কোন ফলোদয় না হওয়ায় প্রতিকারোপায়

নির্দ্ধারণের জন্য তিনি স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া রামকৃষ্ণ দেওয়ানকে ডাকাইলেন। তখন ছেলেটী অচৈতন্য; প্রলাপের ঝোঁকে কাতরে—করজোড়ে পুনঃ পুনঃ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছিল এবং মুহুর্মুহু মুখমণ্ডলে ভীষণ বিভীষিকা দর্শনের ভাব প্রকাশ পাইতেছিল।"

"মেম সাহেবের আহ্বানে দেওয়ান আসিলেন; তিনি পূর্ব্বেই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে মেমসাহেব পূজা দিতে কালীবাড়ী যাইতে প্রস্তুত হইলেন; কিন্তু সাহেব উপহাস করিয়া সব কথা উড়াইয়া দিলেন। সুতরাং সেদিন পূজা দেওয়া হইল না। কিন্তু বিধির বিচিত্র বিধান! পরদিন প্রত্যুষে সাহেবের একটী কন্যা ওলাউঠা রোগাক্রান্ত হইল। তাহার মুখেও একইরূপ লক্ষণ প্রকটিত ও প্রলাপবাক্য বাহির হইতেছিল। অর্থাৎ—কালী পূজা দিলে ভাল হইব।"

"চিকিৎসায় কোনই ফল ফলিল না; উত্তরোত্তর রোগীদ্বয়ের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন হইল। সন্তানের জীবন আশায় হতাশ হইয়া এবং মেমসাহেবের নির্ব্বন্ধাতিশয্যে সাহেব দেওয়ানকে পূজা প্রদান করিতে আদেশ দিলেন। তাঁহার উপদেশানুসারে মেমসাহেব আর্দ্রবস্ত্রে ভক্তিবিগলিত অশ্রুসহ কালীবাড়ী উপস্থিত হইয়া মণ্ডপ সন্নিধানে হাঁটু গাড়িয়া কৃতাঞ্জলিপুটে 'আমার সন্তানগণ আরোগ্য হইলে এখানে মন্দির প্রস্তুত করাইয়া ষোড়শোপচারে পূজা প্রদান করিব" বলিয়া মানস করিলেন। অনুনয় বিনয়ে শম্ভুঠাকুরও সন্তুষ্ট হইয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ (পুষ্প বিল্বপত্র ও চরণামৃত) প্রদান করিলেন। অচিরাৎ সাহেবের সন্তান দু'টী রোগমুক্ত হইল।"

বৃদ্ধা বলিল, "হাঁ-লো হাঁ; ওসব একই কথা, রামকৃষ্ণ দেওয়ানের দালান দেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। কালীর ইচ্ছাতেই এ সকল ঘটিয়া ছিল; দেওয়ান নিমিত্ত মাত্র।"

যাহা হউক রামকৃষ্ণ রায় সময় বুঝিয়া মাঝে মাঝে সাহেবকে মানসিকের বিষয় স্মরণ করাইয়া দিতেন; কিন্তু সাহেব তাহাতে বড় কর্ণপাত করিতেন না। মেমসাহেবও স্বামীর আচরণে অপ্রতিভ ও দুঃখিত হইলেন। দেওয়ানও বিরক্ত হইয়া মায়ের উপর নির্ভর করিলেন। সাহেব একদা রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, কেহ যেন তাঁহাকে বলিতেছেন, "তুই আমার মন্দির করিয়া না দিলে কল্য হইতে নীল জমা বন্ধ হইবে।" সাহেব তাহা গ্রাহ্য না করিয়া সেদিন স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া কার্য্য পরিচালনা করিলেন। কিন্তু ইচ্ছাময়ী ইচ্ছার গতি রোধকরা কাহার সাধ্য? ঐ দিন কুঠীতে নীল জমিল না; অন্যান্য কুঠী হইতেও এইরূপ সংবাদ আসিল। স্বচেষ্টিত কর্ম্ম পণ্ড হওয়ায় সাহেবের চৈতন্যোদয় হইল। তৎক্ষণাৎ কালীর মন্দির নির্ম্মাণার্থ দেওয়ান মহাশয় আদিষ্ট হইলেন। হর্ষোৎফুল্লচিত্তে রামকৃষ্ণ রায় অল্পদিনে সুচারুরূপে মন্দির নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

বৃদ্ধার কথা শেষ হইলে দাদা জিজ্ঞাসা করিলেন, "রামকৃষ্ণ রায়ের বাড়ী কোথায়?"

বৃদ্ধা। ফরিদপুর।

দাদা। রাম প্রসাদের বাড়ী?

বৃদ্ধা। তাহা জানি না। তাঁহার বাড়ী এদেশে ছিল না। কোথা হইতে আসিয়া ঐ বাড়ীতে (পূর্ব্ব কথিত ঠাকুরবাড়ী) বিবাহ করতঃ বাস করিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিব না। রামপ্রসাদের কালী বড় জাগ্রত;—রামপ্রসাদ বৈশাখীয় অমাবস্যা তিথিতে সিদ্ধিলাভ করেন। রামপ্রসাদ মায়ের পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করিতে পারেন নাই; শুনিয়াছি শাঁখাশুদ্ধ চারিখানা হাত দর্শন পান সে গল্পটা আশ্চর্য্য!

দাদা। শাঁখার গল্পটা বল্।

বৃদ্ধা অমনি আরম্ভ করিল। একদা একজন শঙ্খবিক্রেতা রামপ্রসাদের নিকট আসিয়া বলিল, "স্নানের ঘাটে আপনার কন্যা শাঁখা পরিয়াছেন, ফুলচাঙ্গের উপর তদীয় পেটিকা হইতে ১৷৴ শাঁখার মূল্য দিবার জন্য বলিয়াছেন।" রামপ্রসাদ স্বীয় কন্যাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কন্যা অস্বীকার করিল। রামপ্রসাদ জানিতেন তদীয় কন্যা মিথ্যা বলিতে জানে না। তিনি বিস্ময়াভিভূত চিত্তে ফুলচাঙ্গে পেটিকা দেখিতে চলিলেন; ইত্যবসরে শাঁখারি অন্তর্দ্ধান হইল। রামপ্রসাদ মায়ের ছলনা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহার কন্যাকে কালীর অংশ সম্ভূতা জানিয়া সমধিক আদর—যত্ন করিতে লাগিলেন।

রামপ্রসাদ এবম্বিধ আশ্চর্য্য পরম্পরা দর্শনে ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া উঠিলেন। বড় একটা বাড়ী ঘরে যাইতেন না; কেবল কাঁদিতেন—গান করিতেন। 'মা তুই কেমন শাঁখা পরিয়াছিস্ দেখা" বলিয়া পাগলের ন্যায় চিৎকার করিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার বিশ্বময় কালীমূর্ত্তির স্ফূর্ত্তি হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকে তাঁহার এই প্রেমোন্মাদ বুঝিতে না পারিয়া পাগল সিদ্ধান্ত করিল। এই সময়ে রামপ্রসাদ দৈববাণী শুনিতে পান যে, "বৎস! এখনও তোর দ্বৈধভাব আছে; কালী ও গঙ্গা অভেদ,—তুমি কাশীধাম গমন কর, তথায় তোমার বাসনা পূর্ণ হইবে।"

রামপ্রসাদ তৎক্ষণাৎ কাশীযাত্রা করিলেন। কাশীতে পৌছিয়া তিনি গঙ্গাস্নানান্তে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শন করিতে যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার নয়ন ঝলসিয়া গেল, তিনি দেখিলেন—শ্যামবর্ণা ও গৌরবর্ণা দুইটী মেয়ে মৃদু মন্থর গতিতে হাসিতে হাসিতে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া যাইতেছেন। ইহাঁদের অলৌকিক রূপ-লাবণ্য দর্শনে রামপ্রসাদের চিত্ত দ্রবীভূত হইল; তিনি ভাবাবিষ্ট হইলেন। ভাবের ঘোরে দেখিলেন বালিকা দুইটী একাঙ্গীভূত হইয়া গঙ্গাগর্ভে নিমজ্জিত হইল। সেই সময়ে হস্ত চতুষ্টয়ে নূতন শাঁখা দেখিতে পাইয়া অস্ফুটস্বরে কি বলিতে বলিতে পাগলের ন্যায় গঙ্গায় লাফাইয়া পড়িলেন। সেই দিন রামপ্রসাদের মনস্কামনা সিদ্ধ হইল।

বৃদ্ধার কথা শেষ হইলে গঙ্গার মা বলিল, "রামপ্রসাদের কালীর অনেক কথা আছে; শুনিয়াছি একদিন কালী রামপ্রসাদের কন্যার রূপ ধরিয়া তাঁহার ঘরের বেড়া বাধিয়া দিয়াছিলেন।"

দাদার আর সহ্য হইল না; তিনি বিজ্ঞের ন্যায় বলিলেন, "এ সকল কথা আমি বিশ্বাস করি না, কালী—দেবতা, তিনি আসিয়া রামপ্রসাদের বেড়া বাধিয়াছিলেন, এমন অসঙ্গত কথা বলিতে নাই।"

গঙ্গার মা রাগিয়া বলিল, "তোর মায়ের পেটে তুই কি ক'রে হ'লি! একটা মানুষের পেটে আর একটা মানুষ কেমন করে থাকে? কেমন ক'রে জন্মালি? তিনি সব করিতে পারেন, দেবতার কার্য্যে কখনও অবিশ্বাস করিস্ না। আমরা এইরূপ শুনিয়া আসিতেছি।"

দাদা কিছু অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার ধারণা ছিল যে, তিনি বুদ্ধিমান—মধ্যবাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাশ করিয়াছেন; কিন্তু অশিক্ষিতা স্ত্রীলোকের কথায় প্রতিবাদ করিতে যাইয়া নির্ব্বাক হইলেন। লজ্জায় আর একটী কথাও বলিলেন না। সঙ্গের মেয়েরা এখনকার ছুধের ছেলেদের চোখে মুখে কথা—দেবতা ঈশ্বরে অবিশ্বাস—হট্ কারিতাও ঔদ্ধত্যের বিষয় সমালোচনা জুড়িয়া দিল। আমি বিরক্ত হইয়া বৃদ্ধাকে আর একটী গল্প বলিতে অনুরোধ করিলাম। বৃদ্ধা বিনা প্রতিবাদে গল্প আরম্ভ করিল। বলিল—

একদিন সন্ধ্যার পর একজন পথভ্রান্ত পথিক রামপ্রসাদের কালীবাড়ী আসিয়া উপনীত হয়। একটী বালিকা ঐ পথিককে তেঁতুল সংযোগে চিড়া খাওয়াইয়া বলেন, "এইটী দেবালয়,—রামপ্রসাদের কালীবাড়ী; এখানে রাত্রিতে থাকিবার সুবিধা হইবে না। এইমাত্র বাবা বৈকালী-দিয়া বাড়ী গেলেন, চল আমি তোমাকে বাড়ী লইয়া যাই।" বালিকা আগে আগে চলিল, পথিক তাঁহার অনুসরণ করিল। গ্রামের মধ্যে পৌঁছিয়া বালিকা অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "ঐ আমার বাবার বাড়ী, তুমি এই রাস্তায় যাও, আমি অন্য রাস্তা দিয়া বাটীর মধ্যে যাইব।" পথিক যাইয়া গৃহস্বামীর নিকট সমস্ত নিবেদন করিল; গৃহস্বামী শুনিয়া বলিলেন, এ সময়ে কোন বালিকার কালীবাড়ী যাওয়া অসম্ভব, আপনি ভাগ্যবান্!—মা আপনাকে খাইতে দিয়া রাত্রি যাপনের জন্য এখানে রাখিয়া গিয়াছেন।" তখন বাটীর চারিদিক অনুসন্ধান করা হইল; কিন্তু বালিকার আর সন্ধান মিলিল না। রামপ্রসাদের কালী মুখশুদ্ধির জন্য সেই অতিথির হাতে যে পান দিয়াছিলেন, প্রবাদ আছে যে, তেমন বৃহদায়তন বিশিষ্ট সুস্বাদু পান লোকসমাজে দৃষ্ট হয় না।

গল্পটী শেষ হইতেই আমাদের গ্রামে আসিয়া উপনীত হইলাম। যে যাহার বাড়ীতে গেল, আমরাও আপনার বাটী আসিলাম। বলা বাহুল্য আসিবার কালে গল্পের আমোদে হাঁটিবার কষ্ট আদৌ অনুভব করি নাই।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

সংবাদ ও সমালোচনা।

২য় বার্ষিক উৎসব। পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধিপতি—আমাদের ভারত সম্রাট শ্রীল যুক্ত পঞ্চম জর্জ্জ বাহাদুর ও তদীয় মহিষী শ্রীযুক্তেশ্বরী মেরী মাতার মঙ্গল কামনায় ১২ই ডিসেম্বর (১৯১১ খৃঃ অঃ) দিল্লীদরবারের স্মরণীয় দিনে অত্র শান্তি-আশ্রমে

"শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন" স্থাপিত হইয়াছে। আগামী ১২ই ডিসেম্বর বাঙ্গালা ২৭ শে অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবারে "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতনের দ্বিতীয় বার্ষিক উৎসব হইবে। তদুপলক্ষে ঐ দিন সম্রাট্ দম্পতীর মঙ্গল কামনায় পূজা, হোম, পাঠ ও প্রার্থনা এবং সমস্ত দিন ব্যাপী শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন হইবে। দরিদ্র নারায়ণগণকে সেবাপূজা করা হইবে।

ঐ দিন রাজকর্ম্মচারী ও বিশিষ্ট ভদ্রলোকগণ উৎসবে যোগদান করিতে পারিবেন না বলিয়া পরবর্তী রবিবারে—৩০শে অগ্রহায়ণ কার্য্যকরী সভার অধিবেশন হইবে। সভায় এক বৎসরের কার্য্য বিবরণ বিবৃত হইবে; আয়-ব্যয়, সাহায্যকারিগণের নাম এবং অনাথ-বালক ও বালিকাগণের পরিচয় প্রকাশিত হইবে। আমরা গ্রাহক, অনুগ্রাহক, পাঠক, সেবক ও ভক্তমণ্ডলীকে উৎসবে যোগদান করিতে সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিতেছি। আশাকরি দীন সেবকগণের নিমন্ত্রণ কেহ অগ্রাহ্য করিবেন না।

দান মাহাত্ম্য। আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম বাঙ্গালার কৃতীসন্তান শ্রীযুক্ত তারকনাথ পালিত মহাশয় বিজ্ঞান-শিক্ষা বিস্তারের জন্য পুনরায় সাতলক্ষ টাকা দান করিতে উদ্যত হইয়াছেন, শীঘ্রই সাধারণের সমক্ষে গভর্ণমেন্টের হাতে দানপত্র প্রদত্ত হইবে। ধন্য পালিত মহাশয়!—আপনার দান মাহাত্ম্যে বঙ্গ-ভূমি গৌরবান্বিত হইল—আপনার নাম সুবর্ণাক্ষরে জগদ্-গাত্রে অঙ্কিত রহিল। রামপ্রসাদ গাহিয়াছেন;—

জ্ঞান ধর্ম্ম শ্রেষ্ঠ বটে দান ধর্ম্মোপরি।
(ওমা) বিনা দানে মথুরা পারে যান নি ব্রজেশ্বরী॥

বিনিময়। কতকগুলি মাসিক পত্র ও পত্রিকার সহিত বিনিময়ার্থ আমরা আর্য্য-দর্পণ প্রেরণ করিয়া থাকি; তন্মধ্যে উদ্বোধন, ধর্ম্ম-প্রচারক, ব্রহ্মবিদ্যা, জগজ্জ্যোতি, বাঁশী, আলোচনী, পল্লীচিত্র হিন্দুসখা, সাহিত্য-পরিষৎপত্রিকা, অলৌকিক-রহস্য ও শান্তিকণা ব্যতীত অন্য কোন পত্রিকা আমরা বিনিময় পাই না। বোধহয় তাঁহারা আপনাদের পরিচালিত কাগজের সহিত বিনিময়ার্থ আর্য্য-দর্পণকে যোগ্য মনে করেন না; তাই আর্য্য-দর্পণ গ্রহণ করিয়াও বিনিময়ে নীরব ও নিশ্চেষ্ট। আমরা আরও এক সংখ্যা পাঠাইয়া আর্য্য-দর্পণ প্রেরণ করিতে ক্ষান্ত থাকিব। আশাকরি, সহৃদয় সংবাদপত্র পরিচালকগণ আমাদের ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

ঈশাবাস্যোপনিষৎ। এইখানি শুক্ল যজুর্ব্বেদের অন্তর্গত বাজসনেয় সংহিতোপনিষৎ। ঢাকা—ইষ্টবেঙ্গল প্রিণ্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস্ হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত রাইমোহন কাব্যতীর্থ এম্, এ, বি, এল কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও শাঙ্কর ভাষ্যাবলম্বনে অনুবাদিত। বাঙ্গালীর পক্ষে পুস্তকখানি উপযোগী হইয়াছে। মূল শ্লোকব্যতীত, সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করা হয় নাই। এমন কি শাঙ্কর ভাষ্যের অবিকল বঙ্গানুবাদ না দিয়া শাঙ্কর ভাষ্যস্থ প্রয়োজনীয় কথাগুলি সমস্ত রাখিয়া সেই সমুদায়ের পৌর্ব্বাপর্য্য ব্যতিক্রমে সুবিধামতে নানা প্রকারে গ্রথিত করতঃ তদবলম্বনে বঙ্গানুবাদ লিখিত হইয়াছে। যেখানে অর্থ পরিষ্কার হয় নাই সেখানে মন্তব্য ও অনুবাদকের নিজমত বলিয়া কিছু লেখা হইয়াছে। তাহাতেও ভগবান্ শঙ্করা-

চার্য্যের মতই গৃহীত হইয়াছে। আমরা পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আনন্দিত হইয়াছি। কাগজ, অক্ষর ছাপা সমস্তই সুন্দর। মূল্য ।/০ মাত্র।

ভগীরথ। ঢাকা—ইষ্ট-বেঙ্গল প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিসিং হাউস হইতে প্রকাশিত এবং শ্রীযুক্ত অতুল চন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। অতুল বাবু বঙ্গীয় সমাজে পরিচিত; তাঁহার ধ্রুব, শাক্যসিংহ, সর্ব্বানন্দ, অর্দ্ধকালী প্রভৃতি বইগুলির ন্যায় ভগীরথকেও বাঙ্গালী আদরে গৃহে স্থান দিবেন। ভগীরথের গঙ্গানয়ন উপাখ্যানাবলম্বনে ভগীরথ লিখিত। কীর্ত্তিবাসের রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। আবার সরল গদ্যেও উপাখ্যানাংশ লিখিত হইয়াছে। ভগীরথের গঙ্গা আনয়ন সম্বন্ধে কতকটা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাও প্রদত্ত হইয়াছে। তৎব্যতীত গঙ্গার ধ্যান, প্রণাম ও স্তবাদি যথাযথ লিখিত হইয়াছে। চির তুষারাচ্ছন্ন গঙ্গোত্রীর সরল বর্ণনা রামানন্দ ভারতীর "হিমারণ্য" হইতে গৃহীত হইয়াছে। হরিদ্বারে গঙ্গাদৃশ্য প্রভৃতি চিত্রগুলি মন-প্রাণ প্রফুল্লপ্রদ। মোটা মোটা নূতন অক্ষরে, সুন্দর কালীতে ও এ্যান্টিক পেপারে মুদ্রিত। অতুল বাবুর অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় ভগীরথও এ দেশের বালক-বালিকার উপযোগী হইয়াছে। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা। ইহা মহামহোপাধ্যায় ৺রাধাকৃষ্ণ সার্ব্বভৌম বিরচিত "তত্ত্বভাষা প্রকাশ" নামক স্মৃতি-সংগ্রহ-পুস্তকের অন্তর্গত। বঙ্গ ভাষায় এরূপ গ্রন্থ দুষ্প্রাপ্য। হিন্দুসখার সম্পাদক শ্রীযুক্ত রাজকুমার স্মৃতি-কাব্য-বেদতীর্থ মহাশয় প্রায় শতবৎসর পূর্ব্বের লিখিত একখানি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়া ইহা মুদ্রাঙ্কণ করিয়াছেন। পুথিখানি বহু প্রাচীন; কীটদষ্ট থাকায় অনেক স্থল অসম্পূর্ণ—থাকিয়া গিয়াছে। যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহাও নষ্ট না হয়, এই ভাবিয়া পণ্ডিত মহাশয় "যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং" ভাবে পুঁথিখানি মুদ্রন করিয়াছেন। এজন্য পণ্ডিত মহাশয় ধন্যবাদার্হ। স্মৃতিশাস্ত্রসেবী ব্যক্তিবর্গ ইহার এক এক খণ্ড গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়কে উৎসাহিত এবং প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত স্মৃতিশাস্ত্রের সমাদর করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। মূল্য ।৵০ আনা মাত্র।

গীতিকুঞ্জ। শ্রীযুক্ত রাজকুমার মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক বিরচিত; মূল্য ৵০ আনা মাত্র। নানা বিষয়ক কতকগুলি ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনামূলক সঙ্গীতে গীতি-কুঞ্জ সজ্জিত। শেষে তারকেশ্বরে প্রচলিত—গীতাবলীও সংগৃহীত হইয়াছে। সকল প্রকার সঙ্গীতই তৎ তৎ-বিষয়ক উদ্দেশ্য সিদ্ধির ও চিত্তদ্রবীকরণের প্রধান সহায়, তাহাতে আর অনুমাত্র সন্দেহ নাই, সুতরাং দেশে এরূপ সঙ্গীতের যতই সৃষ্টি হইবে, ততই মঙ্গল।

গানে অতি প্রাণভরা মধুরতা করে দান।
সম্মোহন মন্ত্র যেন সদা গানে মূর্ত্তিমান॥

জন্মভূমি।

—:০:—

বর্ষে পদার্পণ করিয়াছে। প্রতি মাসে ২।৩ ফর্ম্মায় বাহির হয়। ছাপা কাগজ সুন্দর। প্রত্যেক সাহিত্যামোদী ইহার গ্রাহক হইয়া অর্থব্যয় সার্থক করুন, মূল্য অতি সামান্য ১৲ টাকা মাতৃভাষার সেবাকল্পে বৎসরে অর্পণ করা কাহারও সাধ্যাতীত নহে। মূল্য হিসাবে হিন্দুসখা গ্রহণে অনেক লাভ। তাহার উপর আবার মাত্র ডাক মাশুল ।০ আনায় এক গাদা পুস্তক উপহার। সকলে সত্বর হউন।

ম্যানেজার হিন্দুসখা।

কৈকালা; কৈকালা পোঃ (হুগলী জেলা) বঙ্গদেশ।—অন্যান্য বিক্রেয় পুস্তক—হিন্দু-সখা কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য।

(১) তারকেশ্বর তথ্য—।৶০ আনা, বঙ্গের প্রাচীন তীর্থ ৺তারকেশ্বর ধামের নানা রহস্য-ময় ইতিহাস ও তীর্থ সংক্রান্ত যাবতীয় জ্ঞাতব্য।

(২) প্রায়শ্চিত্ত পঞ্চালিকা—।৵ আনা। বাঙ্গালা পদ্যে প্রাচীন স্মৃতি গ্রন্থ অভিনব পুস্তক।

(৩) প্রবন্ধ পুষ্পাঞ্জলী—৷৹ আনা। নানা ভাবের নানা তথ্যের নানা জ্ঞেয়বিষয়ের আলোচনা পূর্ণ প্রবন্ধের একত্র সমবায়।

(৪) গীতগোবিন্দ—৷৹ (পূর্ব্বার্দ্ধ ও উত্তরার্দ্ধ) ভক্তকবি রসময় দাসের পদ্যানুবাদ সহ জয়দেবের পদাবলী।

(৫) গীতিকুঞ্জ—৵ আনা। দেব দেবী ও আত্মতত্ব বিষয়ক গীতাবলী।

(৬) সামবেদসংহিতা—প্রতি খণ্ড ॥০ আনা। মন্ত্রগাণ ভাষ্যানুবাদাদি সমন্বিত। নানারঙ্গে মুদ্রিত। সুন্দর সংস্করণ।

—:0:—

Regd. No. D. 65.

৫ম বর্ষ। পৌষ। ৯ম সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ।

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

—:0:—

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। } { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।০ আনা।

বিনামূল্যে

—:০:—

হাঁপানী আরোগ্যের যন্ত্র দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক শক্তিপ্রভাবে আবিষ্কৃত এক অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগে দুরারোগ্য মহাযন্ত্রণাদায়ক হাঁপানী ব্যারাম অত্যাশ্চর্য্যরূপে অত্যল্পকালে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতেছে। উক্ত যন্ত্রস্থিত মহৌষধ নাসারন্ধ্রের যোগে টানিলে বক্ষঃস্থলে রোগের মূলস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রক্রিয়াকরতঃ ধূমবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া মলের দ্বারা দম বহির্গত হয় এবং হঠাৎ ফিট ও দুরূপসর্গাদি বন্ধ হইয়া হাঁপানী বিদ্যুতের ন্যায় দূর হইয়া যায়। রীতিমত ব্যবহারে নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। ব্যবহারের নিয়মাবলী ও সম্পূর্ণ চিকিৎসার ৪ আউন্স ঔষধাদি সহ যন্ত্রের মূল্য সডাক ৫২৲ টাকা। নূতন যন্ত্র ও ঔষধাদি বিক্রয়ার্থে আমার নিকটে সর্ব্বদা মজুত থাকে। অপরিচিত স্থলে প্রতিভূস্বরূপ ২৫॥৶ অগ্রিম প্রেরণ করিলে ১ সপ্তাহের জন্য যন্ত্রটী পরীক্ষার্থে পাঠান হয়। যন্ত্র ফেরত দিলে ডাকখরচ বাদ বক্রী ২৫৲ টাকা ফেরত দেওয়া যায় ও ঔষধের মূল্য গ্রহণ করা হয় না ইতি।

শ্রীরমণ চন্দ্র চৌধুরী
ডিপো ষ্টোর আফিস এ, বি, রে,
পোঃ আঃ লামডিং, জিলা নওগাঁও,
আসাম।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ৯ম সংখ্যা। | পৌষ। | বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

তৎপরে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। কালে আমি ঘটনাসূত্রে চীনিশপুর কালীবাড়ীর সেবাধিকার লাভ করিয়া স্বত্বাধিকারী হইয়াছি। কালের করাল দংষ্ট্রাঘাতে ভগ্নপঞ্জর ও ব্যথিতহৃদয় লইয়া আমি একাকী কালীবাড়ীতেই অবস্থিতি করিতেছি। আমি গৃহী নহি—কারণ গৃহিণী নাই, আমি সন্ন্যাসী নহি—কারণ বিবেক-বৈরাগ্যের ধার ধারি না; এমনি একটা স্রোতশ্চালিত-তৃণের ন্যায়—অশান্তহৃদয়ে শান্তিময়ীর চরণপ্রান্তে জীবনাতিবাহিত করিতেছি। কিন্তু রামপ্রসাদ কে?—অনুসন্ধান করিতে ভুলি নাই। জীবনের সমস্ত উদ্যম চেষ্টা—পরিশ্রম উহাতেই ব্যয় করিয়াছি। জীবনভরা সাধনায় যে সত্য নির্দ্ধারিত হইয়াছে, এই প্রবন্ধে তাহাই বিবৃত হইতেছে।

কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১৭৫ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ঢাকা জেলায় মহেশ্বরদি পরগণার অন্তর্গত চীনীশপুর গ্রামে সাধক শিরোমণি দ্বিজ রামপ্রসাদের অতীত কীর্ত্তিকাহিনী প্রতিভাত হইতেছে। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে চীনীশপুরের চতুর্দ্দিকে পোয়া মাইলের ভিতর লোকালয় ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না। এখনও অন্যান্য গ্রামানুপাতে স্থানীয় জনসংখ্যা নিতান্ত কম এবং বিশিষ্ট ভদ্রলোকের সংখ্যাও বিরল। এমন কি ২৫ বৎসর পূর্ব্বে এস্থান নিবিড় কণ্টকাকীর্ণ জঙ্গলে পূর্ণ ছিল; তখন এই কালীবাড়ীতে দিবাভাগেও কেহ একাকী আসিতে সাহসী হইত না। এক্ষণে চারিদিকে সমতল শস্যক্ষেত্র; স্থানটী পরম রমণীয় ও শান্তিপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। জলবায়ু স্বাস্থ্যকর; আহার্য্য দ্রব্যাদিও যথাসম্ভব পাওয়া যায়।

হাড়িধোয়া নদী কালীবাড়ীর পূর্ব্ব ও উত্তর-ভাগ বেষ্টন করিয়া পশ্চিমপ্রান্তে ব্রহ্মপুত্র নদের সহিত মিলিত হইয়াছে। অদূরে দক্ষিণ পূর্ব্বাংশে মেঘনা নদী; নরশিংদি ষ্টীমার ঘাট। বিদেশী লোক নরশিংদি ষ্টীমার ঘাটে নামিয়া কালীবাড়ী আসিয়া থাকেন। ষ্টীমার ঘাট হইতে কালীবাড়ী প্রায় ৩ মাইল;—কাঁচা রাস্তা আছে। সম্প্রতি কালীবাড়ীর পোয়া মাইল দক্ষিণ দিয়া টঙ্গী-ভৈরব রেল লাইন নির্ম্মিত হইতেছে। এই লাইনে যাত্রিগণের যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হইবে।

এই সিদ্ধপীঠে জাতিবর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলেই পূজা দিয়া থাকে। প্রতিদিনেই লোক সমাগম হইয়া থাকে; তবে শনি-মঙ্গলবারে যাত্রীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়। বৈশাখীয় অমাবস্যা-তিথিতে রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করেন বলিয়া বৈশাখ মাসের প্রতি শনি-মঙ্গলবারে—বিশেষতঃ অমাবস্যার দিন বিশেষ জাঁক-জমকের সহিত মায়ের পূজার্চ্চনা হইয়া থাকে। এই সময় অত্যাধিক পরিমাণে লোকসমাগম হইয়া থাকে। এখানে আসিলে হৃদয় ভক্তিরসে আপ্লুত ও প্রাণ স্বর্গীয়ভাবে বিভোর হইয়া যায়।

আমার অনুসন্ধানের সূত্র।

কালীবাড়ীর সত্বাধিকার প্রাপ্ত হইয়া জীবনের প্রথম উদ্যমেই আমি দেবালয়ে অবস্থিতির স্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া লইলাম। বুড়ী-দিদি, গঙ্গার মা, মুক্তর মা, জয়মণি প্রভৃতির মুখে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে শ্রুতকাহিনীগুলি মনে পড়িল; আমার অনুসন্ধিৎসাবৃত্তি জাগিয়া উঠিল। সংসারে আমার কোন কাজ না থাকায়, ইহাকেই জীবনের অবলম্বন করিয়া রামপ্রসাদ সম্বন্ধে সত্য তথ্যসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ধীর ও স্থির ভাবে জীবন-ব্যাপী সাধনার ফলে, আমি রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যে সকল সত্য তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছি, নিম্নে তাহাই লিখিত হইল। আশা আছে, চিন্তাশীল বিজ্ঞ পাঠক মাত্রেরই ইহা হৃদয় স্পর্শ করিবে।

১। দিনার্দ্দি নিবাসী মৃত কালীকুমার চক্রবর্ত্তীর পুত্র শ্রীযুক্ত অশ্বিনীকুমারের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি যে,—চীনীশপুরের সিদ্ধপীঠ ব্রাহ্মণকুলজাত রামপ্রসাদের; দীন ও দ্বিজ-ভণিতার অধিকাংশ গানগুলি এই ৺ চীনেশ্বরী কালীর সাধক দ্বিজ রামপ্রসাদের রচিত। অশ্বিনীর প্রপিতামহ ও খুল্ল প্রপিতামহ সর্ব্বদা চীনীশপুর রামপ্রসাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। ইহাঁরাও সাধক ছিলেন; খুল্ল-প্রপিতামহ অক্ষয়রাম চক্রবর্ত্তীই রামপ্রসাদের সংগৃহীত নিমকাঠ আনিয়া দিনার্দ্দি নিজ বাটীতে কালী স্থাপনা করেন। অশ্বিনীর পিতা ত্রিপুরার রাজ-সরকারে ডেপুটী কালেক্টর ছিলেন; তিনি এদেশ প্রচলিত অনেক প্রসাদী গান সংগ্রহ করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিবার জন্য আগরতলা লইয়া যান। কিন্তু দৈবদুর্ব্বিপাকে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, উপরন্তু পাণ্ডুলিপি খানা হারাইয়া যায়।

এ সকল বৃত্তান্ত অশ্বিনী শিশুকালেই অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতাও অবগত ছিলেন।

২। দিনার্দ্দি নিবাসী মৃত কমলাকান্ত চক্রবর্ত্তীর মুখে অবগত হইয়াছি যে, তাঁহাদিগের বাটীতে অতি প্রাচীনকালের হাতে লেখা-প্রসাদী গান ছিল, অকর্ম্মণ্য কাগজ বোধে তিনি তাহা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছেন।

৩। আমার পিতাঠাকুরের বয়স ৮০ বৎসর। একদা আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, "আপনি বলিতে পারেন কি, পর্য্যায়ক্রমে কাহার পর কে রামপ্রসাদের কালীবাড়ীর সত্ত্বাধিকারী হইয়াছিলেন ?

"না পারিবার কথা কি ? পাঁচ সাত পুরুষের কথা বইত না," বলিয়া পিতৃদেব আরম্ভ করিলেন ;—

চীনিশপুরের সন্নিকটে চৌধুরীপাড়া গ্রামে জয়নারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক দীন ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। রামপ্রসাদ চীনীশপুরে অবস্থানকালে দেবীর আদেশে জয়নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। দেব্যাদেশপ্রাপ্ত রামপ্রসাদ পঞ্চমুণ্ডীর আসন প্রস্তত করিয়া স্বশক্তি সহ শক্তি সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। রামপ্রসাদের বাড়ী কোথায় ছিল জানি না; বোধহয় আত্মগোপনই তাঁহার প্রকৃত পরিচয় প্রাপ্তির প্রধান অন্তরায়। রামপ্রসাদের বিবাহের অল্পপরেই জয়নারায়ণ পরলোক গমন করেন। রামপ্রসাদের মাত্র একটী কন্যা জন্মে; তাঁহার নাম—জগদীশ্বরী। ব্রাহ্মণদি নিবাসী কেবলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহাঁকে বিবাহ করেন। জগদীশ্বরীর গর্ভে শম্ভুচন্দ্র ও মধুসূদন জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; মধুসূদনের ভৈরবী নাম্নী একটী কন্যা এবং কালীদাস, রাধানাথ ও জগন্নাথ নামে তিনটী পুত্র হয়। কিন্তু পুত্র তিনটী নিঃসন্তান পরলোক গমন করেন; মাধবদির রামনরসিংহ পাকড়াশী ভৈরবীকে বিবাহ করেন। তাঁহার কন্যা বিশ্বেশ্বরী আমার গর্ভধারিণী—আমি মাতামহের উত্তরাধিকার সূত্রে চীনীশপুর কালীবাড়ীর সত্ত্বাধিকারী হইয়াছি।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম "উত্তরাধিকার সূত্রে ব্রাহ্মণদির বাড়ীখানা আপনার দখলে আছে কি ?"

পিতা। না। ঐ বাড়ী বিক্রয় হইয়া গিয়াছে; ব্রাহ্মণদি নিবাসী ডাক্তার শ্রীযুক্ত কামিনীকিশোর চক্রবর্ত্তীর বসতবাটীই জগদীশ্বরীর স্বামী কেবলচন্দ্রের ছিল।

আমি। ঐ বাড়ী ব্যতীত কি তাঁহাদের অন্যান্য সম্পত্তি ছিল না ?

পিতা। হয় ছিল, উহা কতক জগন্নাথ চক্রবর্ত্তী—কতক আমার মাতুল বিক্রয় করিয়াছিলেন; আমার যৎসামান্য কিছু হস্তগত হইয়াছে।

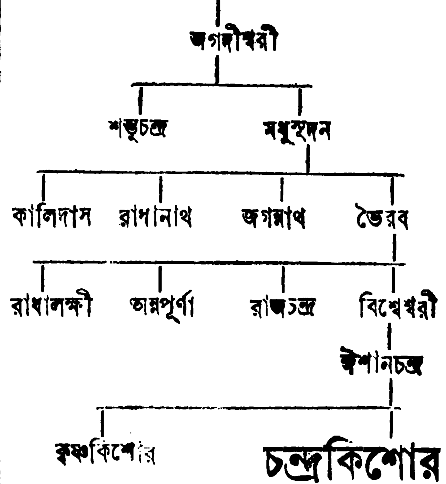
আমি। আপনার কথানুসারে কালীবাড়ীর ষোলআনা সত্ত্বই আমাদের হওয়া কর্ত্তব্য;—তবে আপনি অর্দ্ধাংশের মালিক কেন ?

পিতা। শ্রীনারায়ণ চক্রবর্ত্তী নামে এক ব্যক্তি চীনীশপুরের কালীবাড়ীর সেবায়েত ও জয়নারায়ণের পুত্র পরিচয় দিয়া জমিদার প্রদত্ত জায়গীরের মালীক হইয়া বসিলেন। স্থানীয় কর্ম্মচারীদিগকে বাধ্য করিয়া লোভ বশতঃ শ্রীনারায়ণ চতুরতাক্রমে রামপ্রসাদের দৌহিত্র শম্ভুচন্দ্রকে বঞ্চনা করিলেন। নিঃসহায় শম্ভুচন্দ্র অনন্যোপায় দেখিয়া অগত্যা জমিদারের শরণাপন্ন হইলেন। জমিদার রহস্য নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া উভয়পক্ষের সম্মতিক্রমে দেবোত্তর ও জায়গীরাদি উভয়কে সমান ভাগে বিভক্ত করিয়া দিলেন। সেই বিভাগানুসারে শম্ভুচন্দ্রের অর্দ্ধাংশ আমরা এবং শ্রীনারায়ণের অর্দ্ধাংশ রূপনাথ, কৈলাশ, ঈশান ।/০ আনা ও গোবিন্দ ৵০ ভোগ করিতেছে।

এই সকল সম্পত্তি লইয়া কত মামলা মোকদ্দমা হইয়া গিয়াছে, কতবার বাকি খাজনার নীলামে বিক্রয় হইয়াছে, কত দান বিক্রয় চলিয়াছে, হাইকোর্ট পর্য্যন্ত মোকদ্দমা করিতে হইয়াছে। সেই সকল দলিল দস্তাবেজ, দানপত্র, বিক্রয় কবলা কিছু কিছু আমাদের ঘরেও সংগৃহীত আছে। তুমি তাহা দেখিলে সকল সন্দেহ মিটিবে। আমি এই সকল কথা আমার মাতামহ ও মাতুলের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি।

আমি পিতৃদেবের নিকট হইতে সেই সমস্ত দলিলপত্র লইয়া বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া তাঁহার সকল কথাই প্রামাণ্য বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছি। ঐ সকল দলিলের সহিত অনেক প্রাচীন ব্যক্তির সাক্ষ্য ও জবানবন্দি পাওয়া যায়। তাহা পাঠ করিলেই বুঝিতে পারা যায়, চীনীশপুর কালীবাড়ীর রামপ্রসাদই প্রসিদ্ধ প্রসাদী সঙ্গীত রচয়িতা এবং ব্রাহ্মণ বংশজাত। আমি তদ্দৃষ্টে যে উত্তরাধিকারীর তালিকা প্রস্তুত করিয়াছি, তাহাও সঙ্গে প্রদত্ত হইল। রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশজাত হইলে আমরা কখনও তাঁহার সম্পত্তির মালিক হইতে পারিতাম না। *

* এই সকল দলিল পত্র কেহ দেখিতে বাসনা করিলে, আমি সাদরে তাহা দেখাইতে প্রস্তুত আছি।



আমার ভ্রাতা কৃষ্ণকিশোর স্বর্গগত, আমিই অর্দ্ধাংশের মালীক অপর অর্দ্ধাংশের উত্তরাধিকারিগণের নামের “পর্য্যা” বাহুল্য বিবেচনায় প্রদান করিলাম না।

(ক্রমশঃ।)

—:0:—

দীননাথের দয়া।

সুবোধ সরল শিশু পাঠশালে পড়ে,
বিজন কানন পথে যেতে হয় দূরে।
একা একা পথে যেতে মনে পেয়ে ভয়
বাড়ী এসে মাকে শিশু সব কথা কয়।
চাঁদ মুখে চুমো দিয়ে বলেছে জননী,
একা বলে মিছা ভয় কর যাদুমণি।
দীননাথ দাদা তোর পাছে পাছে চলে,
ভয় হলে ডেকো তাঁকে নিবে এসে কোলে।

সাহস বাড়িল তার, মা’র কথা শুনি;
পরদিন পাঠশালে চলে যাদুমণি।
বন মাঝে এসে শিশু মনে পেয়ে ভয়,
ডাকে “দাদা দীননাথ কোথা এ সময়”।
সরল শিশুর ডাকে দীননাথ হরি,
আসিয়া নিকটে তার শিশু বেশ ধরি;
বলিল মধুর ভাষে, “কোন ভয় নাই;
এই আমি সাথে এস পাঠশালে যাই।

আপদ বিপদে যদি পড় তুমি ভাই,
ডাকিও আমাকে; দেখা পাইবে সদাই।"
সেই দিন হ'তে শিশু গলাগলি ধরে,
যাইত দাদার সাথে পাঠশালা ঘরে।
তাহার দাদার মত দাদা আছে যার,
ধরাধামে তার মত কেবা সুখী আর।

দয়াময় দীননাথ সবে ভালবাসে
ডাকিলে আসেন তিনি সকলের পাশে
কায়মনে ভগবানে নিতি ডাকে যারা,
সার্থক জীবন ধরে, ধন্য ভবে তারা।

শ্রীমতী ননীবালা বসু।

—:0:—

উদ্দীপনা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

হায়, হায়! সেই প্রেমময় কেবল মাত্র তোমার প্রেম আস্বাদন করিবার জন্যই তোমাকে মোহিত করিয়া উন্মত্ত আকাঙ্খার রাজ্যে ছাড়িয়া দিয়াছেন; তিনি সকল সময়ে সকল বর্ণের আশ্রয় স্বরূপ, সকল জাতির অবলম্বন স্বরূপ। তিনি পুরুষ কি স্ত্রী তাহা কেহ জানে না, তিনি বালক কি বৃদ্ধ তাহা কেহ জানে না, কিন্তু দৃশ্য জগতের সর্ব্বত্রই সকল সময়ে স্ত্রীত্ব ও পুংস্বের দ্বৈতভাব কলাইয়া, চির-নূতন ও চিরপুরাতন বিশ্বব্যাপক হইয়া রহিয়াছেন। জগতের এই পুরুষত্ব ও স্ত্রীত্বের মধ্যে তিনি বিভক্ত হইয়া রহিয়াছেন এবং অপার করুণারগুণে পুরুষভাবপুষ্ট জীবের নিকটে স্ত্রীরূপে এবং স্ত্রীভাবাপন্ন জীবের নিকটে পুরুষরূপে প্রতিভাত হইতেছেন। ভারতের এক শুভ যুগে প্রভাত কিরণোজ্জল গঙ্গাস্রোতে স্নাত মহির্ষি সন্তান তাঁহার নিকট প্রার্থনাকরিয়াছিলেন,—

মাত স্তাত বদেহো জননী।
জঠরস্থ স্তাবদা লব্ধদেহ।

ত্বং কর্ত্রী কারয়িত্রী করণ-
গুণময়ী কর্ম্ম হেতুস্বরূপা।
ত্বং বুদ্ধি শ্চিত্ত সংস্থাপ্যাহমপি-
ভবিতা সর্ব্বমেতৎ ত্বদর্থং।
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে॥

ত্বং ভূমি স্ত্বং জলৌঘ স্ত্বমসি—
হুত বহস্ত্বং জগৎ ব্যোমরূপা।
ত্বঞ্চাকাশো মনশ্চ প্রকৃতিরূপী
মহৎ পূর্ব্বিকাহং কৃতিশ্চ॥
আত্মা এবাসি মাতঃ পরমসি
ভবতী ত্বৎপরং নৈব কিঞ্চিৎ।
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে

ত্বং কালী ত্বঞ্চ তারা ত্বমসি—
গিরিসুতা সুন্দরী ভৈরবী ত্বং।
ত্বং দুর্গা ছিন্নমস্তা ত্বমসি চ
ভুবনা ত্বং হি লক্ষ্মী শিবাত্বং॥
ধুমা মাতঙ্গী নিত্যা ত্বমসি চ
বগলা হিঙ্গুলাখ্যা ত্বমেব।
ক্ষন্তব্যো মেহপরাধঃ প্রকটিত বদনে কামরূপে করালে

আবার একদিন গাইয়াছেন;—

উপমে সর্ব্ব সাধ্বীনাং
দেবীনাং দেব পূজিতে।

ত্বয়া বিনা জগৎ সর্ব্বং
মৃত তুল্যঞ্চ নিষ্ফলং ॥
সর্ব্ব সম্পদ স্বরূপা ত্বং
সর্ব্বেষাং সর্ব্ব রূপিণী।
রাসৈশ্বর্য্য ধি দেবী ত্বং
ত্বৎ কলা সর্ব্ব যোষিতাঃ ॥

আবার গাহিয়াছেনঃ—

রাধা রাসেশ্বরী রম্যা
পরমা চ পরাত্মিকা।
রাসোদ্ভবা কৃষ্ণকান্তা
কৃষ্ণ বক্ষঃস্থল স্থিতা ॥

সেই বিশ্ব প্রসবিনী মহামায়ার মাতৃত্ব উপলব্ধি করিয়া শিশু সন্তানের ন্যায় আকুল প্রাণে তাঁহার প্রার্থনা করিয়াছেন, আবার একদিন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নাপ্লাবিত যামিনীতে হাস্যতরঙ্গময়ী স্রোতস্বিনীর তীরে হাস্যময় কানন কুসুম শোভায় প্রফুল্লিত হইয়া প্রেমাকুলকণ্ঠে তাঁহার মধুর ভাবের লীলা-কীর্ত্তন করিয়াছেন। পুরুষ-ভাবপুষ্ট জীব মাতৃত্ব ও স্ত্রীত্বের মধ্যে তাঁহার বিকাশ সন্দর্শন করিয়াছে; আবার স্ত্রী-ভা পুষ্ট জীব তাঁহাকে পতিত্ব ও পুত্রত্বের মধ্যে উপলব্ধি করিয়াছে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া সেই প্রেমময়ের জননীত্ব, রমণীত্ব, পুত্রত্ব ও পতিত্ব ছড়াইয়া পড়িয়াছে; জীব মাতৃভাবে ও সখাভাবে তাঁহাকে সম্ভাষণ করিতেছে। এইযে দুর্দ্দমনীয় পিপাসায় জগতে স্ত্রী পুরুষ পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইতেছে, এই পিপাসার মধ্যে থাকিয়া পুরুষ স্ত্রীজাতির জননীত্ব ও রমণীত্ব উপলব্ধি করিয়াছে এবং স্ত্রী পুরুষ জাতির পুত্রত্ব ও পতিত্ব উপলব্ধি করিয়াছে। জীব এই জননীত্ব, রমণীত্ব, পুত্রত্ব পতিত্বকে বরণ করিবার জন্য সর্ব্বদা আকুল; কিন্তু ভাবিয়া দেখিতেছে না যে, যাহাকে জননী কিম্বা রমণী রূপে পাইলে, পুত্র কিম্বা পতিরূপে পাইলে, সকল আকুলতার অন্ত হইয়া যায়, সমস্ত আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি হইয়া যায়, হৃদয়ের মরুভূমিতে প্রেমের মহাপ্লাবন বহিয়া যায়, জীব চিরশান্তির ললিত রাজ্যে বিচরণ করে, তাঁহাকে সেই প্রাণারাম জীবনমঙ্গল হৃদয়-সর্ব্বস্বকে জননী, রমণী, পুত্র ও পতির মধ্যে প্রতিভাত না পাইলে জীব কেবল অতৃপ্ত-লালসার দানবীয় রাজ্যের ক্রীতদাস হয় এবং কালের আবর্ত্তনে শাস্ত্রজ্ঞানী পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্রাহ্মণপ্রভু ইন্দ্রিয়বশ্যতা হেতু প্রেমকে কামের কালিমায় কলঙ্কিত করিয়া তুলে। আজি এই অধঃপতনের দিনে পাপ-মলিন কুটীলচক্রী জীব প্রেম বহির্ভূত হইয়া ধর্ম্মের ভানে কামকে আলিঙ্গন করিতেছে আর জীবজগৎ নিম্ন হইতে নিম্নতর স্তরে দ্রুতপদে নিপতিত হইতেছে। হায়, হায়! চক্ষু থাকিতেও অন্ধ হইয়া, বুদ্ধি থাকিতেও নির্ব্বোধ হইয়া, জীব দেখিতেছে না এবং বুঝিতে পারিতেছে না যে, জননীত্বের পূর্ণ উপলব্ধি না করিয়া রমণীত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না, সর্ব্ব বিশ্বময় বিশ্বজননীর বিরাট-সত্তা উপলব্ধি না করিলে সর্ব্বভূতাশ্রয়া হ্লাদিনী-স্বরূপা রমণীত্বের উপলব্ধি হইতে পারে না। জীব অজ্ঞানমোহে আচ্ছন্ন হইয়া বুঝিতেছে না যে, বৃন্দাবনের চির মধুর প্রেমের রাজ্য কৈলাসের নির্ভর সম্বল মাতৃরাজ্য হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, প্রেম চিরকাল কামগন্ধহীন বাৎসল্যের রসে স্নিগ্ধ রহিয়াছে। আমরা জ্ঞানের অহঙ্কার, বুদ্ধির অহঙ্কার করি কিন্তু, হায় হায় নিতান্ত নির্ব্বোধ হইয়া, নিজের স্বার্থ, নিজের মঙ্গল, নিজের আকাঙ্ক্ষিতের বিষয় অনুভব করিতেছি না। কোথাকার যাত্রী আমরা

কোথায় যাইতেছি, কিসের পিপাসী আমরা কিসের পশ্চাৎ তীব্রবেগে ছুটিয়াছি একবার কেহ ভাবিতেছি না, একবার কেহ সুস্থমনে স্মরণ করিতেছি না। তাই আজি প্রাণের গভীরতম প্রদেশ হইতে প্রশ্ন উত্থিত হইয়াছে—আমি কোথায় যাইতেছি। এই জিজ্ঞাসার মিমাংসায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিরাট ইতিহাস উন্মুক্ত হইয়া যায়, সৃষ্টিরহস্যের ক্ষুদ্রতম পরমাণু হইতে বৃহত্তম জ্যোতিষ্মান সূর্য্য পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয় চিন্তার আশ্রয়ীভূত হয়, জীবের ভ্রান্তিমুগ্ধ গতি পরিণতির স্রোত বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রহেলিকা উৎপন্ন করে এবং জীবজগৎময় কামের বীভৎস গন্ধ বিকট উন্মত্ততা জাগাইয়া উত্থিত হয়। আজি আমি এই স্থলে দণ্ডায়মান হইয়া সভ্যগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আজি এই সভায় উপবিষ্ট জ্ঞানবৃদ্ধ, বয়োবৃদ্ধ ভদ্রমহোদয়গণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, মায়ের মন্দিরের বারান্দায় উপবিষ্টা জগন্মাতারূপিণী ভদ্রমহিলাগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, জীবন পথের প্রথম পথিক ঐ সকল বালকগণকে জিজ্ঞাসা করিতেছি—একবার বল দেখি তোমরা কোথায় যাইতেছ। বর্ষের পর বর্ষ ক্রীতদাসের ন্যায় আহার নিদ্রা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বৃত্তির বশীভূত হইয়া জীবন যাপন করিতেছ, একবার ভাবিয়াছ কি কোথায় যাইতেছ? আজ দেশের গৃহে গৃহে অলক্ষ্মীর রাজত্ব বিস্তৃত হইয়াছে, গৃহে গৃহে আজ অবিদ্যার প্রভাব লক্ষিত হইতেছে শান্তি লাঞ্ছিত হইতেছে, অশান্তির উচ্ছৃঙ্খলমূর্ত্তি গৃহপ্রাঙ্গনে নৃত্য করিতেছে, নিরানন্দের তপ্তবাতাস সর্ব্বত্র শ্মশান করিয়া ফেলিতেছে। আজ পুত্রের সম্মুখে জননীর বিলাসিনী মূর্ত্তি, পিতার সম্মুখে পুত্রের উদ্ধতমূর্ত্তি, কন্যার সম্মুখে পিতার লম্পট মূর্ত্তি নির্লজ্জ ভাবে প্রকটিত হইতেছে। আজ মৃণালিনীবান্ধব নামধেয় পুত্রের জননীর নাম চাতকচিত্তহরা দেবী, আর কামিনী-মনোরঞ্জন নামধেয় পিতার কন্যার নাম বিলাসিনী দেবী। হায়, হায়! পীনোন্নত-পয়োধরা রমণী বক্ষোপরি বিলাসদৃষ্টি আকর্ষক সুবর্ণ পুষ্পগুচ্ছ স্থাপিত করিয়া পুত্রের সম্মুখীন হইতে কিছুমাত্র লজ্জিতা হইতেছে না, আর ইন্দ্রিয়ের অসংযত ব্যবহার করিয়া বক্র মেরুদণ্ড কোটরগত কালিমাবেষ্টিত চক্ষু লইয়া পুত্র জননীর সম্মুখে বিলাসগন্ধমাখা দেহ মন লইয়া দাঁড়াইতে কিছুমাত্র শঙ্কিত হইতেছে না। আর সন্ধ্যা সকালে মৃদু মধুর ঝঙ্কারে ভগবানের স্তুতিগান উত্থিত হয় না, আর আরতির তূর্য্যধ্বনি জগতের মহামঙ্গল প্রচার করে না; দেবমন্দির সকল শ্মশানে পরিণত হইয়াছে, শান্তিরআশ্রম বৈষয়িক কোলাহলে মুখরিত হইয়াছে। আজ অসাধুতা পুরুষকার নামে অভিহিত হইতেছে এবং সাধুতা দুর্ব্বলতা বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। আজ আমি বৃদ্ধের কাছে প্রশ্ন করিতেছি, তুমি যে এই বালককে নির্ব্বোধ কহিয়া তাহার সম্মানপাত্র হইবার জন্য লালায়িত, একবার বিবেচনা করিয়াছ কি তুমি উহাপেক্ষা কিসে কোনগুণে অধিক গুণবান? তুমি ত তোমার জীবন প্রবাহের সত্তর বৎসর বৃথাব্যয়ে ব্যয়িত করিয়াছ, মহিষের গলঘণ্টাধ্বনি তোমার শ্রবণ পথের নিকটস্থ হইতেছে, নিজের হিতার্থে ত কিছুই করিলে না, আর এই বালক পাঁচ বৎসর যাবৎ মাতৃগর্ভ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে, নিতান্ত অজ্ঞান হইলেও ইহার জীবন পাপ-

মলিনতায় কলুষিত হয় নাই, জিজ্ঞাসা করি তুমি উচ্চ না এই বালক উচ্চ ? হায়, হায় ! বৃদ্ধ আজ মদান্ধ হইয়া অজ্ঞানান্ধ বালকের স্থান অধিকার করিয়াছে আর বৃদ্ধের অসংযত যথেচ্ছাচারের দৃষ্টান্ত পাইয়া উন্মার্গগামী হইতেছে। তাই আজ হৃদয়ের হৃদয় হইতে ঘন ঘন রবে প্রশ্ন উত্থিত হইতেছে—তুমি কোথায় যাইতেছ ? বিভ্রান্তচিত্তে উন্মত্তের ন্যায় তুমি চলিয়াছ, একবার তিলেকমাত্র সমাহিতচিত্ত হও, আজিকার এই কোটী অমঙ্গলের মধ্যদিয়া মঙ্গলবাণী উত্থিত হইতেছে— 'উত্তিষ্ঠত জাগ্রত, প্রাপ্যবরান্নিবোধত'। আজ দেশে দেশে ব্রহ্মচারীর আশ্রম স্থাপিত হইয়াছে, দেশে দেশে মহোদ্ধার মন্ত্র প্রচারিত হইতেছে, আজ আবার সন্ন্যাসীর প্রেমবাহু জীবগণকে আলিঙ্গন করিবার জন্য আহ্বান করিতেছে, আবার দীক্ষার সময় উপস্থিত হইয়াছে, আর কালবিলম্ব করিবার অবসর নাই, ধৈর্য্যের সহিত পর্য্যায় ধরিয়া অগ্রসর হও। একবার দীক্ষিত হও, মহাশক্তি মহা-প্রেমরূপ উপহার লইয়া তোমাকে বরণ করিবেন, জীবন তোমার ধন্য হইয়া যাইবে—মধুময় হইয়া যাইবে—আনন্দময় হইয়া যাইবে। এই পুণ্যক্ষেত্র ভারতবর্ষের পূর্ব্বকার মনস্বী মহর্ষিগণ জীবনের সকল ভোগবিলাস—বাঞ্ছা বর্জ্জন করিয়া সহস্র বর্ষব্যাপী তপশ্চরণ দ্বারা ভগবানের প্রসাদ লাভ করিয়াছিলেন এবং আমাদিগের মত ত্রিতাপক্লিষ্ট উচ্ছৃঙ্খল ও শক্তিহীন জীবগণের জন্য সরলতম চরম ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। রোগী, ভোগী, দুঃখী, ধনী, নির্ধন, ব্রাহ্মণ ও চণ্ডাল সকলের জন্য সমান অধিকার রহিয়াছে। একবার প্রাণের কথা ব্যক্ত করিয়া শ্রীগুরুর চরণাম্বুজে আশ্রয় গ্রহণ কর, একবার প্রপন্ন হইয়া শ্রীগুরু সমীপে অধিষ্ঠিত হও—একবার মহামন্ত্রে দীক্ষিত হও—প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্মমুখী প্রবৃত্তি বিকাশ প্রাপ্ত হইবে—পবিত্রতার শত-উৎসপ্রবাহ হৃদয় তোমার শান্তির ধারায় প্লাবিত করিবে—নিজে ধন্য হইবে—অপরকেও ধন্য করিবে।

ওঁ শান্তি ওঁ।

—:0:—

সাধক-সঙ্গীত।

[৭]

কে রণ শিখালে তোরে জননি !
কে তোরে সাজালে উন্মাদিনী ;—কার মন্ত্রনায় ম'জে,
সুরাসুর মাঝে, হয়েছিস্ উলঙ্গিনী ॥
কেবা আসি মা তোর করে দিল অসি, অতসী লাবণ্যে কে ঢালিল মসী,
কে ধরালে মা তোর শিরে অর্দ্ধশশী, কে ক'র্‌লে মুক্তকেশিনী ॥

চারিদিকে দেখি বেষ্টিতা ডাকিনী, কে পরালে নর করের কিঙ্কিনী;
সতী হয়ে রণে এসে একাকিনী, কিনিলি নাম কলঙ্কিনী;—
পতিব্রতা হয়ে কাজ করিলি কাঁচা, শিখিলি পতিতপাবন পতির বক্ষে নাচা,
কে শিখালে ভালে অনল শিখা ধরা, ধরাধরের নন্দিনী।
কার মন্ত্রনায় ম'জে অধীর হলি এমন, কে শিখালে তোরে দানব-রুধির সেবন,
হুহুঙ্কার রবে হয় যে বধির শ্রবণ, শিখিলি কোথায় এমন ধ্বনি;
কেন বিকট অধর দেখি ভূধরবালা, কে পরালে গলে নরমুণ্ড মালা,
কে শিখালে দিতে গোবিন্দেরে জ্বালা, জ্বালামুখী বল্ তা শুনি॥

———:0:———

ভাব ও তাহার সাধনা।

ভাবনা বিষয়ে অনন্তবুদ্ধি হইয়া ভক্তগণ হৃদয় মধ্যে দৃঢ় সংস্কার দ্বারা যাহাকে ভাবনা করেন, তাহার নাম ভাব। সুতরাং ভাব বলিলে ভগবান্‌কেই বুঝাইয়া থাকে; তাই সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে যে, "ভাবরূপী জনার্দ্দন।" সুতরাং ভগবান্‌কে লাভ করিতে হইলে সেই ভাবেরই আশ্রয় গ্রহণ কর্ত্তব্য। এই ভাব পাঁচ প্রকার; যথা—শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। শান্তাদি পাঁচটী ভাব প্রধানীভূতা ভক্তির এবং দাস্যাদি চারিটী ভাব কেবলাভক্তির অন্তর্গত। ভক্তগণের ভেদ বশতঃ ভাব এই পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়া থাকে। এই পাঁচটী ভাব পর পর শ্রেষ্ঠ; যেরূপ আকাশাদি পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূতের গুণ পর পর ভূতে পর্য্যবসিত হয়; তদ্রূপ দাস্যে-শান্তি, সখ্যে-শান্ত ও দাস্য, বাৎসল্যে-শান্ত, দাস্য ও সখ্য এবং মধুরে—শান্ত, দাস্য সখ্য ও বাৎসল্য এই চারিটী ভাবই বর্ত্তমান আছে। যথাঃ—

গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতিরসে।
শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে॥
আকাশাদির গুণ যেমন পর পর ভূতে।
দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

এই পঞ্চবিধ ভাবের ভিন্ন ভিন্ন স্থায়ীভাব আছে। দাস্যে শান্তির স্থায়ীভাব, সখ্যে দাস্যের স্থায়ীভাব, বাৎসল্যে সখ্যের স্থায়ীভাব এবং মধুরে ভাব চতুষ্টয়ই পর্য্যবসিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার একটী কথা আছে,—আকাশাদি ভূত পর পর ভূতে অনুস্যূত হইয়া পঞ্চীকরণ রূপে এই জগৎ প্রপঞ্চের এবং তাহা হইতে স্থূল শরীরের উৎপত্তি হইয়াছে,—আকাশাদি ভূত যেমন পঞ্চীকরণ সমবায়ে স্থূলের উৎপত্তি করিয়াছে,—তেমনি শান্তাদি ভাবও ক্রমে ক্রমে অনুস্যূত হইয়া জীবহৃদয়ে মধুররস রূপে বিদ্যমান আছে। এই জন্য মধুরভাব সর্ব্ব শ্রেষ্ট; কারণ এই ভাবে ভগবৎপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। তাই

কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন ;—

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেম হৈতে।
এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে॥
শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

শান্ত ভাব। বক্ষ্যমান বিভাবাদি দ্বারা শমতাসম্পন্ন ঋষিগণ কর্ত্তৃক যে স্থায়ী শান্তি-রতি আস্বাদনীয় হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকে শান্তিভক্তি-রস বা শান্তভাব বলিয়া বর্ণনা করেন। যথাঃ—

বক্ষ্যমানৈ বিভাবাদ্যৈঃ শমিনা স্বাদ্যতাং গতঃ।
স্থায়ী শান্তিরতি র্ধীরৈঃ শান্তিভক্তিরস স্মৃতঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

যোগিগণের প্রায় ব্রহ্মানন্দরূপ সুখস্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, কিন্তু এই সুখ অতি অল্পতর, আর সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ স্ফুর্ত্তিরূপ যে ঈশময় সুখ তাহাই প্রচুরতর। এই ঈশ ময় সুখেতেও শ্রীবিগ্রহের সাক্ষাৎকার তাই গুরুতর হেতু, দাস্যাদির ন্যায় মনোজ্ঞত্ব লীলাদির সাক্ষাৎকারে গুরুতর হেতু হয় না। অর্থাৎ—আত্মারাম মুনিগণ কেবল ভগবৎ সাক্ষাৎকার মাত্রেই কৃতার্থ হইয়া থাকেন, লীলাদিতে তাঁহাদের দাসাদির ন্যায় রুচি উৎপন্ন হয় না। যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, দ্বেষ নাই, মাৎসর্য্য নাই এবং সকল ভূতে সমভাব, তাহাকেই শান্তভাব বলে। সনকাদি ব্রহ্মর্ষিগণ শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

শান্তভাবে শান্তিরতি স্থায়ী ভাব। এই শান্তিরতি সমা ও সান্দ্রাভেদে দুই প্রকার হয়। অসম্প্রজ্ঞাত নাম সমাধিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের নাম সমা এবং সর্ব্বপ্রকার অবিদ্যাধ্বংশহেতু নির্ব্বিকল্প সমাধিতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার হইলে সর্ব্বতোভাবে ভক্তহৃদয়ে যে আনন্দ আবির্ভূত হয়, তাহাই সান্দ্রা। বৈধিভক্তিমার্গের ভক্তগণের মুক্তি বাঞ্ছা না থাকিলে পরিপাক দশায় তাঁহারা শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেমন শুকদেব ভগবৎ-করুণায় জ্ঞানসংস্কার সমূহকে শ্লথ করিয়া ভক্তিরসানন্দে প্রবীণ হইয়া ছিলেন; তেমনি কখনও যদি কাহারও প্রতি ভগবানের কৃপাতি-শয় হয়, তাহা হইলে সে যদি প্রথমে জ্ঞান-নিষ্ঠ থাকে, তবে তাহার শান্তভাব লাভ হয়। নির্গুণভক্তির প্রধানীভূতা মার্গের ভক্তগণও প্রথমে শান্তভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ভগবানে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত বুদ্ধির নাম সম, অতএব এই শান্তভাব ব্যতিরেকে ভগবানে বুদ্ধির নিষ্ঠা দুর্ঘট। শান্তভাব কেবলা ভক্তির অন্তর্ভুক্ত নহে।

দাস্যভাব। আকুলহৃদয়ে ভগবানের সেবা করিলে দাস্যভাবের সাধনা হয়। দাসভাবকে প্রীত ভক্তিরস বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথাঃ—

আত্ম চিতৈ বিভাবাদ্যৈঃ প্রীতিরাস্বাদনীয়তাং।
নীতা চেতসি ভক্তানাং প্রীতিভক্তিরসো মতঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

আত্মোচিত বিভাব দ্বারা ভক্তগণের চিত্তে প্রীতি আস্বাদনীয়ত্ব প্রাপ্ত হয়, একারণ ইহা প্রীতিভক্তিরস বলিয়া সম্মত। অনুগ্রহ পাত্রের সম্বন্ধে এবং পালনীয়ত্ব প্রযুক্ত এই দাস্য ভাব দুই প্রকারে বিভক্ত; এক—সম্ভ্রম দাস্য, অপর—গৌরবদাস্য। দাসাভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগবানে সম্ভ্রমবিশিষ্ট প্রীতি উৎপন্ন হইয়া পুষ্ট হইলে, ইহাকে সম্ভ্রমদাস্য বলা যায়। আর "আমি ভগবানের পাল-নীয়" এইরূপ অভিমানী ব্যক্তিদিগের ভগ-বদ্বিষয়ে উত্তরোত্তর গুরুত্ব জ্ঞানময় প্রীতিপুষ্ট

হইলে, তাহাকে গৌরবদাস্য বলা যায়। সোজা কথায়—হনুমানাদির ন্যায় প্রভুভাবে ভগবদ্ভজনের নাম সম্ভ্রমদাস্য আর প্রদ্যুম্নাদির ন্যায় পিতাভাবে কিম্বা রামপ্রসাদের ন্যায় মাতাভাবে ভগবদ্ভজনের নাম গৌরবদাস্য।

দাসাভিমানী ভক্তগণ মনে করেন, আমি তাঁহার দাস—আমি তাঁহার বিশ্বাসী ভৃত্য। প্রভু আমাকে জগতে পাঠাইয়াছেন কর্ম্ম করিবার জন্য; এই জগৎটা তাঁহার বড় সাধের কর্ম্ম-শালা। সবই তাঁহার সবই তিনি। আমি তাঁহার ভৃত্য, তাঁহারই কাজ করিতেছি। কর্ত্তব্য বলিয়া করি না—না করিয়া থাকিতে পারি না, তাই আকুল লালসায় করিতেছি। এই দাস্য-ভাব নিস্কামসেবা। প্রাণের জগদ্রূপী জগন্নাথের সেবা করিলে অচিরে প্রেমলাভ হয়।

প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের সাধকগণ গৌরব দাস্য এবং কেবলাভক্তিমার্গের সাধকগণ সম্ভ্রমদাস্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সখ্যভাব। সখার উপরে—বন্ধুর উপরে যে ভালবাসা হয়, সেইরূপ ভালবাসার সহিত যে ভগবদ্ভজন—তাহাকে সখ্যভাব বলে। সখ্যভাবকে প্রেয়ভক্তিরস বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। যথা ঃ—

স্থায়ী ভাবো বিভাবাদ্যৈঃ সখ্যমাত্মোচিতৈরিহ।
নীতশ্চিত্তে সতাং পুষ্টিং রস প্রেয়ানুদীর্য্যতে॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

স্থায়ীভাব আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা সৎ-সকলের চিত্তে সখ্যরসকে পুষ্টিপ্রাপ্ত করা-ইলে, ঐ সখ্য প্রেয়ভক্তিরস বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। ভগবানকে সখা বা বন্ধু মনে করিয়া তাঁহার প্রীতি বা আনন্দ বিধানার্থ নিজহৃদয়ে আনন্দপূর্ণ লালসাকে সখ্যভাব বলে। প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের ভক্তগণ অর্জ্জুনাদির ন্যায় এবং কেবলাভক্তি মার্গের সাধকগণ ব্রজরাখালগণের ন্যায় সখ্যভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

সখ্যভাবের সাধনায় কামনা দূরীভূত হয়, আসক্তির আগুন নিবিয়া যায়। সখ্যভাবে সমস্ত জগৎ এক সখারূপে প্রতীয়মান হয়। কেননা সকলেই খেলিতে আসিয়াছি; খেলা সর্ব্বত্র। এই খেলার সাথী স্বয়ং বিশ্বেশ্বর। বিশ্ব তাহার মূর্ত্তি,—বিশ্বের সহিত সখ্যতা, বিশ্বের সহিত ভালবাসা—ইহাই সখ্য-ভাব। সখ্যভাবের ভক্ত শান্তভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবান্‌কে মহিমান্বিত কিম্বা দাস্যভাবের ভক্তের ন্যায় সম্ভ্রমযুক্ত মনে করিতে পারেন না; তাঁহারা ভাবেন ভগবান্ আমারই মত, তাই তাঁহারা ভগবানের কাঁধে চাপিতে—উচ্ছিষ্ট খাওয়াইতে সঙ্কুচিত হন নাই। ব্রজের রাখালগণ শ্রীকৃষ্ণকে আত্মসদৃশ মনে করিতেন। তাঁহার সঙ্গে খেলা করিয়া—গরু চরাইয়া—কাঁধে চড়িয়া—কাঁধে করিয়া তাঁহারা আত্মহারা হইতেন। শ্রীকৃষ্ণের কোন কারণে ঐশ্বর্য্যভাব প্রকাশ পাইলে, ইহাঁরা তাহা 'ঠাকুরালী" মনে করিয়া মুখ বাঁকা করিতেন; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের মুখ ম্লান দেখিলে কাঁদিয়া ফেলি-তেন,—অদর্শনে জগৎশূন্য দেখিতেন। কত দীর্ঘ দীর্ঘ জন্ম—কত দীর্ঘ দীর্ঘ যুগ সাধিয়া কাঁদিয়া চাহিয়া থাকিয়া তবে সে-ভাগ্য লাভ হইতে পারে!

সখ্যভাবে ভগবান্‌কে আত্মসদৃশ ভাবনা করিতে করিতে ভক্তগণও তৎসদৃশ গুণ সমূহ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

বাৎসল্য ভাব। পিতামাতা প্রাণ উথাড়িয়া যেমন পুত্র-কন্যাকে ভালবাসেন, সেইরূপ ভাবে ভগবান্‌কে ভালবাসাই বাৎসল্যভাব। ইহা শাস্ত্রে বৎসলভক্তিরস বলিয়া কথিত হইয়াছে। যথাঃ—

বিভাবাদ্যৈস্তু বাৎসল্যং স্থায়ী পুষ্টি মুপাগতঃ।
এষ বৎসল নামাত্র প্রোক্ত ভক্তিরসো বুধৈঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

বিভাবাদি দ্বারা বাৎসল্য পুষ্টিপ্রাপ্ত হইয়া স্থায়ী হইলে পণ্ডিতগণ তাহাকে বৎসল ভক্তিরস বলিয়া থাকেন। বাৎসল্যভাব নিষ্কামতার পরাকাষ্ঠা। পিতামাতা সন্তানের কাছে চাহিবেন কি?—সর্ব্বস্ব দিয়াও যে পিতামাতার সাধ পূরে না। পিতামাতার নিকট সন্তানেরই সর্ব্বদা আব্দার,—সর্ব্বস্ব দিয়া—সর্ব্ব-শক্তির সংযোগ করিয়া সন্তান লালন পালন করেন, তথাপি পিতামাতার সাধ পূর্ণ হয় না। সন্তানের জন্য তাঁহারা সহস্রবার আত্মত্যাগ করিতে পারেন। আশা নাই—আকাঙ্ক্ষা নাই, কেবলই পুত্রের মঙ্গল কামনা। পুত্রের গুণ শ্রবণে—প্রশংসা শ্রবণে পিতামাতার হৃদয় পুলকিত হয়,—প্রাণ দিয়াও সন্তানের সুখ সাধনা সম্পন্ন করিতেও তাঁহারা আনন্দ বোধ করেন। ঈশ্বরকে এমনই ভাবে ভালবাসিতে পারিলে, তাহাকে বাৎসল্যভাব বলে।

নন্দ যশোদা ও মেনকার বাৎসল্যভাব কেবলাভক্তির এবং দেবকী বসুদেবের বাৎসল্য প্রধানীভূতা ভক্তির অন্তর্গত। বাৎসল্যভাবের ভক্ত বলেন,—বিশ্বেশ্বর আমার পুত্র—আমার স্নেহের সন্তান, আমি প্রাণের টানে—বাৎসল্য-ভাবের আকর্ষণে সেবা করিয়া, যত্ন করিয়া, প্রতিপালন করিয়া সুখী হইব। এইরূপ ভক্ত পুত্রজ্ঞানে জীব ও জগতের সেবা করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকেন। বাৎসল্য ভাবে ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান।

মধুর ভাব। পত্নী যেমন পতিকে ভালবাসে, কান্তের উপর কান্তার যেমন অনুরাগ, ভগবান্‌কে তেমনি ভালবাসার নাম মধুর ভাব। সর্ব্ব প্রকার ভাবের মধ্যে ইহাই শ্রেষ্ঠ; ইহা জগতেরও সর্ব্বোচ্চ ভাবের উপর স্থাপিত।

আত্মোচিত র্বিভাবাদ্যৈঃ পুষ্টিং নীতাং সতাং হৃদি।
মধুরাখ্যো ভবেত্তক্তি রসোঽসৌ মধুরা রতিঃ॥
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

আত্মোচিত বিভাবাদি দ্বারা মধুরা রতি সৎ সকলের হৃদয়ে পুষ্টিতা প্রাপ্ত হইলে মধুরাখ্য ভক্তিরস বলিয়া কথিত হয়। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ ভেদে এই মধুর ভাব দুই প্রকার। সম্ভোগ আবার রতির গাঢ়তা মৃদ্রুতানুসারে সাধারণী, সমঞ্জসা ও সমর্থা, এই ত্রিবিধ রূপে কথিত হয়।

এই ভাব সঞ্চারমাত্রেই মানুষের সমুদয় প্রকৃতিকে ওলট পালট করিয়া ফেলে। এই ভাব মানুষের প্রতি পরমাণুর মধ্য দিয়া সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে পাগল করিয়া তুলে—নিজের প্রকৃতি ভুলাইয়া দেয়। প্রকৃত সতীনারীর প্রেম যথার্থ আত্মত্যাগ; স্ত্রী, স্বামীপ্রেমে মগ্ন হইয়া জ্বলন্ত চিতায় শয়ন করে,—প্রেমে আপনহারা হয়—কেবল বাঞ্ছি-তের ভাবনাতেই তাহার হৃদয় ভরিয়া যায়। আপন ভুলিয়া, সর্ব্বস্ব দিয়া পত্নী পতিকে পূজা করিয়া থাকে তাহার জীবন, যৌবন,

রূপ, রস, আহার, বিহার সমস্তই তখন স্বামীর জন্য। এমন হৃদয়ে হৃদয়, প্রাণে প্রাণ, ত্বচে ত্বচ্ অণু অণুতে সম্বন্ধ আর কোথায়? স্ত্রী স্বামীর ছায়ার ন্যায়—কায়া যে কাযে রত, ছায়া ও তাহাই করিয়া থাকে। এক দণ্ডের বিরহ অনন্ত যাতনা প্রদান করিয়া থাকে, একটু মুখ অবহেলা প্রাণে প্রলয়ের আগুণ সৃষ্টি করিয়া দেয়, ডাকিয়া একটু সাড়া না পাইলে নয়নাসারে দৃষ্টি রোধ করিয়া বসে, অন্যের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে দেখিলে অভিমানের অনলে হৃদয় দগ্ধ হইয়া যায়। মুহূর্ত্তের বিরহে জগৎ শূন্য ও অগ্নিময় বোধ হয়। প্রাণ কেবল উধাও হইয়া—সে আমার কোথায় বলিয়া প্রাণের ভিতর প্রাণ লুটিয়া লুটিয়া কাঁদিতে থাকে। এই স্ত্রীর ভালবাসা—স্ত্রীর প্রেম লইয়া জীব ভগবান্‌কে ভালবাসিলে—এইরূপ প্রেম তাঁহাতে অর্পণ করিলে জীব তাঁহাকে লাভ করিতে পারে। কিন্তু এই ভাব মানবের প্রেমে সম্যক সাধিত হয় না। কেন না যাহাকে চিন্তা করা যাইবে—চিন্তাতরঙ্গের পরিচালনা দ্বারা তৎস্বরূপই লাভ হইবে। ভগবান্ শুদ্ধ সত্ত্ব কাজেই তাহাকে মধুর ভাবেই চিন্তা করিলে, শুদ্ধসত্ত্বে পরিণত হওয়া যায়। সখার নিকট সখার ভাব, পিতার নিকট পুত্রের আব্দার, বন্ধুর নিকটে বন্ধুর কথা—এই সকলই নিকট বটে, কিন্তু প্রাণের এত অসঙ্কোচ—এমন হৃদয় বিনিময় আর কোথাও নাই। তাই ভক্ত ভগবান্‌কে মধুর ভাবে সাধনা করিয়া থাকেন।

এই মধুর ভাবে ভক্ত আর ভগবানের ঐকাত্ম্য সম্পাদিত হয়, সুতরাং আপনা হইতেই তখন সমাধির অবস্থা আসিয়া পড়ে, ক্রমে গাঢ়তর সমাধির অবস্থায় চিত্তের বিক্ষেপ একেবারে দূরীভূত হইয়া যায়, তখন ত্রিগুণাত্মিকা বুদ্ধির রজ ও তমের আবরণ প্রায় কাটিয়া যায়, সত্ত্বগুণ অতি প্রবল ভাবে আবির্ভূত হইয়া উঠে এবং যতই সত্ত্ব গুণের প্রবল অবস্থা হয়, ততই রজ ও তম ক্ষীণ হইয়া পড়ে, ক্রমে ঐ অবস্থার আরও গাঢ়ত হইলে রজস্তম একেবারে অভিভূত হইয়া পড়ে, আর উহাদের অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না। তখন সত্ত্বগুণের অতীব উদ্দীপিত অবস্থা হয়, সেই সময়ে বুদ্ধি ও বিবেক জ্ঞান হয়, জীব আর বুদ্ধি যে পৃথক্, স্বতন্ত্র তাহারই উপলব্ধি হয়,—সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি ঈশ্বরের সংযোগ শ্লথ হইয়া পড়ে; এই অবস্থার আরও গাঢ়তা হইলে, বুদ্ধি পুরুষের সংযোগ একেবারেই ছিন্ন হইয়া যায়, যে সত্ত্বগুণ জীবের তাদৃশ বিবেক বুদ্ধি জন্মাইয়া দিয়াছিল, সেই সত্ত্বগুণও এককালে অভিভূত হইয়া পড়ে, তখন আর গুণ বন্ধন থাকে না। এই প্রকারে প্রেমময় ভগবানে যতই একাগ্রতা হইবে ততই চিত্তের অন্য বিষয় বৃদ্ধি নিরুদ্ধ হইবে,—তখন একমাত্র সেই প্রেমিক—সেই ধ্যেয় বিষয়েরই মাত্র জ্ঞান থাকিবে,—ধ্যেয় বিষয়ের সহিত মাখাইয়া নিজের স্বরূপোপলব্ধি হইবে,—সুতরাং উপাস্য, উপাসক এবং উপাসনা,—প্রেমিক, প্রেমিকা ও প্রেম থাকিবে না। তখন জীব স্বরূপে প্রকাশমান হন,—তখন তিনি কেবল সেই অবস্থা মাত্রেই অবস্থিত থাকিবেন। তাই মুক্তিকে "কৈবল্য" বলিয়া কথিত হয়।

এই পঞ্চবিধ ভাবানুরাগী সাধকদিগের

মধ্যে প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গের ভক্ত সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া ঐশ্বর্য্যসুখোত্তরা গতি লাভ করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্ত্যঙ্গ সাধনাবলম্বন করিলেই তাহারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবেন। আর মাত্র কেবলাভক্তিমার্গের দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবাশ্রিত-ভক্তগণের মধ্যে সকলেই প্রেমভক্তি লাভ করিয়া প্রেম সেবোত্তরা গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের মধ্যে যে ভাবের যে পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হইবার যোগ্যতা আছে, সেই ভাব সেই সীমাকে প্রাপ্ত হইলেই, উহা প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তখন বিনাশের কারণ উপস্থিত হইলেও আর উহার ধ্বংশ হয় না। তখন ভক্ত পরম পুরুষ ভগবানের অনন্ত নিত্যলীলা সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া থাকেন।

যিনি ঐকান্তিক ভাবে ভগবানের আরাধনা করিয়া পরম প্রেমবলে অনুক্ষণ তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য আস্বাদ করিতেছেন, তিনিই ভাবাশ্রিত কেবলাভক্তির সিদ্ধ ভক্ত বলিয়া পরিগণিত। তাঁহারা নিরন্তর ভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন।

———:0:———

প্রচার সংবাদ।

আমরা প্রচারার্থ উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে আলিপুর-দুয়ারের ভক্তগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আচার্য্যপাদ-শ্রীমৎস্বামী-নিগমানন্দ পরমহংসদেব তথায় শুভাগমন করেন। আমরা তিস্তা তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া ৫ই আশ্বিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে আলিপুর উপনীত হই। অভ্যর্থনার জন্য ষ্টেশনে সহরের প্রায় অধিকাংশ লোক উপস্থিত ছিলেন। একজন মুসলমান পেশকারের বহির্ব্বাটীতে 'ছায়লা' বাঁধিয়া স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হইয়াছিল। সকলে ঠাকুরকে লইয়া উক্তস্থানে গেলেন; তথায় কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর স্থানীয় কালীবাড়ী যাইয়া সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে ঠাকুরের প্রিয়ভক্ত শ্রীযুত বাবু দুর্গাচরণ দত্ত মহাশয়ের বাসায় যাওয়া হয়। তথায় ঠাকুরের আসন নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঠাকুরের শুভাগমনে আলিপুরে যেন আনন্দের বাজার বসিয়া গেল। উকিল, মোক্তার, ডাক্তার, মাষ্টার, ছেলে, মেয়ে, বুড়া প্রভৃতি সহরের সর্ব্বসাধারণ জনগণ যেন মাতিয়া উঠিলেন, আহার নিদ্রা কাজ কর্ম্ম ভুলিয়া ঠাকুরের নিকট উপস্থিত থাকিতেন। সহরময় এরূপ উত্তেজনা—উচ্ছ্বাস প্রায়ই দেখা যায় না। বাধ্য হইয়া তথায় ১০ দিন আমাদিগকে অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। প্রতিদিন ধর্ম্মালোচনা, নামসংকীর্ত্তন হইয়াছিল। একদিন নগর সংকীর্ত্তন বাহির করিয়া ঠাকুর সহরের ঘরে ঘরে ঘুরিয়াছিলেন। সেদিনকার সে আনন্দ—সে আবেগপূর্ণ নাম গান আর ভুলিবনা—ভাষায় কি বর্ণনা করিব? মহোৎসবে মাতিয়া কয়দিন তথাকার স্কুল কাছারি পর্য্যন্ত বন্ধ হইয়াছিল। ডেপুটী, সব্‌ডেপুটী; মুন্সেফ্‌বাবুরাও সে আনন্দে যোগদান করিয়াছিলেন। তথাকার একষ্ট্রা

আসিষ্টাণ্ট্ কমিসনার শ্রীযুত যতীন্দ্র কুমার বিশ্বাস এম্, এ, বি, এল, এম, Sc; মহোদয়ের কথা আমরা জীবনে ভুলিব না। তাঁহার ন্যায় বিদ্যা-বুদ্ধিসম্পন্ন উচ্চরাজ-কর্ম্মচারীর এরূপ উদারতা, অমায়িকতা, ত্যাগ-সংযম বিশ্বাস-ভক্তি খুব অল্পই দৃষ্ট হয়। তাঁহার পিতা খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করেন, সুতরাং ইনিও তদ্ধর্ম্মাবলম্বী, তথাপি তাঁহার ন্যায় চরিত্র-বল ও সংযমাভ্যাস শতকরা একজন হিন্দুর থাকিলেও হিন্দুসমাজ—গৌরবান্বিত হইয়া উঠিত। বিদায়ের দিন আলিপুরবাসী আবাল-বৃদ্ধ বনিতার হৃদয়ের ভাব স্মরণ করিলে এখনও কান্না পায়। তাঁহারা যেন আপন আপন হৃদপিণ্ড ছিড়িয়া ফেলিবার ন্যায় কষ্টানুভব করিতে লাগিলেন। কতকগুলি ভক্ত সংকীর্ত্তন করিতে করিতে কুচবিহার পর্য্যন্ত আমাদের সঙ্গে আসিয়া ছিলেন।

আমরা আলিপুর প্রবাসী ভদ্রলোকের যে রূপ সহানুভূতি পাইয়াছি তজ্জন্য তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ প্রদান করি। তাঁহারা আশ্রমের আহুতি কল্পে ঠাকুরের চরণে ১০০৲ টাকা প্রদান করিয়াছেন। শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের ভিক্ষা স্বরূপ আমাদের প্রায় ১২৫৲ টাকা দান করিয়াছেন। উক্তস্থানে ৫০৲ টাকার পুস্তক বিক্রয় হইয়াছে এবং আর্য্য-দর্পণের ২৮ জন নূতন গ্রাহক পাইয়াছি। একারণ আমরা তাঁহাদিগের নিকট কৃতজ্ঞ।

পূজ্যপাদ পরমহংসদেবের উপদেশে তাঁহার অবস্থিতি কালেই আলিপুরে একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঠাকুর স্বয়ং তাহার উদ্বোধন করিয়া হরিসভার প্রয়োজন ও কার্য্যকারিতা যুবকগণকে সেবাধর্ম্ম গ্রহণ করিতে উপদেশ দিয়া তাহার উপকারিতা বুঝাইয়া দেন। কুচবেহারের অনুরোধ সত্ত্বেও দিন সংক্ষেপ বশতঃ তথায় না গিয়া বগুড়া চলিয়া আইসেন। তথায় ডিষ্ট্রীক্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ ডিষ্ট্রীক্ট্ ইঞ্জিনিয়ার সবজজ, ডেপুটী প্রভৃতি সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ ঠাকুরের নিকট আসিয়াছিলেন বটে, কিন্তু সাধারণের সেরূপ উৎসাহ দেখিলাম না। ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব দুই দিন ঠাকুরকে নিজ কুঠীতে লইয়া গিয়াছিলেন। এক দিন পার্কে ও হরিসভাতে ঠাকুরের সহিত বেড়াইয়া ছিলেন। বগুড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট্ বাহাদুরের উদারতা ও ধর্ম্মপ্রাণতা প্রশংসার্হ। আমরা বগুড়া ও কুড়িগ্রামের শোচনীয় দুরবস্থার প্রতি করুণাময় ভগবানের কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনা করি।

———:0:———

সহমরণ।

পাঠকগণ! বিগত আশ্বিন সংখ্যার আর্য্য-দর্পণে একটী পতিপ্রাণা রমণীর আশ্চর্য্য সহমরণ বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। দুই-মাস না যাইতেই আর একটী প্রেমিকার পবিত্র সহমরণ-সংবাদ প্রকাশ করিতে পাইয়া আমরা গৌরব অনুভব করিতেছি। এবার বঙ্গদেশে। ঢাকা-বিক্রমপুরের অন্তর্গত নগর-ভাগ গ্রামের ভগবতী চরণ হাওয়ালদার মহাশয় গত ১৪ই কার্ত্তিক তারিখে পরলোক গমন করেন। তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী পূর্ব্ব হইতেই সহমরণের কামনা করিতেছিলেন এবং মুমূর্ষু-পতির সম্মতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। হাওয়াল-

দার মহাশয়ের মৃত্যু হইলে তিনি আপন পুত্র দুইটীকে ননন্দার হাতে সমর্পণ করিয়াই অজ্ঞান হইয়া পড়েন। তাহার পর আর তাঁহার জ্ঞান হয় নাই। পরদিন বেলা ১০ ঘটিকার সময়ে সতীর মৃত্যু হয়। বলা বাহুল্য পূর্ব্বে তাঁহার কোনও রোগ ছিল না। ধন্য সতি! প্রেমের গতি তোমরাই বুঝিয়াছ- তোমাদের সন্তানগণ যেন মাতৃধনে বঞ্চিত না হয়।

———:0:———

শুভাগমন।

গত ৩রা অগ্রহায়ণ শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজার দিন স্থানীয় মহামান্য ডেপুটি কমিসনার বাহাদুর শ্রীযুক্ত মেজর এ, প্লেফেয়ার আই, এ, মহোদয় শান্তি-আশ্রমের সন্নিকটে সরকারী-ভূমি পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু পূর্ব্বে আমরা তাহা জানিতাম না। প্রত্যা-বর্ত্তন কালে আশ্রম হইতে তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া আমরা যাইয়া "শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ নিকেতন" ও "দাতব্য চিকিৎসালয়" দেখিবার জন্য আশ্রমে আসিতে অনুরোধ করিবা মাত্র হস্তী হইতে অবতরণ করিয়া আশ্রমে প্রবেশ করিলেন। অনেকক্ষণ ডাক্তারখানায় দাঁড়াইয়া ঔষধাদি ও রোগীর তালিকাপুস্তক দেখিলেন; হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে এখান হইতে রোগিগণ চিকিৎসিত হইতে পারে জানিয়া তিনি বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন। আর্য্য-দর্পণের সম্পাদক শ্রীমৎ স্বামী যোগানন্দ মহারাজ আশ্রমের উদ্দেশ্য ও কার্য্যাবলি বুঝাইয়া দিলেন এবং আমরা একবৎসরে (আসাম আসিয়া) কি কি কার্য্য করিয়াছি তাহাও জানাইলেন। পূজ্যপাদ পরমহংসদেবের সহিত ফুলবাগান ও কলম-বাগান দেখিয়া বেড়াইলেন। আমাদের সুবিধা অসুবিধার বিষয় এবং আমরা এখানে স্থায়ী-ভাবে থাকিব কিনা, জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে আঙ্গিনা হইতে আসন দর্শন করিয়া যোরহাট চলিয়া গেলেন। সকলের সহিত সরলভাবে হাস্যমুখে কথাবার্ত্তা, উদারভাব ও সহানু-ভূতিপূর্ণ ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে আমরা কৃতজ্ঞহৃদয়ে ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি। রাজপুরুষজনোচিত গুণগ্রামে মুগ্ধ হইয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, 'তিনি' স্বাস্থ্য ও শান্তিপূর্ণ জীবনে এই জেলায় তাঁহার অধিক দিন স্থায়ীত্ববিধান এবং ভগবদ্ভক্তি ও প্রজাপ্রীতি প্রদান করুন।

———:0:———

মুক্তির স্বরূপ ও তল্লাভোপায়।

(৮ম সংখ্যার ১৭৪ পৃষ্ঠার পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)।

বেদান্তোক্ত নির্ব্বাণ মুক্তিতেই যখন সর্ব্ব মতবাদীদিগের পরম-পুরুষার্থ রূপ চরমলক্ষ্যত্ব লক্ষিত হইতেছে; তখন তল্লাভেই সকলের যত্ন করা কর্ত্তব্য। স্বরূপ প্রতিষ্ঠায় নির্ব্বাণ মুক্তি সাধিত হয়, সুতরাং স্বরূপ সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে তাহা প্রতিষ্ঠিত হইবে কিরূপে? এই

দাম-স্বরূপ হেতু মুমুক্ষুব্যক্তি সর্ব্বাগ্রে স্বরূপের অনুসন্ধান অনুসন্ধান করিবে। আমরা বেদান্ত-মতের পক্ষপাতী; কাজেই এস্থলে বেদান্ত প্রতিপাদিত স্বরূপের অনুসরণ করিব।

বেদান্ত মতে ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নাই—কিছু থাকিতে পারে না। কেন না,—

সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্।

ছান্দোগ্যোপনিষৎ।

এজগৎ সমুদায়ই ব্রহ্ম, যেহেতু তজ্জ—তাঁহা হইতে জন্মে, তল্ল—তাঁহাতে লীন হয়, এবং তদন্—তাঁহাতে স্থিত করে বা চেষ্টিত হয়। সুতরাং বৃক্ষ, লতা, নদী, পর্ব্বত, জীব, জন্তু, গ্রহ, নক্ষত্রাদি যে কিছু বস্তু আমরা পৃথিবীতে দেখিতেছি, এ সমস্তই ব্রহ্ম। কারণ এক ব্রহ্মবস্তু ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু কোথা হইতে আসিবে? পরব্রহ্ম অনাদি ও অনন্ত, অনন্ত বস্তুর সত্তা স্বীকার, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা—স্বীকার্য্য হইতে পারে না। কারণ, অনন্ত সত্তা এক বই দুই হইতে পারে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহা সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত। যাহা অনন্তরূপে সর্ব্বব্যাপী, তদ্ভিন্ন অন্য কোন বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা স্বীকার করিলে আর অনন্ত বস্তুর সর্ব্বব্যাপীত্ব থাকে না। যে বস্তু অনন্ত, তাহাতে সমস্ত বস্তুই অবস্থান করিতেছে। একথা যদি প্রামাণ্য ও সত্য হয়, তবে এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের স্বতন্ত্র সত্তা অসত্য। জগৎ আবার অনন্ত সত্তা হইতে বিভিন্ন হইবে কিরূপে? যদি বল, জগৎ স্বতন্ত্র পদার্থ, তবে বলিতে হইবে পরব্রহ্ম অনন্ত নহেন। অতএব জগৎ ব্রহ্মেই অবস্থান করিতেছে। এক ব্রহ্মই বিশ্বব্যাপী হইয়া সমস্ত পদার্থে ওতঃপ্রোত হইয়া আছেন। কোন ন্যায়ে এযুক্তি খণ্ডিত হইতে পারে না। যাঁহারা বলেন, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী, অথচ জগৎ সেই পরমেশ্বর হইতে স্বতন্ত্র ও ভিন্নপদার্থ, তাঁহারা পারতঃ পরমেশ্বরের অনন্ত সত্তার অস্তিত্ব ও সর্ব্বব্যাপীত্ব স্বীকার করেন না। যখনই বলিলে, পরমেশ্বর সর্ব্বব্যাপী ও অনন্ত, তখনই জগতের স্বতন্ত্র ও বিভিন্ন সত্তা অস্বীকার করিলে। যাহা অনন্ত, তাহা অবশ্য অনাদি। যাহার আদি আছে, তাহার সীমাও শেষ আছে, কিন্তু অনন্তের সীমা ও শেষ সম্ভবে না; সুতরাং অনন্ত পদার্থ অনাদি। অতএব ব্রহ্ম যদি অনাদি ও অনন্ত হন, তবে অবশ্য বলিতে হইবে যে, এই জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ড সেই ব্রহ্মের শরীর ও রূপ। তিনি অনন্ত বিশ্বের বস্তু রূপে অবস্থিত আছেন; এবং এই অনন্ত বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থান করিতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন কিছু ছিল না, তখন কেবলমাত্র পরব্রহ্ম পূর্ণভাবে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি ইচ্ছা করিলেন,—"আমি বহু হইব"—তাই চেতনাচেতন জীবপূর্ণ জগৎরূপে এই বহু হইয়াছেন। সুতরাং এই জগৎ ব্রহ্মবস্তু এবং আমাদের আত্মাও অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্মাত্মা। যখন মনুষ্যরূপী অবিদ্যাবচ্ছিন্ন ব্রহ্ম তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হন, তখনই তিনি আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিতে পারেন। এইরূপে আপনাকে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিতে সক্ষম হওয়ার নামই স্বরূপ প্রতিষ্ঠা বা মুক্তি।

আমিই ব্রহ্ম; ইহাই আমার স্বরূপ, কিন্তু মায়াপরিশূন্য 'আমি' ব্রহ্ম,—মায়োপাধিক 'আমিই' জীব। জীবে চৈতন্য ও চৈতন্য-চালক শক্তি বিদ্যমান আছে।

আত্মবিচার। চৈতন্য ঈশ্বর,—চৈতন্য-চালক

শক্তি মায়া। যেমন বাসনার সহযোগে জীব নানারূপী,—নানা ক্রিয়াপরতন্ত্র হইয়া রহিয়াছে, তদ্রূপ মায়ার সহযোগে চৈতন্য নানা ক্রিয়াময় হইয়া জগৎ ও জীব রূপে প্রকাশ হইয়াছেন। জীব মায়াধিকৃত, চৈতন্য মায়ামুক্ত ব্রহ্ম।

চৈতন্য ও মায়া বিভিন্ন পদার্থ নহে বটে, কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়াময়। চৈতন্য জড়ভাবে রূপান্তরিত হইলে, জড় ও চৈতন্য মধ্যবর্ত্তী উভয়ের সংমিশ্রন-চৈতন্য প্রকাশিত শক্তিকে মায়া বা ঈশ্বর-বাসনা বলে। যদি চৈতন্য ক্রিয়াপর অবস্থায় অবস্থিত না হন, তাহা হইলে মায়া চৈতন্যে লয় পায়। মায়া লয় পাইলে জগৎ লয় পায়। চৈতন্যকে প্রকাশ ও ক্রিয়াপর করিবার জন্য কাল ও সৎ এই দুই নিত্য ঈশ্বরাংশ চৈতন্য হইতে যে স্থূল অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মায়া বা প্রকৃতি। অতএব এক চৈতন্য বাসনাতে পরিবর্ত্তিত। সূর্য্য যেমন আপন শক্তিতে স্থূলভূতরূপে জলবর্ষণ করেন, আবার সূক্ষ্মভাবে উহা গ্রহণ করেন,—সেইরূপ ঈশ্বর বাসনা সংযুক্ত হইয়া জীব হয়েন, আবার বাসনা বিমুক্ত হইলে 'স্বয়ং' হয়েন। ঈশ্বর চৈতন্যের আকর। তাঁহার সক্রিয়ভাব বাসনা, তাহাতেই লীন হয় বা হইতে পারে; যে অংশে বাসনা নাই, সেই অংশ নিত্য ও সর্ব্বাধাররূপে বর্ত্তমান। একই আত্মা মনের বহুত্বে নানারূপে প্রকাশিত। সুতরাং জীব অসংখ্য; আত্মা অসংখ্য নহেন। একই আত্মা দেহপরিচ্ছেদে নানাদেহে ভেদ প্রাপ্তের ন্যায় বিরাজ করিতেছেন। মন প্রতি শরীরে বিভিন্ন; সুতরাং সুখদুঃখ, শোকসন্তাপ, জন্মমৃত্যু, বন্ধনও বিমুক্তি প্রভৃতিও ভিন্ন। যথা :—

ঈশ্বরে নৈব জীবেন সৃষ্টদ্বৈতং বিবিচ্যতে।
বিবেক সতি জীবন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটা ভবেৎ॥
দ্বৈত বিবেক।

এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কার্য্যকারণ ভাব জন্য জীব ও ঈশ্বরভেদে দুই প্রকার উপাধি হইয়াছে। কারণ ভাবজন্য অন্তর্য্যামী ঈশ্বরোপাধি এবং কার্য্যভাব জন্য অহং পদবাচ্য জীবোপাধি হইয়াছে। ব্রহ্ম অদ্বৈত হইয়াও কার্য্যকারণ ভাবজন্য দ্বৈতরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন। এই দ্বৈতভাব নিবারণের উপায় বিবেক, জীবের বিবেক জ্ঞান উপস্থিত হইলে জীব ও ঈশ্বররূপ উপাধির নাশ হইয়া কেবল শুদ্ধ চৈতন্য মাত্র অবশিষ্ট থাকে। সেই অবশিষ্ট শুদ্ধ চৈতন্যই অদ্বৈত ব্রহ্ম। আত্মবিচার দ্বারা এইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মজ্ঞান হইলেই সংসার বন্ধন হইতে পরিমুক্ত হইয়া অন্তে নির্ব্বাণ লাভ হইয়া থাকে।

একণে কথা এই যে, যদিও সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু কিছুই ছিল না; একমাত্র তিনি পূর্ণভাবে অনন্তদেশ অধিকার করতঃ বর্ত্তমান ছিলেন,—

বিরুদ্ধবাদীর মতামত।

যদিও এই জগতের উপাদান সকলকে বাহির হইতে আহরণ করেন নাই, তাঁহার ইচ্ছায়,—তদীয় শক্তি হইতেই এ সমস্ত উৎপন্ন হইয়াছিল; যদিও তিনি ইহার সর্ব্বস্ব; তথাচ পশুপক্ষী, বৃক্ষলতা, চন্দ্রসূর্য্য প্রভৃতি যাহা কিছু দেখিতেছি, এ সমস্তই যে জড় ও জীবভাবাপন্ন ব্রহ্ম এ কথা নিম্নাধিকারী জনগণ বিশ্বাস করিতে পারে না। উপরন্তু বিজ্ঞতা করিয়া বলিয়া থাকে,—"জ্ঞানময় ব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়া অজ্ঞানাচ্ছন্ন জীব ও জগৎরূপে পরিণত হইলেন,

এ কথা আদৌ গ্রাহ্য নহে।—আমরা যে সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম, ইচ্ছা করিয়া অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া সংসার-তাপে তাপিত হইতেছি এবং আমার সম্মুখস্থ ঐ দস্যুগণ এবং ঐ শিবিকাবাহকগণও সেই ব্রহ্ম—অবিদ্যাবচ্ছিন্ন হইয়া এক্ষণে এই মর্ত্ত্যলোকে জীবিকার জন্য সদসৎ কার্য্যসকল সম্পাদন করিতেছে, একথা উন্মাদ না হইলে গ্রাহ্য করা যায় না। প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট জীব-জগৎকে যাহারা মিথ্যা বলিতে সঙ্কোচ করে না, তাহাদিগকে নির্লজ্জ নাস্তিক ব্যতীত 'মুক্তপুরুষ' কে বলিবে ?"

বেদান্তবাদী-কিরূপ অর্থে "জগৎ মিথ্যা" এই ভাবটী গ্রহণ করেন, তাহা না বুঝিতে পারিয়া ভেদবাদিগণ ঐরূপ প্রতিবাদ করিয়া থাকে। আচার্য্য-পাদ রামানুজও ইহার হস্ত হইতে নিস্তার পান নাই! বৈদান্তিক বলেন,—

বৈদান্তিক অদ্বৈতবাদের প্রকৃত মর্ম।

অজ্ঞানাবস্থায় রজ্জুতে সর্পজ্ঞান—শুক্তিতে রজত জ্ঞান যেমন সত্য; তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় জগৎও ব্যবহারিক জ্ঞানে সত্য। কিন্তু ভ্রম দূর হইলে যেমন সর্প ও রজতজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া রজ্জু ও শুক্তি মাত্র বর্ত্তমান থাকে; তদ্রূপ জ্ঞানাবস্থায় জগৎ ব্রহ্মময় হইয়া যায়, তাই জগৎ অসত্য। অবস্তুতে বস্তুজ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা নহে,—শূন্যে সর্পভ্রম নহে, রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র; কিন্তু ভ্রম অন্তর্হিত হইলে রজ্জুজ্ঞান হয়। তদ্রূপ অজ্ঞানাবস্থায় ব্রহ্মে জগৎ ভ্রম হয়; যতক্ষণ ভ্রম থাকে, ততক্ষণ জগৎ ও সত্য; কিন্তু ভ্রম দূর হইলে জগতের পরিবর্ত্তে ব্রহ্মই অবশিষ্ট থাকেন; তখন কাজেই জগৎ মিথ্যা। ব্যবহারিক জ্ঞানে জগৎ সত্য, কেবল পারমার্থিক জ্ঞানে মিথ্যামাত্র। এতদ্রূপে অজ্ঞানাবস্থায় ব্যবহারিক—জীব, জ্ঞানাবস্থায় পারমার্থিক—ব্রহ্ম। "তত্ত্বমসি" বাক্যদ্বারা আত্মাকে প্রতিপন্ন করা হইয়াছে এবং "নেতি, নেতি" বাক্যদ্বারা এই মিথ্যাভূত পাঞ্চভৌতিক জগৎকে নিরাশ করিয়া শ্রুতিবাক্য সকল এক পরিশুদ্ধ আত্মাকেই প্রতিপন্ন করিয়াছেন। তত্ত্বমসি বাক্যটীর "তৎ" পদের অর্থ পরিশুদ্ধ পরমাত্মা ও "ত্বং" পদের অর্থ ব্যবহারিক জীবাত্মা। এই "তৎ" ও "ত্বং" পদের যে ঐক্য তাহাই "অসি' পদের দ্বারা সাধিত হয়। যদি বল, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার সহিত অল্পজ্ঞ জীবাত্মার ঐক্য কি প্রকারে সম্ভব হয়?—তজ্জন্য বলিতেছেন, "তৎ" ও "ত্বং" পদার্থ স্বরূপ ঈশ্বর ও জীবের পরোক্ষত্ব, সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ও অপরোক্ষত্ব, অল্পজ্ঞত্বাদি রূপ যে বিরুদ্ধ অংশসকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক "ত্বং" পদটী শোধন করিয়া লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত ঈশ্বর ও জীবের অবিরুদ্ধাংশ রূপ চিৎপদার্থ মাত্রকে—যাহা অস্তি, ভাতি ও প্রীতিরূপে সর্ব্বাবস্থায় স্ফূর্ত্তি পাইতেছে—গ্রহণ করিলে ব্রহ্মচৈতন্য ও জীবচৈতন্য মধ্যে কেবল এক চৈতন্য অবশিষ্ট থাকেন; সুতরাং চৈতন্য পক্ষে ঐক্য সম্ভব হয়।

পাঠক! অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক কিরূপে জীব ব্রহ্মের ঐক্য করিয়াছেন, বোধহয় বুঝিয়াছ? জীব-ব্রহ্মের নিগুর্ণ একত্ব প্রতিপাদনই অদ্বৈতবাদীর লক্ষ্য; নতুবা গুণের একত্ব মূর্খেও কল্পনা করিতে পারে না। তবে ঐক্যশব্দে ইহা বিবেচনা করা উচিৎ নয় যে, দুইবস্তুর পরস্পর সংযোগ দ্বারা ঐক্যকরা;—ঐক্য অর্থাৎ—একতাভাব, ইহা একই—এরূপ জ্ঞাত হওয়া। যে বস্তু পূর্ব্বে ছিল এবং

একরূপে যে বস্তু রহিয়াছে—এ সেই বস্তুই, সেই বস্তু এক এবং, এই বস্তু অন্য—এরূপ ভাব নহে। কেবল সেই বস্তুই ভ্রমবশতঃ অন্য বস্তু বলিয়া কল্পিত হইতেছে মাত্র; সুতরাং এরূপ স্থলে দ্বৈততা স্বীকার্য্য নহে—ভ্রমমাত্র। সুতরাং এস্থলের ঐক্য দ্বারা দুইবস্তুর একতা বুঝাইতেছে না; কেবল স্মরণ করাইয়া দিতেছে যে, পূর্ব্বে তুমি যা ছিলে,—সেই তুমিই এই হইয়াছ। ব্যবহারিক জ্ঞানের জীব, পারমার্থিক জ্ঞানে ব্রহ্ম; সুতরাং জীবের স্বরূপই ব্রহ্ম। আমার স্বরূপ ব্রহ্ম, অর্থাৎ—আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ ঐক্য জ্ঞানে যাঁহার প্রতীতি বা দৃঢ়-প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তিনিই মুক্ত।

ব্রহ্মই সৎ, তদতিরিক্ত সমস্তই অসৎ। অবিদ্যাপ্রভাবে ব্যবহারিক দশায় স্বপ্ন সন্দর্শনের ন্যায় অসৎকে সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হয় মাত্র। যেমন ঘুম ভাঙ্গিলে মানুষ, যে মানুষ সেই মানুষ, তাহার স্বপ্ন-দৃষ্ট সুখের রাজ্যাদি অন্তর্হিত হয়; সেইরূপ অবিদ্যার ঘুম ভাঙ্গিলে জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়।

যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ মুখং
বিদ্যতে কল্পনাহীন মেকাম্।
তথাধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ—
সঃ নিত্যোপলব্ধি স্বরূপোঽহমাত্মা॥
হস্তামলক।

যেমন দর্পণের অভাব হইলে তদ্গত প্রতিবিম্বের ও অভাব হয়, তখন উপাধি রহিত মুখ মাত্রই অবশিষ্ট থাকে; তদ্রূপ বুদ্ধির অভাব হইলে প্রতিবিম্ব রহিত আত্মা স্ব-স্বরূপে অবস্থিত থাকেন, সেই পরমার্থ সত্য নিত্যোপলব্ধি স্বরূপ আত্মাই আমি! যাহার এইরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তিনিই মুক্ত। তাই মুক্তপুরুষ উচ্চকণ্ঠে বলিয়াছেন;—

"শ্লোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যদুক্তং গ্রন্থ কোটিভিঃ।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥"

অর্থাৎ—অসংখ্য গ্রন্থে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমি শ্লোকার্দ্ধে বলিতেছি;—"ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, এবং ব্রহ্ম ভিন্ন জীব আর কেহ নহে।" বেদ-বেদান্ত এই অধ্যাত্ম-বিজ্ঞান প্রকাশ করিয়াছেন; প্রকাশ করিয়া মানবকে এক নূতন চক্ষু দিয়াছেন। তাহাই গুরুনেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। সদ্‌গুরুর কৃপায় জীবের এই দিব্য চক্ষু উন্মিলিত হইলে, জীব আত্ম-স্বরূপ লাভ করিয়া কৃত-কৃতার্থ হইয়া মুক্ত হয়। যথাঃ—

ভিদ্যন্তে হৃদয়গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মানি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥
শ্রুতি।

পরাবর—অর্থাৎ কার্য্যকারণ স্বরূপ এই পরমাত্মা জীব কর্ত্তৃক অধিগত হইলে, তাঁহার হৃদয় দ্বিধাকৃত হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয় এবং ত্রিবিধ কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়; সুতরাং তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, তিনি নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে।

অতএব একমাত্র বেদান্ত প্রতিবাদিত ব্রহ্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়। সেই জ্ঞান দ্বিবিধ; এক—পরোক্ষ জ্ঞান, অপর—অপরোক্ষ জ্ঞান। প্রথমতঃ ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধ হইয়া পরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, তৎপরে যখন ব্রহ্মস্বরূপ—স্বস্বরূপে উপলব্ধি হয়, তখন অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মিয়া নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করেন। ব্যবহারিক দশায় জীবেশ্বরে স্বগত জীবেশ্বর ভেদ। ভেদ;—স্থূল কথায় ব্রহ্ম খাঁটি সোণা আর জীব খাদ মিশান

সোণা। তবে কেহ অল্প খাদের, আর কেহ বা অধিক খাদের, তাই জীবে জীবে বিভেদ দৃষ্ট হয়। অধিক খাদে, অল্প মূল্যের সোণা, আর অল্পখাদে অধিক মূল্যের সোণা। কিন্তু খাঁটি সোণাকেও সোণা বলে, আর অল্পাধিক যেরূপ খাদ মিশানই হউক, তাহাকেও সোণা বলে। তবে তাহাদের মধ্যেও স্বগত ভেদ আছে,—বর্ণের ও গুণের পার্থক্য আছে। কিন্তু স্বর্ণকার যেমন আগুণে গলাইয়া পদার্থ বিশেষের সাহায্যে তাহাকে পাকা সোণা করিতে পারে এবং তখন খাঁটি সোণার সহিত কোন পার্থক্য থাকে না; তদ্রূপ জীব বাসনা-কামনার খাদে ব্রহ্ম হইতে স্বগত-ভেদ-সম্পন্ন,—সেই বাসনা-কামনার খাদ জ্ঞানের হাপরে গলাইয়া দ্রবীভূত করিতে পারিলে, মুক্ত হইয়া জীব যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ম হইয়া থাকে। ইহাই মোক্ষ লাভ, ইহারই নাম কৈবল্য প্রাপ্তি, ইহাতেই দ্বৈত নিরোধ বা অদ্বৈত সিদ্ধি।

যল্লাভান্নাপরো লাভঃ যৎসুখান্নাপরং সুখং।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্ ব্রহ্মেত্যবধারয়ঃ॥

অর্থাৎ—যাঁহার লাভ হইতে আর লাভ নাই, যাঁহার জ্ঞান হইতে আর জ্ঞান নাই, যে সুখ হইতে আর সুখ নাই তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। সুতরাং ব্রহ্মে আত্মস্বরূপ উপলব্ধি অপেক্ষা আর পরম পুরুষার্থ কি হইতে পারে?—ইহারই নাম নির্ব্বাণ মুক্তি।

আত্মজ্ঞান দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। আবার ভক্তি দ্বারা সেই জ্ঞান লাভ

ভক্তিই জ্ঞান লাভের উপায়।

হইয়া থাকে। ভগবানে, আত্ম বা ব্রহ্মতত্ত্বে প্রাণের প্রবল অনুরাগ, পরা অনুরক্তি বা ঐকান্তিক ভক্তি না জন্মিলে জ্ঞান কদাচ প্রকাশ হইতে পারে না। যথা:—

জ্ঞানাৎ সংজায়তে মুক্তি ভক্তির্জ্ঞানস্য কারণম্
ধর্ম্মাৎ সংজায়তে ভক্তি ধর্ম্মোযজ্ঞাদি কোমতঃ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যজ্ঞাদি দ্বারা ধর্ম্মলাভ, ধর্ম্মহইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান এবং জ্ঞান হইতেই মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। মুক্তির উপায় জ্ঞান, জ্ঞানের উপায় ভক্তি, সুতরাং ভক্তিই মুক্তির কারণ। অতএব যে সাধকোত্তম মুক্তি ইচ্ছা করিবে, সে সদ্ভক্তি পরায়ণ হইয়া তাঁহার পূজাদি প্রসঙ্গে প্রীতযুক্ত মানস হইবে। কায়মনোবাক্য দ্বারা তাঁহাকে আশ্রয় করিবে, সর্ব্বদা তাঁহাতে মনোবিধানের চেষ্টা করিবে এবং তদ্গত প্রাণ হইবে। সর্ব্বদা তাঁহার প্রসঙ্গ—তাঁহার গুণগান ও তাঁহার নামজপে সমোৎসুক হইবে। স্বীয়-স্বীয় বর্ণাশ্রমোচিত ও বেদবিহিত এবং স্মৃত্যানুমোদিত পূজা, যজ্ঞাদি দ্বারা তাঁহারই অর্চ্চনা করিবে, অর্থাৎ—কামনা বিরহিত হইয়া ঐ সমস্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান ভগবৎ প্রীত্যর্থই করিবে। তাহার দ্বারা ক্রমশঃ যখন ভক্তি দৃঢ়তরা হইবে, তদনন্তর তত্ত্বজ্ঞান হইবে; সেই তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। ভক্তিলাভ হইলে আর বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্ম, তপস্যা, যোগ, যাগ, পূজাদিতে প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্নযায়তে॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১১।২০।৯।

"যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অর্থাৎ—বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য না জন্মে ও যদবধি আমার কথাদিতে

শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকল করিবে।" এই প্রকার শাস্ত্রবিধি বিহিত কর্ম্ম করিয়া যখন অন্তঃকরণ নির্ম্মল হইবে, তখন ভক্তি উদ্রিক্ত হইয়া সর্ব্বদা ইচ্ছা হইবে যে, কতদিনে পরম ধন লাভ করিব। তখন আর যাবতীয় জগতের সকলেরই প্রতি বৈরাগ্য হইয়া, যদ্দ্বারা ভগবানের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ নিত্যবিগ্রহে মনোনিবেশ হয়, তদুপযোগী বেদান্তাদি শাস্ত্রে রুচি হয়। গুরূপদেশ সহকারে ঐ সকল অধ্যাত্মশাস্ত্রের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহার নিত্য কলেবর—সেই অপার আনন্দ সাগর অত্যল্প কালের জন্য কোনও সময়ে অন্তঃকরণে স্পর্শ হয়; তাহাতেই জগতের যাবতীয় পদার্থকে অত্যন্ত অযথা সুখের কারণ বোধ হয়, তজ্জন্য কোন বস্তুতে অভিলাষ থাকে না; সুতরাং কামনা পরিত্যাগ হইয়া যায়। সমুদয় জীব-জগতে ভগবৎ-সত্তা নিশ্চয় হইয়া সকল জীবের প্রতিই পরম যত্ন উপস্থিত হয়; সুতরাং হিংসাও পরিত্যাগ হয়। এবম্প্রকার ভাবাপন্ন হইলেই তত্ত্ববিদ্যা আবির্ভূতা হন, ইহাতে সংশয় নাই। তত্ত্বজ্ঞান উপস্থিত হইলেই তাঁহার নিত্যানন্দ বিগ্রহ যে পরমাত্মভাব তাহাই সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ হয়; তাহাতেই সাধকের জীবন্মুক্তি লাভ হইয়া থাকে।

মুক্তির কারণ স্বরূপ যে ভক্তি, সহস্র সহস্র মনুষ্যের কেহ ভগবানে সেই ভক্তিযুক্ত হন; সহস্র সহস্র ভক্তিযুক্ত ব্যক্তির আবার কেহ তত্ত্বজ্ঞ হন। ভগবানের যেরূপ পরম সূক্ষ্ম, সুনির্ম্মল, নির্গুণ, নিরাকার, জ্যোতিঃস্বরূপ, সর্ব্বব্যাপী অথচ নিরংশ, বাক্যাতীত, সমস্ত জগতের অদ্বিতীয় কারণ স্বরূপ, সমস্ত জগতের আধার, নিরালম্ব, নির্ব্বিকল্প, নিত্য চৈতন্য, নিত্যানন্দময়, ভগবানের সেই রূপকে মুমুক্ষু ব্যক্তিরা দেহবন্ধ বিমুক্তির জন্য অবলম্বন করেন। মায়ামুগ্ধ ব্যক্তিরা সর্ব্বগত অদ্বৈত স্বরূপ পরমেশ্বরের অব্যয় রূপকে জানিতে পারে না; কিন্তু যাহারা ভক্তি পূর্ব্বক ভগবান্‌কে ভজনা করে, তাহারাই তাঁহার পরমরূপ অবগত হইয়া মায়াজাল হইতে উত্তীর্ণ হয়। সূক্ষ্মরূপের ন্যায় স্থূলরূপেও তিনি এই সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; সুতরাং সমস্তরূপই তাঁহার স্থূলরূপের মধ্যে গণ্য, তথাপি আপন আপন গুরূপদিষ্ট ধ্যেয় মূর্ত্তির আরাধনা করিতে হইবে; কারণ উহাই শীঘ্র মুক্তি দানে সমর্থ। এইরূপ উপাসনা করিতে করিতে যখন গাঢ়তরা ভক্তির উদয় হয়, তখন পরমাত্ম স্বরূপ ইষ্টদেবতার সূক্ষ্মরূপ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। তখন জগতের কোনও রমণীয় বস্তুকে তদপেক্ষা রমণীয় বলিয়া বোধ হয় না,—জগতের কোনও লাভকে তল্লাভ হইতে অধিক জ্ঞান হয় না; মনপ্রাণ তাঁহার প্রেমরস মাধুর্য্যে চিরকালের জন্য ডুবিয়া যায়। তাহাতে সেই মহাত্মারা দুঃখালয় অনিত্য পুনর্জ্জন্ম আর ভোগ করেন না। অনন্যমনা হইয়া যে ব্যক্তি ভগবান্‌কে সর্ব্বদা স্মরণ করেন, তিনি অচিরে এই দুস্তর সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার হইয়া থাকেন। অর্জ্জুনের নিকট শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন;—

> তেষাং সতত যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকং।
> দদামি বুদ্ধি যোগন্তং যেন মামুপযান্তি তে।
>
> শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতা, ১০।৯

যাঁহারা আমাকে সতত শ্রদ্ধার সহিত ভজনা করেন, আমি তাহাদিগকে এরূপ বুদ্ধি

(তত্ত্বজ্ঞান) প্রদান করি যাহাতে তাহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন।" সুতরাং ভক্তিই যে একমাত্র মুক্তির কারণ, তাহা অবিসংবাদী রূপে প্রমাণিত হইল। তত্ত্বদর্শী অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন ;—"হে কৃষ্ণ! যাহারা তদগত চিত্তে তোমার উপাসনা করে এবং যাহারা কেবল অক্ষর ও অব্যক্ত ব্রহ্মের আরাধনা করিয়া থাকে, এই উভয়বিধ সাধকের মধ্যে কাহারা শ্রেষ্ঠ-যোগী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয়?" তদুত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন ;—"হে অর্জ্জুন! যাহারা আমার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত ও নিবিষ্টমনা হইয়া, পরমভক্তি সহকারে আমাকে উপাসনা করিয়া থাকে, তাহারাই প্রধান যোগী। আর যাহারা সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন, সর্ব্বভূতের হিতানুষ্ঠানে নিরত, ও জিতেন্দ্রিয় হইয়া অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য, অব্যক্ত, সর্ব্বব্যাপী, নির্ব্বিশেষ, কূটস্থ এবং নিত্য পরব্রহ্মের উপাসনা করে, তাহারাও আমাকেই প্রাপ্ত হয়। তবে দেহাভিমানিরা অতিকষ্টে অব্যক্ত গতি লাভ করিতে সমর্থ হয়; অতএব যাহারা অব্যক্ত ব্রহ্মে আসক্তমনা হয়, তাহারা অধিকতর দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। কিন্তু যাহারা মৎপরায়ণ হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্ম সমর্পণ পূর্ব্বক একান্ত ভক্তিসহকারে আমাকেই ধ্যান করে, আমি তাহাদিগকে অচিরকাল মধ্যে মৃত্যুর আকর সংসার হইতে মুক্ত করি।"

ভক্তি পথে মুক্তি লাভ করাই সহজ।

সর্ব্ব সমঞ্জসা মুক্তিপথ প্রদর্শক শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—"মুক্তি লাভের যত প্রকার কারণ শাস্ত্রকারগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে ভক্তিই শ্রেষ্ঠা। যথা :—

জ্ঞানাবতার শঙ্করাচার্য্যের মতে ভক্তিই মুক্তিলাভের মুখ্য কারণ।

মোক্ষকারণ সামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
বিবেক চূড়ামণি। ৩২।

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। ভগবতী গৌরী দেবীও গিরিরাজের নিকট বলিয়াছিলেন ;—

ভবেন্মুমুক্ষু রাজেন্দ্র ময়ি ভক্তিপরায়ণঃ।
মদর্চ্চা প্রীতি সংসক্তমানসঃ সাধকোত্তমঃ॥
শ্রীমদ্ভগবতী গীতা, ১৫। ৫৭।

হে রাজেন্দ্র! মুক্তিলাভে ইচ্ছা থাকিলে ভক্তিপরায়ণ হইয়া আমার অর্চ্চনাতেই মনোনিবেশ করিতে হইবে। তত্ত্বজ্ঞানের বিকাশ হইলেই মুক্তি হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রধান সাধনই ভক্তি, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রানুমোদিত। ভক্তি-যোগেই মানুষ আপন আত্মা, আপন ধর্ম্ম, আপন জ্ঞান, কুল-শীল, জাতি-খ্যাতি, মান-যশঃ, পুত্র-কলত্রাদি ভগবচ্চরণে অর্পণ করিয়া তাঁহার স্বরূপানন্দে মত্ত হইতে পারে। ভক্তিযোগেই মানুষ ভগবানের অসমোর্দ্ধ প্রেম-রস-মাধুর্য্যে প্রমত্ত হইয়া আপনার জন্ম জন্মান্তরের সংস্কার মুছিয়া,—বর্ত্তমান জীবনের সংস্কার ঘুচাইয়া, মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। ব্রজের কৃষ্ণপ্রেম-পাগলিনী আভির-রমণিগণ শ্রীকৃষ্ণের বিরহে আত্মহারা হইয়া তদীয় ধ্যান-মনন করিতে করিতে আপনাদিগকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; এবং তাঁহার লীলাদির অনুকরণ করিয়াছিলেন। মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব ভগবৎ-প্রেমে উন্মত্ত হইয়া আপনাকে ভুলিয়া ভগবানের মহাভাবে

স্বীয় মাতার মস্তকে আপন পদস্পর্শ করাইয়া আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। সুতরাং ভক্তি-যোগেই স্বরূপতত্ত্ব লাভ করিয়া স্বল্পায়াসে মোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। অতএব মুক্তির প্রধান কারণই যে ভক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ মুক্তিদাতা পরমেশ্বরে ভক্তিপরায়ণ না হইয়া অন্য উপায়ে মুক্তি অন্বেষণ করে, তাহারা ঘৃত পরিত্যাগ করিয়া এরণ্ড তৈল ভক্ষণ করিয়া থাকে মাত্র; কিন্তু নিরতিশয় আনন্দ উপভোগ করিয়া, তাহারা সংসারেই কৃত-কৃতার্থ হওয়া দূরে থাক, সাতিশয় দুঃখই ভোগ করে। যেন সর্ব্বদা স্মরণ থাকে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীমুখে বলিয়াছেন ;—

> তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্ব ভাবেন ভারত।
> তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতং ॥
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ১৮। ৬২।

হে ভারত! তুমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহারই (পরমেশ্বরের) শরণাপন্ন হও, তাঁহার প্রসাদে পরাশান্তি ও শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে। ভগবতী গৌরীদেবীর শ্রীমুখ-বিগলিত সুধাধারা স্বরূপ তত্ত্বোপদেশ হইতে আবার বলি—যেন স্মরণ থাকে—

> কিন্ত্বেত দুর্লভং তাত মদ্ভক্তি বিমুখাত্মনাং।
> তস্মাদ্ভক্তিঃ পরাকার্য্যা ময়ি যত্নাৎ মুমুক্ষুভিঃ ॥
> শ্রীমদ্ভগবতী-গীতা, ১৩।৬৬।

হে পিতঃ! যাহারা আমার প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন নহে, তাহাদিগের মুক্তিলাভ নিতান্তই দুঃসাধ্য; অতএব মুমুক্ষুব্যক্তিগণ আমার প্রতি যত্নপূর্ব্বক ভক্তিপরায়ণ হইবে। "সকলের মূল ভক্তি, মুক্তি তার দাসী" এই প্রচলিত বচনটী মুমুক্ষুব্যক্তির স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা মুক্তি সাধিত হয়। আবার ভক্তি দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান বিকশিত হয়। অতএব মুমুক্ষুব্যক্তি প্রথমতঃ বেদ-বিধি অনুসারে বর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়া-কলাপাদি সম্পন্ন করিবে; তৎফলে চিত্তশুদ্ধি হইলে ভক্তির সঞ্চার হইবে। তৎপরে যখন মুক্তি-লাভে বলবতী ইচ্ছা জন্মিবে, তখন আত্ম-স্বরূপ লাভের জন্য বেদান্তাদি শাস্ত্রানুসারে জ্ঞানালোচনা করিবে। শমদমাদি সম্পন্ন বিবেক-বৈরাগ্যযুক্ত ব্যক্তিই মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইলে জ্ঞানালোচনার অধিকারী হন। নতুবা গুণযুক্ত ব্যক্তিকে জ্ঞান কথা বলিয়া বুদ্ধি-বিভেদ জন্মাইতে শাস্ত্রকারগণ নিষেধ করিয়াছেন যথাঃ—

> ন বুদ্ধিভেদঞ্জনায়ে কর্ম্ম সঙ্গিনাম্।
> শ্রুতি।

(ক্রমশঃ)

—:0:—

Regd. No. D. 65.

৫ম বর্ষ। মাঘ। ১০ম সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

—:0:—

শান্তি—আশ্রমের
শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।

যোরহাট,
দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।
শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য।০ আনা।

বিনামূল্যে

—:0:—

হাঁপানী আরোগ্যের যন্ত্র দেওয়া হয়।

বৈজ্ঞানিক শক্তিপ্রভাবে আবিস্কৃত এক অভিনব যন্ত্রের সাহায্যে ঔষধ প্রয়োগে দুরারোগ্য মহাযন্ত্রনাদায়ক হাঁপানী ব্যারাম অত্যাশ্চর্য্যরূপে অত্যল্পকালে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইতেছে। উক্ত যন্ত্রস্থিত মহৌষধ নাসারন্ধ্রের যোগে টানিলে বক্ষঃস্থলে রোগের মূলস্থানে প্রবেশ করিয়া প্রক্রিয়াকরতঃ ধূমবৎ পদার্থে পরিণত হইয়া মুখের দ্বারা ধূম বহির্গত হয় এবং হঠাৎ ফিট ও তদুপসর্গাদি বন্ধ হইয়া হাঁপানী বিদ্যুতের ন্যায় দুর হইয়া যায়। রীতিমত ব্যবহারে নির্দ্দোষে আরোগ্য হয়। ব্যবহারের নিয়মাবলী ও সম্পূর্ণ চিকিৎসার ৪ আউন্স ঔষধাদি সহ যন্ত্রের মূল্য সডাক ৫২৲ টাকা। নূতন যন্ত্র ও ঔষধাদি বিক্রয়ার্থে আমার নিকটে সর্ব্বদা মজুত থাকে। অপরিচিত স্থলে প্রতিভূস্বরূপ ২৫॥৶ অগ্রিম প্রেরণ করিলে ১ সপ্তাহের জন্যে যন্ত্রটী পরীক্ষার্থে পাঠান হয়। যন্ত্র ফেরত দিলে ডাকখরচ বাদ বক্রী ২৫৲ টাকা ফেরত দেওয়া যায় ও ঔষধের মূল্য গ্রহণ করা হয় না ইতি।

শ্রীরমণ চন্দ্র চৌধুরী
ডিপো ষ্টোর আপিস এ, বিঃ, রে,
পোঃ আঃ লামডিং, জিলা নওগাঁও,
আসাম।

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ১০ম সংখ্যা।	মাঘ।	বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

মুক্তির স্বরূপ ও তল্লাভোপায়।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

মুমুক্ষুব্যক্তি বিবেক-বৈরাগ্য-যুক্ত হইয়া জ্ঞানালোচনা করিবে। আত্মানাত্ম বিচারের নাম বিবেক, এবং আত্ম বস্তুতে লক্ষ্য রাখিয়া অনাত্মীয় বস্তুতে যে অনুরাগ পরিহার, তাহাই বৈরাগ্য। একমাত্র ভক্তি সঞ্চারেই বৈরাগ্য সাধিত হয়। আত্মানাত্ম-বিবেক ভক্তি হইতে দ্বারা যেরূপ অনাত্মীয় বস্তুতে বৈরাগ্য জন্মে। বৈরাগ্যের উদয় হয়, সেইরূপ ভক্তি দ্বারাও ভগবান্ ব্যতীত অন্য বিষয়ে বিরাগ জন্মিয়া থাকে। বিবেক ও ভক্তি, এই দুই বৃত্তির অনুশীলনেই বৈরাগ্য উদয় হয়। তবে বিবেক-জাত বৈরাগ্যে এবং ভক্তিজাত বৈরাগ্যে স্থূলতঃ পার্থক্য আছে। আমরা পুরাণের

হরগৌরী মূর্ত্তি

আদর্শ করিয়া এ তত্ত্ব বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছি। হর ও গৌরী উভয়েই সংসারত্যাগী—শ্মশানবাসী; উভয়েই বৈরাগী বলিয়া পরিচিত। কিন্তু হরের বৈরাগ্য বিবেক-লব্ধ, আর গৌরীর বৈরাগ্য ভক্তিমূলক—প্রেমই তাহার মূল। যোগেশ্বর হর আত্মনাত্ম-বিবেক দ্বারা নিত্য আত্মস্বরূপ অবগত হইয়া সমস্ত অনাত্মীয় পদার্থে বিরাগ বশতঃ আত্মারাম হইয়াছেন। তাই বিষয়ের অনিত্যতা জাগরূক রাখিবার জন্য স্বর্ণপুরী ও কুবের রক্ষিত ভাণ্ডার পরিত্যাগ করিয়া, মরণের মহাক্ষেত্র মহাশ্মশানে বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। নরকপাল তাহার জলপাত্র. মানবের দগ্ধাবশেষ চিতাভস্ম তাঁহার

অঙ্গের ভূষণ,—কখনও দ্বীপি-চর্ম্মবাসে কটি-দেশ আবৃত,—কখনও বা দিগম্বর। ভোগীর পক্ষে কি কর্কশ—কি কঠোর—কি ভীষণ মূর্ত্তি; আর প্রেমময়ী গৌরী হরের জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িয়া তাঁহার অনুরাগে উন্মাদিনী হইয়া শ্মশানবাসী শিব সঙ্গে সোণার অঙ্গে রঙ্গে ছাই মাখিয়াছেন। গৌরী শিবকে চান,—নিত্যানিত্য বিচারের তাঁহার অবসর নাই; শিবকে পাইবার জন্য তিনি সব করিতে পারেন। শিব সন্ন্যাসী, তাই তিনিও শশ্মানবাসিনী, আজ শিব রাজা সাজিলে বিনা প্রতিবাদে গৌরী রাজরাজেশ্বরী রূপে তাঁহারই প্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্তা হইবেন। গৌরীর ভক্তির—প্রেমের ত্যাগ, তাই স্বরূপেই শিব পার্শ্বে শোভা পাইতেছেন; শিবের ন্যায় বিরূপ হইবার প্রয়োজন হয় নাই। আহা, কি সুন্দর দৃশ্য! প্রেম বিবেকের অনুসরণ করিতেছেন, বিবেক তাঁহাকে বুকে চাপিয়া ধরিয়া রাখিয়াছেন। এই হরগৌরী সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞানলাভ করিতে পারিলে ব্রহ্মতত্ত্ব, জগতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, বিবেক-বৈরাগ্যতত্ত্ব, প্রেমভক্তিতত্ত্ব, প্রভৃতি কোন তত্ত্ব বুঝিতেই বাকি থাকে না। এ বিষয়ে শত মুখে পুরাণকারের কৃতিত্বের প্রশংসা করিতে হয়। হিন্দু ঋষি ব্যতীত এরূপ চিত্র কবিত্বের তুলিতে আর কেহ চিত্রিত করিতে পারেন নাই।

পাঠক! ভক্তির বৈরাগ্য বোধ হয় বুঝিতে পারিয়াছেন? ভক্তির বৈরাগ্য অপ্রামাণ্য নহে। পরানুরক্তি বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আসক্তি এবং ভগবানের দিকে গতি হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়। সুতরাং আসক্তি ও ভক্তি একাধারে একই সময়ে থাকিতে পারে না, একথা বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। আবার আসক্তি পরিহার ও বিষয়-বিরক্তি একই কথা। সুতরাং ভক্তি লাভ করিতে পারিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয় হয়। বরং বিবেকজ বৈরাগ্য অপেক্ষা ভক্তিজাত বৈরাগ্য স্বাভাবিক। কর্ত্তব্যজ্ঞানে ও প্রাণের টানে যে বিভেদ, বিবেক ও ভক্তি এই উভয়জাত বৈরাগ্যেও পরস্পর সেইরূপ বিভিন্নতা। পরের ছেলে মরিলে কর্ত্তব্যজ্ঞানে শোকসভা করিয়া শোক প্রকাশ করিতে হয়; কিন্তু আপন ছেলে মরিলে আর শোকসভার প্রয়োজন হয় না, ছিন্ন-কণ্ঠ কপোতের ন্যায় ধূলায় পড়িয়া লুটাইতে দেখা যায়; কারণ এখানে যে প্রাণের টান। পরের ছেলেকে বাঘে ধরিলে বলবান্ পুরুষেরও কর্ত্তব্যজ্ঞানে বিচার আনিয়া উপস্থিত করে,—তাহাকে বাঘের ও নিজের শক্তি সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে হয়; কিন্তু সেই ছেলের ষোড়শী যুবতী মাতা—যিনি কুক্কুরের ডাকে শঙ্কিতা হইয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করেন—সে সময়ে নিকটে থাকিলে তৎক্ষণাৎ সন্তানের প্রাণরক্ষার্থ বাঘের মুখে গমন করিতেন, বাঘের বা নিজের শক্তি সম্বন্ধে বিচার করিবার সময়ই হইত না। সুতরাং বিবেক অপেক্ষা ভক্তিজাত বৈরাগ্যই স্বাভাবিক। ভক্ত বিষয় সমূহে আসক্ত বা বিরক্ত নহে; তাই বিবেকীর কঠোরতা ও কর্কশতার পরিবর্ত্তে প্রেমিকের সৌন্দর্য্য ও মধুরতা দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভগবানের জন্য ভক্ত সব করিতে পারেন,—তাঁহাকে ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠও ভক্তের স্পৃহনীয় নহে, আবার তাঁহাকে পাইলে তিনি নরকে যাইতেও

কুণ্ঠিত হন না। তাই বৈষ্ণব ঋষি বলিয়াছেন;—

অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপ যুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণ সম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

অনাসক্ত হইয়া যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করতঃ ভগবান্ সম্বন্ধে যে আগ্রহ জন্মে, তাহাকেই বৈরাগ্য বলে। বিবেকী আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ করতঃ অন্তর্ম্মুখীন্ হইয়া পড়েন, আর ভগবান্‌কে বুকে করিয়া ভক্ত সবই ভোগ করিয়া থাকেন। ভগবান্‌কে বুকে করিয়া ভক্ত মহাশ্মশানেও সুধাংশু-সৌন্দর্য্য উপভোগ করেন, আবার তাঁহাকে হারাইলে নন্দনকাননও ভক্তের নিকট মরুভূমি হইয়া যায়। বিবেকী আত্মস্বরূপ চাহেন; ভক্ত ভগবান্‌কে বুকে করিতে ব্যাকুল। কাজেই তাঁহাদের লক্ষ-বৈরাগ্যেও কিছু প্রভেদ আছে। তাই ত্যাগী সম্প্রদায়ের মধ্যে সাধন ভেদে—ভাবভেদে কেহ কঠোর,—কেহ সরস, কেহ শুষ্ক,—কেহ তাজা,—কেহ বিলাসী,—কেহ উদাসী, কেহ গম্ভীর,—কেহ বাচাল, কেহ রসাল,—কেহ ভয়াল, কেহ শিষ্ট,—কেহ ভ্রষ্ট, কেহ রুষ্ট,—কেহ তুষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকৃতি দৃষ্ট হয়।

ভাবভেদে বৈরাগ্যের বিভিন্নতা।

বিবেকী বা ভক্তের লক্ষ-বৈরাগ্যে বিভিন্নতা থাকিলেও মুক্তিপথে যে বৈরাগ্যের প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে কোন কারণে বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান বিকাশিত হইয়া মুক্তি প্রদান করিবে। মুক্তিপ্রদ তত্ত্ব-জ্ঞান-প্রকাশক বৈরাগ্য কাহাকে বলে;—

ত্যাগ-বৈরাগ্য ব্যতীত মুক্তির আশা বৃথা।

ব্রহ্মাদি স্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধিনির্ম্মলং॥

অপরোক্ষানুভূতি, ৪।

কাকবিষ্ঠাতে যদ্রূপ কাহারও প্রবৃত্তি জন্মে না, তদ্রূপ সত্যলোক হইতে মর্ত্ত্যলোক পর্য্যন্ত বিষয়ে যে অনিচ্ছা ভাব, তাহারই নাম বৈরাগ্য। এই বৈরাগ্য অতি নির্ম্মল পদার্থ। বৈরাগ্যের দ্বারা মনোবৃত্তির নিরোধ হইয়া থাকে; অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত বহির্গতি ফিরিয়া অন্তর্ম্মুখী গতি জন্মে। তখন কেবল আত্মার প্রতিই চিত্তের অভিনিবেশ হইতে থাকে। এবম্প্রকার আত্মার প্রতি চিত্তের অভিনিবেশ দৃঢ় করিবার জন্য প্রতিনিয়ত যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। বৈরাগ্য ব্যতীত কখনই সংসারাসক্তি পরিত্যাগ হয় না, আবার সংসারাসক্তি পরিত্যাগ না হইলেও নিবৃত্তি পথাবলম্বনে মুক্তিলাভে সমর্থ হওয়া যায় না; সুতরাং যত্নের সহিত বৈরাগ্যাভ্যাস করিতে হয়। এই দারুণ সংসার-যাতনার নিবারণ জন্য শাস্ত্রালোচনা কর, সাধুসঙ্গ কর, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কর এবং তপস্যা দ্বারা শুভবুদ্ধির উদয় কর, তাহা হইলে আপনিই বৈরাগ্য উদয় হইবে। সাধুসঙ্গ দ্বারা বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হইয়া আপনা আপনি যথাকালে অঙ্কুরিত হয়। আর ঈশ্বর বিষয়িনী ভক্তি সংযোগে শীঘ্রই জ্ঞানের কারণ বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপাদিত হইয়া থাকে। যথা:—

বাসুদেবে ভগবতী ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।
জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।৭।

এইরূপ সাত্ত্বিক বৈরাগ্য ভিন্ন রাজসিক বা তামসিক বৈরাগ্য অবলম্বন দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না।

নৈমিত্তিক বৈরাগ্যের লক্ষণ।

রাজসিক ও তামসিক বৈরাগ্যই শাস্ত্রে নৈমিত্তিক বৈরাগ্য নামে উক্ত হইয়াছে। এই অবনিমণ্ডলে মনুষ্য সকলের কখন কোন না কোন কারণ বশতঃ নৈমিত্তিক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়া থাকে। শ্মশানে মৃতদেহ দাহ করিতে যাইয়া, কিম্বা স্ত্রী পুত্রাদির আকস্মিক মৃত্যুতে অথবা শত্রু কর্ত্তৃক কি দৈব-দারিদ্র্যতায় উৎপীড়িত হইয়া যে বৈরাগ্য জন্মে এবং কুড়ে, অকর্ম্মা, কাপুরুষের বৈরাগ্যকে নৈমিত্তিক বৈরাগ্য বলে। কেহ কেহ ইহাকে মর্কট বা ফল্গুবৈরাগ্য বলিয়া থাকে। সেরূপ বৈরাগ্য দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না, কারণ উহা কেবল বাসনার অপূরণে, অথবা ভোগ্যবস্তুর অভাবে, কিম্বা কোনরূপ আশঙ্কায় উপস্থিত হয় মাত্র। তাহারা কিছুদিন পরে আবার বিষয়াসক্ত হইয়া পড়ে, নতুবা ত্যাগীসমাজে কলঙ্ক-কালী লেপন করিয়া বেড়ায়। তবে কাহারও কাহারও এরূপ বৈরাগ্যও কাকতালীয়ের ন্যায় (পক্কতাল আপনিই পড়ে, কাক নিমিত্ত মাত্র; তদ্রূপ ইহাদেরও শুভফল পরিপক্ক হইয়া বৈরাগ্যবীজ সঞ্চিত হইয়াছিল, বন্ধু বিয়োগাদি নিমিত্ত মাত্র।) প্রকৃত বৈরাগ্য পরিণত হয়। যে বৈরাগ্য নিমিত্ত রহিত অর্থাৎ—যাহা অকারণে পবিত্র মানসক্ষেত্রে আপনা হইতে উদিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক বৈরাগ্য। বর্ণাশ্রমোচিত কর্ম্মদ্বারা পাপরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়া চিত্তশুদ্ধি না হইলে অনিমিত্তক সাত্ত্বিক বৈরাগ্য উপস্থিত হয় না।

বৈরাগ্যের উদয় হইতে পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত মহর্ষি পতঞ্জলি কর্ত্তৃক চারি স্তরে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম যতমান, দ্বিতীয় ব্যতিরেক, তৃতীয় একেন্দ্রিয় ও চতুর্থ বশীকার।

বৈরাগ্যের স্তর বিভাগ ও তাহার লক্ষণ।

প্রথম অবস্থায় বৈরাগ্য অঙ্কুরিত হইয়া বিষয় বাসনাকে নষ্ট করিবার চেষ্টা জন্মে, এই অবস্থার নাম যতমান বৈরাগ্য। দ্বিতীয় অবস্থায় কতক বাসনা থাকে এবং কতক নষ্ট হইয়া যায়; যে গুলি থাকে, সেই গুলিকে নষ্ট করার নামই ব্যতিরেক বৈরাগ্য। তৃতীয় অবস্থায় সমস্ত বাসনা নষ্ট হইয়া যায়, কেবল সংস্কার মাত্র অবশিষ্ট থাকে, ইহাই একেন্দ্রিয় বৈরাগ্য। চতুর্থাবস্থায় সংস্কারটীও লয় প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ আদৌ কোন প্রকার বাসনার উদ্রেক হয় না। এই অবস্থাটী বৈরাগ্যের চরম, ইহাকেই বশীকার নামক উত্তম বৈরাগ্য বলে। যথাঃ—

দৃষ্টানুশ্রবিক বিষয় বিতৃষ্ণস্য বশীকার সংজ্ঞাবৈরাগ্যম্।
পাতঞ্জল দর্শন, ১।১৫।

দৃষ্ট বিষয় অর্থাৎ—ইহকালে যাহা দেখা ও ভোগ করা যায় এবং অনুশ্রাবিক অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে যে স্বর্গাদি ভোগ বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, এই দুইটী বিষয়ে বিতৃষ্ণা জন্মিলে সেই অবস্থাকে বশীকার বৈরাগ্য বলে। ইহাই বৈদান্তিকের "ইহমূত্রার্থফলভোগবিরাগ" রূপ উত্তম বিবিদিষা বৈরাগ্য। এইরূপ বৈরাগ্যই মানবের সংসার মূল ছেদন করিবার খড়্গ স্বরূপ। যাহার বৈরাগ্য জন্মে নাই, সে দেহবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে

পারে না। কারণ বৈরাগ্যযুক্ত হইলে বিজ্ঞান ও বাসনা সকল আপনা হইতেই ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। বাসনা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলেই নিস্পৃহ হওয়া হইল—নিস্পৃহ হইলেই আর কোনরূপ বন্ধন থাকে না, তখনই মুক্তি লাভ হয়। যথা :—

সমাধি মথ কর্ম্মানি মা করোতু করোতু বা।
হৃদয়ে নষ্ট সর্ব্বেহ মুক্ত এবোত্তমাশয়ঃ॥
মুক্তিকোপনিষৎ, ২।২২।

সমাধি অথবা কোন প্রকার ক্রিয়ানুষ্ঠান করা হউক বা না হউক যে ব্যক্তির হৃদয়ে কোন রূপ বাসনা উদিত না হয়, সেই ব্যক্তিই মুক্ত। কেন না অনাত্মবাসনা অর্থাৎ মিথ্যা সংসার-বাসনা সমূহ দ্বারা পরমাত্মবাসনা আবৃত আছে, এজন্য মুক্তি মার্গে ত্যাগ বৈরাগ্যই বৈরাগ্য দ্বারা অনাত্ম-সাধনার প্রধান অঙ্গ। বাসনা সকল বিনাশ প্রাপ্ত হইলে পর পর-মাত্মবাসনা স্বয়ং প্রকাশ পায়। লোকগত বাসনা, শাস্ত্রগত বাসনা এবং দেহগত বাস-নাদি দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত হওয়ায় প্রকৃত জ্ঞান জন্মে না। বৈরাগ্য সাধন দ্বারা বাসনা ক্ষয় হইলেই স্বয়ং আত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশ হইয়া মুক্তি প্রদান করে। সুতরাং মুক্তি-প্রদায়ক আত্মস্বরূপ তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য বৈরাগ্যাভ্যাস করা মুমুক্ষু ব্যক্তির কর্ত্তব্য। যাঁহাদিগের জন্মজন্মান্তরের সুকৃতির পরিপাকে আপনা হইতেই বৈরাগের সঞ্চার হয়, তাঁহা-রাই অতি ভাগ্যবান্ নির্ম্মলমানস মহাপ্রাজ্ঞ মহাত্ম। (ক্রমশঃ)।

———:0:———

মনে পড়ে কায়।

[১]

আজি মনে পড়ে কায়
নীরবে বসিয়া আমি ভাবিতেছি তায়
কালী মাখা হৃদি মাঝে
মধুর মোহিনী সাজে
এক কোণে টুকি মেরে হেলিয়ে দাড়ায়
ওই বুঝি ওই আমি খুজিতেছি যায়

[২]

আজি মনে পড়ে কায়
ও মধুর ছবি ছাড়ি কল্পিব কাহায়
ওই ওরি আগমনে ফুল পরিমল সনে
ওই দেখ মৃদু মন্দ মলয়েছে বায়
শ্রান্তি ক্লান্তি স্মৃতি ওরে হেরিয়ে পালায়

[৩]

আজি মনে পড়ে কায়
দূরে কি নিকটে আছি তাই ভাবনায়
পলকে পড়িলে যায় ভাবিগো হারাইয়ে যায়
সে কিগো তিলেক ছাড়া দূরে রহি যায়
তবু মন বিচলিত কাল মহিমায়

[৪]

আজি মনে মড়ে কায়
হাতে রাখি নিধি কেহ খুজিয়ে বেড়ায়
আমিও হয়েছি তাই
আমিও ভাবিগো তাই
মিছি মিছি কেঁদে মরি দুখ পায় পায়
তাইত আঁখির নীরে বুক ভেসে যায়

[৫]

আজি মনে পড়ে কায়
মন প্রাণ সযতনে ঢালি দিছি যায়
ওই সেই শান্তি প্রেম
মণি মাণিক্যতে হেম
মধুর লালিত্য-তারে তারেতে জড়ায়
কি আনন্দ কি মাধুরী তার কল্পনায়

[৬]

আজ মনে পড়ে কায়
কারে ডাকে হৃদিতন্ত্রি বাজে উভরায়
ওই সে আশার ছবি নিরাশা তমসা রবি।
ওই ত প্রাণের মাঝে লহরি খেলায়
হৃদয় চাতক বাঁচে আশা নিরাশায়।

—:0:—

গোপীভাবে প্রেমের সাধনা।

প্রেমসেবার আনন্দাস্বাদ হেতু কেবলা-ভক্তিমার্গের দাস্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের মধ্যে মধুরভাব শ্রেষ্ঠ। কেন না, মধুরভাবে ঐ ভাব চতুষ্টয়ই পর্য্যবেসিত হইয়াছে। তাই কোন প্রেমিকা রমণী ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন ;—

প্রেমময় ! পতিরূপে দেহ দরশন ;
পূরিবে সকল আশা মিটিবে মনন।
মাতারূপে সদা তব আহার যোগাব।
পিতাভাবে গুরু হ'য়ে উপদেশ দিব।
কন্যারূপে আব্দার কত যে করিব।
মার বুকে শিশু যথা সে ভাবে থাকিব।
সখীরূপে অকপটে সব কথা কব।
দাসী হ'য়ে চির দিন চরণ সেবিব।
পত্নীরূপে প্রেমময় বাঁধি আলিঙ্গনে,
অনন্ত জীবন রব মিলি তোমা সনে।
একাধারে সব রস মধুর ভাবেতে,
তাই চাই এই ভাবে তোমারে পূজিতে।

পাঠক ! মধুর ভাব শ্রেষ্ঠ কেন বোধ-হয় বুঝিতে পারিয়াছেন ? মধুরভাবে সব রসের সমাবেশ বশতঃ প্রেমসেবার পূর্ণতম আনন্দাস্বাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। হনুমানাদি যেরূপ দাস্যভাবের, শ্রীদামাদি যেরূপ সখ্য-ভাবের, নন্দ-যশোদাদি যেরূপ বাৎসল্যভাবের আদর্শ ; তদ্রূপ গোপী ও মহিষিগণ মধুর ভাবের আদর্শ। এই কামানুগা মধুরভাব দুই অংশে বিভক্ত ; এক—সম্ভোগেচ্ছাময়ী, অপর—তত্ত্বাবেচ্ছাময়ী। যাঁহারা রুক্মিণী প্রভৃতি মহিষিদিগের ভাবানুগত, তাঁহাদিগের ভক্তিকে সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে ; এই ভক্তিতে মহিষিদিগের ন্যায় কিয়ৎপরিমাণে স্ব-সুখ-বাঞ্ছা, মহিমজ্ঞান এবং লোকধর্ম্মা-পেক্ষা প্রভৃতি ভাব বিদ্যমান আছে, অপর যাহারা লোক-বেদাদি যাবতীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঐহিক-পারত্রিক সকল সুখসাধনে জলাঞ্জলি দিয়া নিষ্কামভাব ও পরম প্রেম-ময় স্বভাবের অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগের সেই ভক্তিকে তত্ত্বাবেচ্ছাময়ী ভক্তি বলে।

হ' ব্রজবাসী শ্রীরাধিকাদি গোপিগণে নিত্য ‍ মান রহিয়াছে। অতএব মহিষিদিগের ‍ হইতে সাধারণী কিম্বা সমঞ্জসারতি

উৎপন্ন হয় এবং গোপিদিগের ভাব হইতে সমর্থা রতি উৎপন্ন হয়। কেন না,—

আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥
কামের তাৎপর্য্য নিজ সম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য্য প্রেমত প্রবল॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

আত্মেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তির জন্য যে কার্য্য করা যায়, তাহাকে কাম বলে; আর ভগবানের প্রীতির জন্য যাহা করা যায়, তাহাকে প্রেম বলে। সমস্ত কার্য্য নিজ সম্ভোগ স্বরূপে প্রয়োগ না করিয়া কৃষ্ণ সুখ-তাৎপর্য্যে প্রয়োগ করিলে, তাহা হইতে সমর্থারতি উৎপন্ন হইয়া থাকে; পরে তাহাই গাঢ় হইয়া প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু মহিষিদিগের কথঞ্চিৎ স্ব-সুখবাঞ্ছা থাকায়, তাহা আর সমর্থারতিতে পর্য্যবসিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে একটু উচ্চ নীচতা আছে, লোকধর্ম্মাপেক্ষা আছে এবং তাহা স্বাভাবিকী বিধায় তেমন উদ্দাম-উচ্ছ্বাস নাই; কিন্তু গোপিদিগের ভাব ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহারা স্বামীপুত্র, ঘরবাড়ী, জাতিকুল, বেদবিধি, ধর্ম্মকর্ম্ম, লজ্জাশরম পরিত্যাগ করিয়া কুলটার ন্যায় ভগবানে আসক্ত হইয়া থাকেন। তাই প্রেমবতার গৌরাঙ্গদেব ভক্তগণকে উপদেশ দিয়াছিলেন;—

পরব্যসনিনী—নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্ম্মসু।
তদেবাস্বাদয়ত্যন্ত নব সঙ্গ রসায়নং॥

পরাধীনা রমণী গৃহকার্য্যে লিপ্তা থাকিলেও চিত্তমধ্যে যেমন নব সহবাস-রসের আস্বাদন করে,—সেইরূপ ভাবে বিষয় কর্ম্মে লিপ্ত থাকিয়াও সেই নব কিশোর শ্রীকৃষ্ণের প্রেমরসের আস্বাদন মনে মনে অনুভব করিও। তাই ভক্তিমার্গে ঐরূপ অবিধিপূর্ব্বক শাস্ত্রাচার সমাজনিয়ম প্রভৃতি বিচ্ছিন্নকারী পরকীয়া ভাব গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং স্বকীয়া মহিষিদিগের সম্ভোগেচ্ছাময়ী মধুর ভাব হইতে, পরকীয়া গোপিদিগের তত্তাবেচ্ছাময়ী মধুরভাবের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। অতএব মধুর ভাবের মধ্যে গোপিকানিষ্ঠভাব সোজাকথায় গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। শ্রীরাধিকাদি গোপিগণ গোপিভাবের আদর্শ। যথা—

ইহার মধ্যে রাধার ভাব সাধ্য-শিরোমণি।
অনন্ত শাস্ত্রেতে যার মহিমা বাখানি॥

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত।

ইহার মধ্যে অর্থাৎ—মধুরভাবের মধ্যে রাধার প্রেমই সাধ্যের শিরোমণি; তাই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা স্বামী, পুত্র, কুল, মান কিছুই চাহেন না—চাহেন কেবল শ্রীকৃষ্ণকে। কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন:—

আর এক অদ্ভুত গোপী ভাবের স্বভাব।
বুদ্ধির গোচর নহে যাহার প্রভাব॥
গোপিগণ করে যে কৃষ্ণ দরশন।
সুখবাঞ্ছা নাহি সুখ হয় কোটি গুণ॥
গোপীকা দর্শনে কৃষ্ণের যে আনন্দ হয়।
তাহা হইতে কোটিগুণ গোপী আস্বাদয়॥
তাঁ সবার নাহি কোন সুখ অনুরোধ।
তথাপি বাড়য়ে সুখ পড়িল বিরোধ॥
এ বিরোধের এই এক দেখি সমাধান।
গোপীকার সুখ কৃষ্ণসুখে পর্য্যসান॥

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত।

গোপিগণের কৃষ্ণদরশনে সুখের বাঞ্ছা নাই, কিন্তু কোটিগুণ সুখের উদয় হয়। বড়ই ভয়ানক কথা! ইহার ভাব অনুভব করা পাণ্ডিত্য বুদ্ধির সাধ্যায়ত্ত নহে, তাই অনেকে

গোপীভাবের নাম শুনিয়া হাস্য বিদ্রূপ করিয়া থাকেন। গোপিগণকে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণের যে আনন্দ হয়, তাহা হইতে গোপীদিগের কোটি-গুণ আনন্দের উদয় হইয়া থাকে। কেন? গোপিদিগের সুখ যে কৃষ্ণসুখে পর্য্যবেসিত। কৃষ্ণ সুখী হইয়াছেন দেখিয়া গোপিগণের সুখ; অর্থাৎ—তাঁহাদিগের স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদির সুখ নাই, কৃষ্ণের সুখই সুখ। কৃষ্ণময় সর্ব্বভুতের সুখে সুখী হইতে হইবে। ভাল কাজ করিয়াছি বলিয়া আনন্দিত হইলে হইবে না; আমার কার্য্যে বিশ্বরূপ ভগবানের সুখ হইয়াছে বলিয়া আমারও সুখ। আহা কি মধুর ভাব!—এই জন্যই গোপীভাব শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

গোপিগণের নিজের বলিতে কিছুই নাই; রূপ বল,—যৌবন বল,—শোভা—সৌন্দর্য্য, লালসা-বাসনা যাহা কিছু বল,—সমস্তই সেই শ্যামসুন্দরের জন্য। তাঁহারা কাজ করেন, সন্তান পালন করেন, গৃহের কর্ম্ম করেন, কিন্তু নিরন্তর প্রাণ সেই ভগবানের প্রেমরসে মজিয়া থাকে। তাঁহারই কথা, তাহারই কার্য্যের আলোচনা, তাঁহারই নাম গানে পরিতুষ্ট,—এইরূপ ভাবে যে ভক্ত সাধনা করেন, তিনিই পরম মুক্ত। আপনাকে স্ত্রীরূপে—আর পরমপুরুষ ভগবান্‌কে পুরুষ রূপে ভাবনা করিয়া,—তাঁহাতেই চিত্ত অর্পণ করিয়া,—তাঁহারই প্রেমে লীন হইলে নিরবচ্ছিন্ন বিশুদ্ধ আনন্দ লাভ করা যায়।

এই গোপীভাবনিষ্ঠ মধুর রসাত্মক ভক্তি হইতে মধুরা রতির উদয় হয়। এই রতি হইতে ভগবানের সহিত ভক্তের বিলাসের সূত্রপাত হয়। যথা:—

মিথোহরের্ম্‌গাক্ষ্যাশ্চ সম্ভোগস্যাদি কারণম্‌।
মধুরাংপরপর্য্যায়া প্রিয়তাখ্যোদিতা রতি॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু।

মধুরা রতিই শ্রীকৃষ্ণ ও তৎপ্রেয়সিগণের সম্ভোগের আদি কারণ। এই মধুরা রতিই যখন গোপিদিগের ন্যায় সম্পূর্ণরূপে স্ব-সুখ-বাসনাশূন্য হয় এবং সম্ভোগবাসনা যদি শ্রীকৃষ্ণের সম্ভোগবাঞ্ছার সহিত একতাভাব প্রাপ্ত হয়, তখন ইহা সমর্থা রতি বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। এই সমর্থা রতি প্রেম বিলাসে ক্রমশঃ পরিপক্ক হইয়া স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ ও ভাবে পর্য্যবেসিত হইয়া থাকে। অনন্তর ভাব আরও উৎকৃষ্ট দশা প্রাপ্ত হইলে মহাভাব নামে কথিত হয়। ইহাই গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থা রতির চরম বিকাশ।* সুতরাং গোপীভাবনিষ্ঠ সমর্থা রতি প্রৌঢ় মহাভাব দশা প্রাপ্ত হইলেই উহা প্রেম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

কামগন্ধশূন্য যে অনুরক্তি তাহার নাম প্রেম। এই ভাব যেখানে আছে, সেই স্থানেই প্রেম বলা যাইতে পারে। যাহা আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতিইচ্ছা তাহাই কাম। অতএব আত্মেন্দ্রিয়ের প্রীতি ইচ্ছা পরিশূন্য হইয়া যাহাতে অনুরক্তি হয়, তাহাতেই প্রেম হয়। আমি তাঁহাকে ভালবাসি, তাঁহার যে কাজ তাহাই আমার ভাল। সে আনন্দিত হইলে তবে ত আমার আনন্দ;—নতুবা জগতে আমার আর কি আনন্দ আছে? সে সুখী

* "মহাভাব স্বরূপিনী রাধা ঠাকুরাণী," সুতরাং ভক্ত মহাভাব দশায় উপনীত হইলেই রাধার স্বারূপ্য লাভ করিয়া থাকেন।

হইলে তবে আমার সুখ। ইহাই প্রেম। দেশের উপকার করিয়া, দশের উপকার করিয়া, সমাজের উপকার করিয়া, ধনী,-দরিদ্রের উপকার করিয়া, সুন্দর-কুৎসিতের উপকার করিয়া,—তাহাদের যে আনন্দ, সেই আনন্দের প্রতিঘাতই আমার আনন্দ। ইহাই ব্যষ্টি-ভাবের আনন্দ,—আর সমষ্টিভাবের আনন্দ—ঈশ্বরানন্দ। ভগবানের সেবা করিয়া, ভগবান্‌কে সৌন্দর্য্য উপভোগ করাইয়া, ভগবান্‌কে বুকে লইয়া যে আনন্দের পূর্ণতম ভাব, তাহাই প্রেম।

ভগবানে এইরূপ প্রেম জন্মিলে,—তখন ফুল ফুটিলে, মলয় বহিলে, সুবাস ছুটিলে, কোকিল ডাকিলে, ভ্রমর গুঞ্জরিলে সেই মুখ মনে পড়ে। আবার মেঘের গর্জ্জনে, করাল বিদ্যুতের চমকে, অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে, হতাশের দীর্ঘশ্বাসে, দরিদ্রের আকুল ক্রন্দনে, তাঁহাকে মনে পড়ে বলিয়াই বুঝিতে পারা-যায়—ইহারাও তাঁহার বিভূতি। ইহাদের সেবাতেই তাঁহার সেবা। প্রেম জন্মিলে, তখন মানুষের সমুদায় বৃত্তি তাঁহারই আশ্রিত হইয়া পড়ে। ভক্ত তখন তদ্গতচিত্তে বলেন,—আমি জ্ঞান চাহি না, শক্তি চাহি না, মুক্তি চাহি না, সালোক্যাদি কিছুই চাহি না,—চাহি কেবল তোমাকে। তুমি আমার প্রাণের প্রাণ,-তুমি আমার বিশ্বের প্রাণ,—তুমি এস, আমার হৃদয়-নিকুঞ্জে উদিত হও। একবার আমাকে "আমার" বলিয়া সম্বোধন কর।

মনের ঠিক এইরূপ অবস্থার নামই প্রেম। কিন্তু আপনাকে ক্ষুদ্র, হীন ও সান্ত; আর ঈশ্বরকে বিরাট্, বিপুল ও অনন্ত, এরূপ ভাবিলে তিনি দূরে থাকেন,—কাজেই তাঁহার সহিত প্রেম হয় না। তাঁহার উপর ভক্তের একাত্মভাব—মান, অভিমান, সোহাগ-আদরের ছায়া প্রভৃতি ওতঃপ্রোত ভাব না থাকিলে প্রেমের স্ফুর্ত্তি হয় না। যশোদার শাসন, নন্দের বাধাবহন, গোপবালকের উচ্ছিষ্ট-ভক্ষণ ও স্কন্ধেবহন এবং গোপবালাদের পদধারণপূর্ব্বক মানভঞ্জন প্রভৃতি সমস্তই ব্রজভাবলুব্ধ ভক্তের পরম আদর্শ। মহিম-জ্ঞানে প্রেম সঙ্কুচিত হয়। ভাবানুযায়ী ভগবান্‌কে আত্মসম কিম্বা আপনা হইতে ছোট ভাবিতে না পারিলে প্রেম হইবে না। তাই প্রেমের সাধনায় গোপীভাবের আদর্শ লইয়া সাধনা করিতে হইবে। প্রেমের সাধনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা। প্রেমের সাধনায় ভগবান আকৃষ্ট হয়েন;—সে আকর্ষণে তিনি স্থির থাকিতে পারেন না। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য প্রভৃতি ভাবের সাধনায় ভগবান্ তাহার প্রতিশোধ দিতে পারেন, কিন্তু গোপী-প্রেমের পরিশোধ দিতে পারেন না। তোমায় ভালবাসি,—তোমা বই আর জানি না, ইহাতে কি কোন প্রার্থনা আছে? প্রার্থনা নাই তবে পূরণ করিবেন কি?—প্রতিশোধ দিবেন কি? চাই তোমাকে,—দিতে হইলে সেই নিজকে দিতে হয়। তাই ভগবান্ গোপী প্রেমের নিকট ঋণী। *

কিন্তু ভগবানের সহিত প্রেম করা বড় কঠিন সমস্যা; সব ভুলিতে হইবে। ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ, জাতি কুল, সুখ দুঃখ সমস্ত ভুলিয়া তাহাতেই আত্মসমর্পিত হইতে হইবে। কিন্তু

* এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই ভগবানের "গৌরাঙ্গ-অবতার" বলিয়া বৈষ্ণবসমাজে কীর্ত্তিত হয়।

ভাল মন্দ ত্যাগ করিতে হইবে বলিয়া ত্যাগ করিলে চলিবে না; ভাল মন্দ জ্ঞান থাকিলে প্রেম হইল না,—কিম্বা যথার্থ প্রেম হইলে সে জ্ঞান থাকিতেই পারে না। শাস্ত্রে যাহা বলে, লোকে যাহা বলে, সমাজ যাহা বলে,—তাহা শুনিলে প্রেমলাভ হয় না। ভগবান্ যাহাতে সুখী হন, তাহাই করিতে হইবে। বিধি-নিষেধ মানিলে কি প্রেমকরা চলে? প্রেমভক্তি অনুরক্তির বিকাশ; আপনা ভুলিয়া,—ধর্ম্ম, কর্ম্ম, জাতি, কুল, মান ভুলিয়া বাঞ্ছিতের অনুসরণ করাই প্রেমভক্তি। এই ভাব গোপীদিগের ছিল, সেইজন্য ভগবদারাধনায় গোপীভাবই শ্রেষ্ঠ।

প্রেমস্বভাবলুব্ধ সাধক গোপীভাব অবলম্বন পূর্ব্বক ভগবান্কে প্রেমাস্পদ করিয়া হৃদয়-নিকুঞ্জে প্রেমের ফুলশয্যায় তাঁহাকে শয়ন করাইয়া প্রেমের গানে প্রবুদ্ধ হউন। আর বাহিরে শ্রীগুরুকে ভগবানের স্বরূপ মনে করিয়া দেহমন সমর্পণে পরিচর্য্যা করুন। নতুবা পাথরের বা পিতলের মূর্ত্তিতে তাঁহার অধিষ্ঠান মনে করিয়া তুলসী-চন্দনে প্রেমাস্পদের পূজা করুন। ক্রমশঃ প্রেমসঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অনন্ত ভাব, অনন্ত মূর্ত্তি, অনন্ত-বীর্য্য ভাবনা বা ধারণায় আনিতে পারিবেন। জগৎ যাঁহাকে দিবানিশি পাদ্য-অর্ঘ্য লইয়া পূজা করিতেছে,—প্রকৃতিরূপা রাধা যাঁহার প্রেম কামনায় সর্ব্বত্যাগিনী—উদাসিনী—যোগিনী; সেই নিত্যসহচর—নিত্যসখা—নিত্য-প্রেমাস্পদের সন্ধান মিলিবে। তখন "যাহা যাহা নেত্র পড়ে তাহা হরি স্ফুরে" অর্থাৎ—সর্ব্ব স্থানেই—সর্ব্ব বস্তুতে প্রেমাস্পদের প্রেমময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইবেন। তখন আত্মদর্শী যোগীর ন্যায় প্রেমিকও প্রতি ফলে, প্রতি ফুলে, প্রতি পত্রের মর্ম্মর শব্দে, প্রতি পাহাড়ে, প্রতি-ঝরণায়, প্রতি নদ নদীতে, প্রতি নর নারীতে, প্রতি অণু পরমাণুতে সেই সচ্চিদানন্দের বিকাশ দেখেন,—সেই শ্যামসুন্দর চিদ্ঘন রূপ আর ভুলিতে পারেন না—জগৎ লইয়া,—রাধাকে লইয়া রাধাবল্লভের উপাসনা করেন। তিনি প্রেমময়,—প্রেমের আকর্ষণে তিনি ভুলিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব ভাবাবলম্বনে যতপ্রকার সাধনোপায় আছে, তন্মধ্যে প্রেমসাধ্য গোপীভাবের সাধনাই শ্রেষ্ঠ। কারণ ইহাই মানবের সাধারণ সম্পত্তি,—ইহাই মানবজীবনের সার বস্তু। এই আকর্ষণ ভগবানে বিন্যস্ত হইলেই মানুষ জগতের জ্বালা হইতে অব্যাহতি পায়। তখন আমি কে, তিনি কে,—সে জ্ঞান জন্মে। জগৎ কি, পুত্রকলত্র কি, সোণার বাঁধন লোহার বাঁধন কি,—সে ভ্রম দূর হয়। হৃদয় দৃঢ় ভক্তি ও অহেতুক প্রেমসম্পন্ন হয়। তখন দিব্যজ্ঞান জন্মে,—বিশিষ্টরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, দারাপুত্রধনৈশ্বর্য্য কিছু নহে, দেহ কিছু নহে, ঘটপট আমি আমার কিছু নহে,—সবই তিনি; সেই আদি অন্তহীন চরাচর বিশ্বব্যাপী বিশ্বেশ্বর সত্য। সত্যস্বরূপের সত্যজ্ঞানে অসত্য দূরে যায়। অচঞ্চল আলোকাধার মধ্যবর্ত্তী সেই নিত্য ও লীলাময় প্রেমাস্পদ পরম পুরুষের অসমোর্দ্ধ প্রেমমাধুর্য্যে প্রেমিক অনন্তকালের জন্য ডুবিয়া যান—প্রেমিক—প্রেমিকা বা ভগবান্-ভক্ত রাধাশ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে আনন্দে মাতিয়া এক হইয়া যান।

ঐ শোন মধুর বীণা কলতানে বাজিয়া বাজিয়া জীবকে আনন্দ উপভোগের জন্য আহ্বান করিতেছে। যাও মিলিত হও,—

আনন্দ মিলনে, সুখ মিলনে। সুখের লেলিহান তৃষ্ণায় জীবের এত আকুল আকাঙ্খা; কিন্তু মরণ-ধর্ম্মশীল পার্থিব পদার্থে সুখের আশা বিড়ম্বনা মাত্র,—মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায় সুখের জন্য মিথ্যা ছুটাছুটি করিলে দগ্ধকণ্ঠে প্রাণ বিয়োগ হইবে। অতএব যদি সুখ চাহ, হৃদয় সুখস্বরূপ ভগবানে অর্পণ কর। যদি প্রেম চাহ, বৃত্তি সমুদায় প্রেমময় বিগ্রহে সমর্পণ কর। যদি কাম দমন করিয়া কামরূপ হইতে চাও, তবে মদনমোহনে মনের কামনা-বাসনা অর্পণ কর। যদি জগতের সর্ব্বশক্তিকে বশীভূত করিতে চাও, তবে হ্লাদিনী—শক্তি--মিলন--রসানন্দ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্ব শক্তি অর্পণ কর। সুখ আর কোথাও নাই, নিত্যসুখ সুখময় শ্রীকৃষ্ণে—আনন্দ আর কোথাও নাই, পূর্ণানন্দ হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধায়—সুতরাং প্রেম আর ত কোথাও নাই,

শ্রীশ্রীরাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনে।

অতএব সর্ব্বেন্দ্রিয় সংযত করিয়া প্রেমকারুণ্য কণ্ঠে বল;—"আমি একমাত্র তাহারই চরণানুরক্ত, আমাকে সে বুকে চাপিয়া ধরিয়া পেষণই করুক, আর দর্শন না দিয়া মর্ম্মাহতই করুক, সেই লম্পট যাহাই করুক না কেন, আমার প্রাণনাথ সে ভিন্ন আর কেহই নহে।" যথা:—

আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনষ্টু মাম—
দর্শনান্মর্ম্মহতাং করোতু বা।
যথা তথা বা বিদধাতু লম্পটো—
মৎপ্রাণনাথস্তু স এব নাপরঃ॥

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

———:0:———

সাধক সঙ্গীত।

[৮]

ভাব মন তাঁরে যে জন এ ভব-কেলিকুঞ্জের কারুকর।
যাঁর নিরমিত গরল অমৃত মৃতজীবিত চরাচর॥
যার সৃজন নিন্দুরারুণ সান্ধ্যবিমল দিনকর,
নীরদমুক্ত শরদ্চন্দ্রের ক্ষীরোদ ধবল বিনদ কর;—
যাঁর সৃজন দামিনী-দামজড়িত শ্যাম জলধর॥
যাঁর শাসনে সরসী মন্থন করে রে মন্থর লহরীথর,
মৃদুর হিল্লোলে হেলে দুলে (আবার) খেলেরে নলিনী মধুকর;
যাঁর শাসনে পিক পঞ্চম তানে চমকে পঞ্চশর,
মল্লী মালতী মুকুল মালে মিলিত মত্ত ভৃঙ্গবর;—
যাঁর শাসনে গর্ভে অনল শিরেতে শিশির ধরেরে ভূধর॥

যাঁর শাসনে কিংশুক বনে শুক সুকণ্ঠের দিতেছে সাক্ষী,
কদম শাখে মেলি শিখণ্ড সুখ তাণ্ডব শিখিছে শিখী;
যাঁর শাসনে চলতরঙ্গে চলয়ে তটিনী ভেটিতে সাগর,
সাগরে শঙ্খ-মণিকরমাখা মুকুতামিশালে ভাসেরে মকর;
যাঁর শাসনে শীতল মান্দ্য সুরভি সমীরে শিহরে পর।

—:0:—

পাগলের-খেয়াল।

৩য় উচ্ছ্বাস।

(১)

ভক্তি কাহাকে বলে? যাহা কিছু আছে, তাহাতে কোন কর্ত্তৃত্ব না রাখিয়া, সর্ব্বস্ব অর্পণ করতঃ একান্ত অনুরক্ত হওয়ার নামই ভক্তি।

প্রথমে দেখা যাউক, গুরুজনকে কেন ভক্তি করিয়া থাকি? তাঁহারা বয়োবৃদ্ধ, জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহারা আমাদের নিকট উচ্চ, তাঁহাদের নিকট আত্মসমর্পণ না করিলে উচ্চ বিষয় আয়ত্ত করিতে সক্ষম হই না। আমাদের জ্ঞান, বুদ্ধির জ্যোতিঃ, তাহাদের অত্যোজ্জ্বল জ্যোতিতে লয় হইয়া যায়; অতএব তাহাদের সেই উজ্জ্বল জ্যোতিঃ লাভকরিতে হইলে, আমাদের ক্ষীণালোক-টুকু তাহাতে মিশাইয়া দিতে হয়; সুতরাং উন্নতি লাভকরিতে হইলে, আত্মসমর্পণ ভিন্ন গতি নাই। তাই আমরা গুরুজনকে ভক্তিকরিয়া থাকি।

এই ভক্তির উদয় কোথা হইতে হইয়া থাকে? দৃঢ় বিশ্বাস হইতে। যখন কাহারও জ্ঞান, বুদ্ধি উচ্চ বলিয়া বিশ্বাসহয়, অভাব পূর্ণ করিবার ক্ষমতা তাহার আছে বলিয়া বুঝি, এইরূপে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিলে, আত্মসমর্পণ করিয়া প্রাণের তৃষ্ণা মিটাইবার ইচ্ছা বলবতী হয়, তখনই ভক্তির উদয় হইয়াথাকে।

সমাজে ভক্তির নানাপ্রকার অবস্থা দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক সকলগুলি ভক্তি পদবাচ্য নহে। ইহাদের অধিকাংশই শ্রদ্ধা, প্রীতি এবং কৃতজ্ঞতা মাত্র। ভক্তি—এই তিনটীর অনেক উচ্চে।

অনেক সময় পাপাচারী ব্রাহ্মণকে সামাজিক নিয়মানুসারে ভক্তির নিদর্শন দেখাইতে হয়। যতক্ষণ ব্রাহ্মণ ক্ষমাবান্, দয়াশীল, জিত-ক্রোধ, জিতাত্মা এবং জিতেন্দ্রিয় ততক্ষণ তিনি ব্রাহ্মণ।* নচেৎ সামান্য মনুষ্য মাত্র। কেবল কার্পাস-সূত্র হৃদয়ে ধারণকরিলে ব্রাহ্মণ বলাযায় না, বস্তুতঃ দয়া যাহার কার্পাস, সন্তোষ যাহার সূত্র, সংযম যাহার গ্রন্থি, সত্য যাহার দণ্ডী—

* ক্ষান্তং দান্তং জিতক্রোধং জিতাত্মানং জিতেন্দ্রিয়ম্। তমেব ব্রাহ্মণং মন্যে * * * * * ইত্যাদি। গৌতমসংহিতা।

এইরূপ উপবীতধারী ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও ব্রাহ্মণ নামের উপযুক্ত এবং ভক্তির পাত্র। সামাজিক শাসনের শৈথিল্যতার দরুণ, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ভক্তির নিদর্শন দেখাইতে হয়, ইহা ভক্তি নয় এক প্রকার সামাজিক অত্যাচার মাত্র।

সামাজিক শাসনের শৈথিল্যতার ফলে কদাচিৎ আর একটী অভিনয় দৃষ্টহয়। কেহ একটু বিষয় লাভকরিলে, অথবা অং ভং কিম্বা হিজিবিজি মিজিবিজি একটু চলিতে পারিলে, নিজকে অসাধারণ এবং ভক্তির পাত্র বিবেচনা করিয়া, সদাই একটু মিঠে-কড়া মেজাজে, সতৃষ্ণনয়নে ভক্তির নিদর্শন প্রাপ্তির আশায় বসিয়া থাকেন। কেহ সাক্ষাৎ করিতে আসিলে পদযুগল দর্শন-যোগ্যস্থানে রাখিয়া, মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিতে থাকেন যে আগত ব্যক্তি তাঁহাকে কিরূপ ভাবে ভক্তির নিদর্শন প্রদর্শন করে। যদিও সমাজে এরূপ লোক বেশী নাই, তথাপি বড় অনিষ্টকারী। সাধারণে মন্দটুকুর অনুকরণ করিতে যতদূর সমর্থ, ভালটুকু করিতে ততদূর নয়। এইরূপ প্রকৃতির লোক সমাজে বৃদ্ধি পাইলে ভক্তি, শ্রদ্ধার পরিবর্ত্তে, পিশাচের অভিনয়ে পূর্ণ হইবে।

পাগল এই প্রকার ব্যক্তিদিগকে এইমাত্র বলিতে পারে যে, যদি বিষয়ের দরুণ অথবা জ্ঞানের দরুণ, তাহাদের প্রকৃতির এইরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে; তবে এমন বিষয়, এমন জ্ঞান, ভারত-মহাসাগরে বিসর্জ্জন দিয়া, নির্জ্জন গিরিগহ্বরে, আশ্রয় লউন। তাহা হইলে সমাজও রক্ষা পাইবে, নিজেদেরও উন্নতি হইবে। *

তবে ইহা সমাজশিক্ষক অথবা গুরু সম্বন্ধে খাটে না, যেহেতু তাহারা আমাদিগকে উন্নত করিবার জন্য নিয়োজিত, কিন্তু অহং-জ্ঞানের আশ্রয় করিয়া করিলে নিশ্চয়ই দোষণীয়।

(২)

পরমেশ্বরকে কেন ভক্তি করিতে হয়? উন্নতির জন্য যাহা আবশ্যক, যাহা পাইলে আমরা নিজকে পূর্ণ জ্ঞানকরিতে পারি; তাহা সমস্তই তাঁহাতে বর্ত্তমান আছে। তিনি ভিন্ন সকলই সসীম, অনন্ত আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিতে তিনি ভিন্ন আর সকলই অক্ষম! পরমেশ্বর অনন্ত, তাঁহার সকলই অনন্ত, তাই তিনি আদর্শ। আমরা সীমাবদ্ধ মানুষ, উন্নতি লাভকরিতে হইলে, অসীমের আশ্রয় ভিন্ন গণ্ডীমুক্ত হইতে পারি না। সুতরাং আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু আছে সমস্তই তাঁহাতে সমর্পণ করিয়া পূর্ণ হইতে হয়। তাই আত্মসমর্পণ অর্থাৎ— ভক্তির আবশ্যক।

তাঁহাতে ভক্তি কিরূপে জন্মিয়া থাকে? প্রথমে তাঁহাতে শ্রদ্ধা জন্মে, পরে তাহা রতিতে পরিণত হয়। এই উভয়ের চরমাবস্থাই ভক্তি নামে অভিহিত। এই উভয়ের চরমাবস্থায় পৌছিতে পারিলেই ভক্তি জন্মিয়া থাকে। এই চরমাবস্থায় ভক্তি দুই ভাগে বিভক্তা। প্রথমা রাগাত্মিকা, দ্বিতীয়া অহৈতুকী।

পরমেশ্বরের গুণানুবাদ শ্রবণে অথবা শাস্ত্রোপদেশ দ্বারা, দৃঢ় বিশ্বাসের সহিত যে

* এই সকল ভেদ জ্ঞান সাধকের জন্য নয়।

কৃতজ্ঞতাপূর্ণ প্রবৃত্তি জন্মে তাহাই শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধার পরক্ষণেই তাঁহার প্রতি যে আসক্তি জন্মে তাহাই রতি। এই রতির পূর্ণাবস্থায়ই রাগাত্মিকা ভক্তির উদয় হয়।

উপাস্তে স্বাভাবিক অনুরাগবশতঃ যে আসক্তি জন্মে, সেই অনুরাগময়ী তৎপরতা-কেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। এই ভক্তি সকাম, রুচি অনুসারে মাতৃভাবে, পিতৃভাবে স্বামীভাবে, ইত্যাদি নানারূপে কামনা পূর্ণ করিবার জন্য প্রার্থনাদি করিয়া থাকে। ধ্রুব এই ভক্তির অধিকারী ছিলেন।

এই প্রকার ভক্তগণের চরম-উন্নতি বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু ইহাও অবশ্য স্বীকার্য্য যে ক্রমে জ্ঞানের উন্নতি দ্বারা কালে পরমানন্দ লাভ করিতে সমর্থ হইবে।

যে ভক্তি স্বাভাবিক এবং নিষ্কাম, যাহাতে কোনরূপ ভেদজ্ঞান থাকে না; উহাই অহৈতুকী ভক্তি। প্রহ্লাদ এই ভক্তির অধি-কারী ছিলেন।

যে ব্রহ্মোপাসক, স্বার্থসিদ্ধির জন্য ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করেন না, মুক্তিতেও যাঁহার কামনা নাই; তিনি সর্ব্বভূতে ঐক্য চিন্তা দ্বারা স্বয়ংই নির্গুণ ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। বস্তুতঃ তিনিই অহৈতুকী ভক্তিমান ভক্ত।

(৩)

ভক্তিই মুক্তির একমাত্র পথ বলিয়া নির্দ্ধারিত কেন?—ভক্তি সসীমকে অসীম করে, খণ্ডকে অখণ্ড করে, অভাবকে পূর্ণ করে, নির্গুণকে সগুণ করে, অজ্ঞানকে জ্ঞান দান করে, দুঃখীকে সুখ প্রদান করে, এইরূপ সর্ব্বমঙ্গলময়ী ভক্তি, যথার্থ হিতকারী বলিয়া সর্ব্বোচ্চস্থানীয়া; এবং মুক্তির উৎকৃষ্ট পথরূপে নির্দ্ধারিত।

আমরা সীমাবদ্ধ, আমাদের জ্ঞান, ধর্ম্ম, কর্ম্ম যাহা কিছু সকলই অসীম, নিরঞ্জন পরমে-শ্বরের নিকট অতি ক্ষুদ্র। আমাদের এই গণ্ডীমুক্ত হইতে হইলে তাঁহার অসীমত্বে সসীমটুকু মিশাইয়া, অভাব পূর্ণ করিয়া লইতে হয়; তাই আমরা তাঁহাকে ভক্তি করিতে বাধ্য।

প্রথমে আমাদের কি অভাব তাহা বিচার করা উচিত। তাহা পূর্ণ করিবার শক্তি মনুষ্যে সম্ভব হইলে, উপযুক্ত ব্যক্তিকে গুরুজ্ঞানে ভক্তি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া পূর্ণতা লাভকরিতে হয়। এইরূপে ক্রমে উন্নতি-লাভ করিলে, এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌছিতে হয়; যখন কোন অভাব আর বুঝা যায় না।

এই অবস্থায়ই অহৈতুকী ভক্তির উদয় হয় এবং মুক্তি পর্য্যন্ত বাঞ্ছনীয় থাকে না, সুতরাং সাধক এই স্তরে আসিয়া নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবে অবস্থান করেন।

সামাজিক নিয়মানুসারে বাহ্যিকরূপে সাষ্টাঙ্গ প্রণামাদি যাহা দেখিয়া থাকি তাহা ভক্তির সাকার মূর্ত্তি অর্থাৎ নিদর্শন মাত্র। বাস্তবিক ভক্তি নিরাকার আভ্যন্তরিক বিষয়। প্রণা-মাদি তাহা প্রকাশের উপায় মাত্র। স্বল্প-জ্ঞানিগণ প্রকৃত ভক্তি বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম নয় বলিয়া, এই প্রকার ক্রিয়া কলাপ নির্দ্ধা-রিত হইয়াছে। এই প্রকার ক্রিয়াদি হইতে জ্ঞানোন্নতি লাভে আভ্যন্তরিক ভক্তি বিষয়টি বুঝিতে সক্ষম হয়।

জ্ঞানের চরম অবস্থায় মস্তক এবং পদে ভেদ জ্ঞান হয় না, সমাজের আবশ্যকতাও থাকে না তখন ভক্তির কার্য্য কেবল চিন্তা দ্বারাই সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক অহৈতুকী ভক্তির অধিকারী হইয়া অসীমত্ব লাভে সমর্থ হয় এবং নিকার, নিষ্ক্রিয়, ভূমা ব্রহ্মভাবে অবস্থান করেন। তাই ভক্তি ভিন্ন মুক্তি নাই।

কস্যচিদ্-পাগলস্য

———:0:———

সমালোচনা।

প্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্র। টীকা ও অনুবাদসহ শ্রীযুক্ত কিশোরীমোহন চট্টোপাধ্যায়-সম্পাদিত এবং ২নং কৈলাসদাসের-লেন—কলিকাতা হইতে হোয়াইট্ লোটাস্ পাব্লিসিং কোং কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

'প্রজ্ঞাপারমিতা' বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের একখানি অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। চারি পাঁচ খানি প্রজ্ঞাপারমিতার মধ্যে গ্রন্থকার অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা হইতে এই গ্রন্থ সংকলন করিয়াছেন। অন্যান্য প্রাজ্ঞপারমিতা হইতে এইখানি ক্ষুদ্রতম হইলেও, মহাযান সম্প্রদায়ভুক্ত বৌদ্ধেরা এই খানির অত্যন্ত আদর ও ভক্তি করিয়া থাকেন। তাহাতে গ্রন্থের প্রারম্ভে একুশটি শ্লোকে প্রজ্ঞাপারমিতার একটী স্তুতি আছে; তাহার এক একটী শ্লোক গভীর তত্ত্বে ও ভাব মহত্ত্বে এক একটী রত্ন বিশেষ। গ্রন্থকার ঐ একুশটী শ্লোক অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ সম্পাদন করিয়াছেন।

গ্রন্থের মূল শ্লোকগুলি গভীর দার্শনিক যুক্তি ও নিগূঢ় তাৎপর্য্য পূর্ণ; তত্ত্বদর্শী ভিন্ন তাহার গুঢ় রহস্য অন্যের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। গ্রন্থকার তাহার বাঙ্গলা ব্যাখ্যা করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন ও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুর পথ সুগম করিয়াছেন। গ্রন্থকারের ব্যাখ্যা-প্রণালী দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করিতে হয়। তিনি গভীর গবেষণাপূর্ণ যুক্তি দ্বারা এবং শাস্ত্রপ্রমাণ দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের এবং বৌদ্ধ (মহাযান সম্প্রদায়ের) ধর্ম্মের দার্শনিক-মত ও উপাসনায় যে মতদ্বৈধ অল্প, তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন। প্রজ্ঞাপারমিতাকে তিনি বেদান্তের ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রাহ্মণের গায়ত্রী, তান্ত্রিকের আদ্যাশক্তি, বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণ রূপে বর্ণনা করিয়া বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। বৌদ্ধ ও হিন্দুমতের সমন্বয় এবং বৌদ্ধধর্ম্মের হিন্দুশাস্ত্রানুযায়ী ব্যাখ্যাই তাঁহার উদার মতের বিশেষত্ব। বাস্তবিক বৌদ্ধধর্ম্ম সনাতন ব্রাহ্মণধর্ম্মেরই একটা খণ্ডদেশ; গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের মতগুলির হিন্দুশাস্ত্রের অনুকূলে ব্যাখ্যা করিয়া ধর্ম্মজগতের মহদুপকার সাধন করিয়াছেন। হিন্দু-বৌদ্ধ মহামিলনের সূত্র তিনি প্রজ্ঞা-পারমিতা-সূত্রের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে সূত্রিত করিয়াছেন। এই ধর্ম্ম-বিপ্লব-কালে এইরূপ গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের আবির্ভাব গৌরবের বিষয় বটে। গ্রন্থকার আমাদের

সম্পূর্ণ অপরিচিত; যাহাহউক প্রত্যেক তত্ত্ব-জিজ্ঞাসুকে আমরা এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমরা গ্রন্থকারের অসাধারণ প্রতিভা ও অনুসন্ধান-কুশলতার জন্য বারবার ধন্যবাদ দিতেছি। আশাকরি গুণগ্রাহি-ব্যক্তিমাত্রেই গ্রন্থকারকে যথোচিত উৎসাহ-প্রদানে কুণ্ঠিত হইবেন না। আমাদের ক্ষুদ্র পত্রিকার ক্ষুদ্র অঙ্গে গ্রন্থখানির ব্যাখ্যাপ্রণালী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকারকে প্রাণ ভরিয়া প্রশংসা করিবার সুবিধা নাই। উপসংহারকালে বলিতেছি যে, এরূপ উদার ধর্ম্মমতের ব্যাখ্যা আমরা বাঙ্গলা পুস্তকে অতি অল্পই দেখিয়াছি।

———:0:———

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

৪। চীনীশপুর নিবাসী মৃত রতণশীল প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সে শম্ভুনাথ ঠাকুরকে দেখিয়াছে; তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আর কাহাকেও দেখে নাই। সে বলিয়াছে, রামপ্রসাদ এতদ্দেশবাসী ছিলেন না; জয়নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়া তদীয় গৃহজামাতা রূপে বাস করিতেন! লোকে তাঁহাকে পেড়ুঠাকুর বলিয়া ডাকিত; চীনীশপুরের কালীবাড়ী তাঁহারই সিদ্ধপীঠ। রামপ্রসাদ ৵কালীপূজার সময় নৈবেদ্য উপকরণাদি বাম হাতে লইয়া নিবেদনান্তে "খা, খা" বলিয়া স্বয়ংই উদরস্থ করিতেন। ব্রাহ্মণদি নিবাসী জগন্নাথ-রাধানাথ চক্রবর্ত্তীকে সে দেখিয়াছে; তাঁহারাই রামপ্রসাদের উত্তরাধিকারী। শম্ভুনাথ ঠাকুরের শক্তি ও ভক্তি সম্বন্ধে সে অনেক কথা বলিয়াছে। ওয়াইজসাহেবের দেওয়ান রামকৃষ্ণরায় কর্ত্তৃক মন্দিরপ্রতিষ্ঠা সে স্বচক্ষে দেখিয়াছে। সেই উৎসব উপলক্ষে বহু ব্রাহ্মণপণ্ডিত নিমন্ত্রিত হইয়া সমাগত হইয়াছিলেন। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রতণশীল ৯৫ বৎসর বয়সে স্বজ্ঞানে দেহত্যাগ করিয়াছিল।

৫। কোটালী-পাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত হরিজীবন ভট্টাচার্য্য নামক জনৈক পরিব্রাজকের নিকট জ্ঞাত হইয়াছি যে, তিনি একদা রাজসাহী জেলায় কোনও পল্লীগ্রামে এক ব্রাহ্মণবাড়ী অতিথি হইয়াছিলেন। গভীর নিশায় পার্শ্বস্থ এক গৃহে এক বৃদ্ধ কয়েকটী রামপ্রসাদের রচিত গান করিয়াছিলেন। তাঁহার বয়স প্রায় ৮০ বৎসর। ঐ বৃদ্ধের নিকট তিনি জ্ঞাত হয়েন যে, রাজসাহী জেলায় রামপ্রসাদের জন্ম; তিনি কামাখ্যাপীঠে আদেশ প্রাপ্ত-হইয়া পূর্ব্বাঞ্চলে গমন করিয়াছিলেন এবং তথায় সিদ্ধ হন। বৃদ্ধের দৃঢ় বিশ্বাস চীনীশপুরেই রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করেন। ব্রাহ্মণকুলে জন্ম বলিয়া ইনিই দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে আখ্যাত হন।

৬। ১৩১৫ সালের ৫ই বৈশাখ ভোরে একফসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। আমি

প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে বাতাসের আতিশয্যে শীতে জড়সড় হইয়া মায়ের মন্দিরের অনতিদূরে একখানা চালাঘরের মধ্যে বসিয়া আছি; এমন সময় একটী লোক দ্বারদেশে আসিয়া দণ্ডায়মান হইল। দেখিলাম, তাহার বয়স ৩৫ বৎসর হইবে, ললিত লাবণ্যযুক্ত শ্যামবর্ণ, প্রশস্ত ললাট, আরক্ত নয়ন, কোঁকড়া কোঁকড়া মাথার চুল, পরিধানে ময়লা কাপড়, সে দ্বারে দাঁড়াইয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। আমি তাহার পরিচয় লইয়া জানিতে পারিলাম তাহার নাম গগন, জাতিতে ভূইমালী, তাহার নিবাস ত্রিপুরা জেলায় আঠারবাড়ী গ্রামে, তাহার কেহ নাই,—আমাদের কালীবাড়ীতে থাকিবে মনে করিয়া আসিয়াছে। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম লোকটা একটু মাথাপাগ্লা; তখন গঞ্জিকাসেবনই তাহার কারণ স্থির করিলাম।

৺কালীবাড়ীর জন্য একজন ভূইমালীর প্রয়োজন ছিল; অকস্মাৎ একজন ধনজনহীন নিরাশ্রয় লোক পাইয়া সন্তুষ্ট হইলাম। তাহাকে সে বিষয় বুঝাইয়া বলিলে, হাস্যমুখে সে সম্মত হইল। তখন তাহাকে অঙ্গুলীনির্দ্দেশ করিয়া বলিলাম, "ঐ ঘর হইতে গঙ্গামোহনকে ডাকিয়া আন।"

সে বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল এবং মুহূর্ত্তে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া বলিল "গঙ্গামোহন কালীবাড়ী নাই।" এবার তাহার গায়ে একখানা চারখানার চাদর দেখিলাম। আমি এবার সিদ্ধান্ত করিলাম সে একজন মিথ্যাবাদী, অকর্ম্মণ্য গাঁজাখোর। বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিলাম আমি যেমন,—আমার নিকট লোকগুলিও সেইরূপ আসিয়া জুটে। কিয়ৎক্ষণপরে গঙ্গামোহন আসিল; তাহাকে জিজ্ঞাসাকরায় জানিলাম, সে এতক্ষণ কালীবাড়ী ছিল না। যাহাহউক গগনকে তাহার সঙ্গে দিলাম। গগন আদেশানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্তহইল।

সারাদিন গগন আর আমার নিকট আসিল না। রাত্রে সেকালী-প্রসাদ লইয়া আমার শয়ন-কক্ষে প্রবেশ করিল। আমি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলে সে বলিল, "আমি আপনার কাছে থাক্‌বাম্—কাজ কর্‌বাম্, বেতন পাইবাম্ তো? আমাকে একখান্ ঘর করিয়া দেবেন তো?"

আমি বলিলাম, হাঁ, তোকে একখানা ঘর দিব। অনেক পয়সা পাবি,—কোন কোন দিন ২৷৩৲ টাকা পাবি। আমার হুকুমমত কাজ করিতে হবে। এখন শুইয়া ঘুমা।

সে আনন্দিতচিত্তে হাসিতে হাসিতে শুইয়া পড়িল। আমার কিন্তু নিদ্রার পরিবর্ত্তে চিন্তার-আবির্ভাব হইল। গৃহস্থিত সিন্দুকে অনেক জিনিস পত্র ও টাকাকড়ি আছে; কি জানি অপরিচিত বিদেশী লোক আমি ঘুমাইলে যদি চুরিকরিয়া চম্পট দেয়। নানারূপ চিন্তায় চিত্ত তোলপাড়করিতে লাগিল। পরিশেষে একখানা রাম দা নিকটে রাখিয়া গগনকে বলিলাম, "দেখ্, রাত্রে যদি বাহিরে যাবার প্রয়োজন হয়, অগ্রে আমাকে ডাকিয়া উঠাইবি; নতুবা আমি হঠাৎ জাগিলে তোরে টুটুক্‌রা করিয়া ফেলিব।"

সে হাসিতে হাসিতে বলিল, "আচ্ছা।" কিছুক্ষণপরে আমার একটু তন্দ্রা আসিয়াছে,

এমন সময় শুনিলাম—গগন বলিতেছে; "কর্ত্তা! এটা রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠ কেমন? তাঁহার ভাল ভাল মালসী গান আছে।"

আমার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল; আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "এঁ্যা, কি বল্লি?"

"এখানে রামপ্রসাদ সিদ্ধ হয়, রামপ্রসাদ বামণের ছেলে" এই বলিয়া গগন চুপ করিল। তাহার কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি শয্যায় উঠিয়া বসিলাম এবং আলো জ্বালিয়া তাহাকে বলিলাম, "রামপ্রসাদের গান জানিস্ তো একটা গা না?"

সে ধরিল,—

আমি এত দোষী কিসে?
প্রতিদিন হয় দিন যাওয়া ভার সারাদিন মা কাঁদি ব'সে॥

এই গানটী গাইয়া আমার আদেশে পুনরায় ধরিল,—

করুণাময়ী কে বলে তোরে দয়াময়ী।
কারো দুগ্ধেতে বাতাসা, আমার এমন দশা,
শাকে অন্ন মিলে কই॥

এই গানটী গাইয়া আমার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি অনেক সুগায়কের মুখে রামপ্রসাদের মালসী শুনিয়াছি; কিন্তু এমন নূতন কায়দায়—অভিনব সুরে রাগরাগিণী তাললয়যুক্ত রামপ্রসাদী-গান শুনি নাই। গানের পদগুলি যেন নাচিয়া নাচিয়া আমার হৃদয়ে লহর তুলিতে লাগিল। আমি পুনরায় আর একটী গাহিতে অনুমতি করিলাম। সে বিনাপ্রতিবাদে ধরিল,—

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
কত দুঃখ দেবে দেও দেখি চাই॥

এই গানটী সমাপন করিয়া গগন বলিল "রামপ্রসাদের গানগুলি কেবল তাঁর দুঃখের কাহিনী; তাই সকলেই উহা শুনিতে ভালবাসে। আহা! কত কষ্টের গান। এই রামপ্রসাদ বামণের ছেলে; রাজা রামকৃষ্ণের ভাই। ইনি সিদ্ধপুরুষ, ইহাঁর অনেক মালসী গান আছে।"

আমি তাহার কথা শুনিয়া হতবুদ্ধি হইলাম। ব্যগ্রচিত্তে বলিলাম, "তুই কি ক'রে জান্লি যে রামপ্রসাদ বামণের ছেলে আর রাজা রামকৃষ্ণের বড় ভাই? রাজার ভাই দীনহীনের মত এদেশে আসিবেন কেন?"

গগন। রাজা রামকৃষ্ণ বামণ; তান্ বড় ভাইকে বামণ বলবাম্ না তো কি বল্বাম্?

আমি। তুই কি গোলোকসাহার দোকান হইতে গাঁজায় দ'ম দিয়া এসেছিস্?

গগন। কে কারে মাগ্‌না গাঁজা দেয় কর্ত্তা? আপনি বিশ্বাস না ক'রলে কি করবাম্।

আমি। তুই কি ক'রে জান্লি রামপ্রসাদ রাজা রামকৃষ্ণের বড় ভাই?

গগন। আমি আমার দেশর বুড়াগ'র মুখে শুনিয়াছি। রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণ এক মায়েরপেটের ভাই; রামকৃষ্ণকে নাটোরের রাণী—পোষ্যপুত্র করেন।

আমি হাতে আকাশ পাইলাম কি আকাশ হইতে পড়িলাম তখন কিছুই স্থিরকরিতে পারিলাম না। অনেক দিনের আকাঙ্খিত বিষয়ের মিমাংসা কি গগন করিয়া দিবে!

এ কি সত্য ?—না গাঁজাখুরি গল্প ? কিন্তু তাহার মিথ্যাবলায় লাভ কি ? সে যেরূপ শুনিয়াছে তাহাই বলিতেছে । আমি কৌতুহল পরিতৃপ্তির জন্য বলিলাম, "গগন ! বলিতে পারিস্, রামকৃষ্ণ তো মহারাজ—তাঁর ভায়ের এ দশা কেন ? "

আমার প্রশ্নের উত্তরে গগন যাহা বলিল, তাহার মর্ম্ম এইরূপ;—

নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যশ্লোকা রাণী-ভবাণীর পুত্রসন্তান হয় নাই । তিনি বৈধব্যদশায় পোষ্যপুত্র গ্রহণের অভিলাষ প্রকাশ করেন । তিনি আরও বলেন যে, "আমি নিজে উপযুক্ত লক্ষণাক্রান্ত ছেলে পছন্দ করিয়া লইব ।" কাজেই অমাত্যগণ একটা উৎসবের অনুষ্ঠান করিয়া সমস্ত উত্তর-বঙ্গের স্বশ্রেণীস্থ ব্রাহ্মণকুমারগণকে নিমন্ত্রণ করিয়া রাজধানীতে লইয়া আসেন । রাম-প্রসাদ ও রামকৃষ্ণ দুই ভায়েই আসিয়াছিলেন । রাণীভবাণী কুমারগণের মধ্যে রামকৃষ্ণকে মনে মনে রাজ-পোষ্য গ্রহণের উপযুক্ত স্থির করিলেন । সাধারণে একথা জানিতে পারিল না ; অমাত্যগণ সকলবালককেই সমান ভাবে দানসামগ্রী দিয়া বিদায় করিলেন ।

উৎসবের অল্পদিনপরেই উপযুক্ত কর্ম্মচারী রামকৃষ্ণের পিতার নিকট রাণীভবাণীর অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন । অধিকতর সম্মান, ও অর্থলোভে তিনি সম্মত হইলেন । পোষ্য-গ্রহণের দিন নির্দ্ধারিত হইল ; যথাসময়ে রাজোচিত আড়ম্বরসহকারে "পুত্রেষ্টি যাগ" সমাপনান্তে রাণীভবাণী রামকৃষ্ণকে পুত্ররূপে গ্রহণ করিলেন । রামকৃষ্ণ পরে মহারাজা হইয়া নাটোর রাজ্যের অধিকারী হন ।

রামকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া রামপ্রসাদের চিত্তবৈকল্য উপস্থিত হইল । নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত উদ্বেলিত হইতে লাগিল । তিনি ভাবিতেন,—উভয়েই সহোদর ভাই, একক্ষেত্রে উপস্থিত; কিন্তু কনিষ্ঠের ভাগ্যে এ বিশাল বিভবপ্রাপ্তি আর আমি আজীবন তার কৃপাভিখারী হইয়া থাকিব । জগৎ-স্রষ্টার এই বিচিত্রবিচারে তিনি বিষম সমস্যায় পড়িলেন । নানাচিন্তায় তাঁহার মস্তক আলোড়িত হইতে লাগিল । এই সময়ে তাঁহার সংসারে বৈরাগ্যের সূত্রপাত হয় ।

রামপ্রসাদ তত্ত্বানুসন্ধানে নিযুক্ত হইয়া বুঝিলেন, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মানুসারে মানুষ রাজা বা দরিদ্র হইয়া থাকে । সুখদুঃখ লইয়াই মনুষ্যজীবন;—কোন প্রকারে কি এই সুখ দুঃখের পরপারে যাইতে পারা যায় না, এই চিন্তায় তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন । ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কর্ম্মের অনিত্যতা, জগতের অসত্যতা এবং কুজ্ঝটিকাবৎ সংসারের ক্ষণভঙ্গুরতা বুঝিতে পারিলেন । সংসার তাঁহার ভাল লাগিল না । তিনি ইষ্ট-দেবতার ধ্যান-ধারণায় মনোনিবেশ করিলেন । সদ্‌গুরুর উপদেশে তাঁহার মোহনিদ্রা ভাঙ্গিয়া গেল ।

বর্ষার জলের প্রবলবেগে যেমন কঠিন বাঁধও ভাঙ্গিয়া যায়; তদ্রূপ অহর্নিশ ইষ্ট-চিন্তায় রামপ্রসাদের উদ্বেলিত হৃদয়বেগও মায়ার বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিল । তিনি স্বগৃহ—স্বগ্রাম—স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া তীর্থপর্য্যটন আরম্ভ করিলেন । এই সময়ে তিনি উন্মাদের

তায় কখন হাসিতেন, কখন কাঁদিতেন, কখন বা আপনাআপনি অভীষ্ট দেবীর সহিত কথা বলিতেন, আবার কখন নিজ দুঃখকাহিনী গানে বিবৃত করিয়া শান্তিলাভ করিতেন। এইরূপে ভ্রমন করিতে করিতে তিনি ৺কামাখ্যাপীঠে উপনীত হন; এবং যথাবিধি চৈতন্যময়ী মায়ের আরাধনায় নিযুক্ত হইয়া দৈববাণীতে আশাবাণী শুনিতে পান। অতঃপর তাঁহার হৃদয় আনন্দে নৃত্যকরিতে লাগিল। ক্রমশঃ বিষয়-নিস্পৃহতা, সৎসঙ্গ, তীর্থসেবা ও ধ্যান-ধারণা দ্বারা অভীষ্টলাভে অগ্রসর হইলেন। তদনন্তর দেবীর পুনরাদেশ প্রাপ্তহইয়া এইস্থানে আসিয়া চীনক্রম-মূলে পঞ্চমুণ্ডী আসন প্রস্তুতকরতঃ জগন্ময়ীর সাধনায় নিযুক্তহন এবং সিদ্ধি লাভকরেন।

রামপ্রসাদ চীনক্রমানুসারে বীরাচারে মায়ের আরাধনা করিয়াছিলেন। শক্তির সহিত সাধনার বিধি জানিয়া তিনি টেঁসরীপাড়ার জয়নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করেন। চীন-ক্রমানুসারে তিনি সাধনা করেন বলিয়া তাঁহার আরাধিতাদেবীর নাম চীনীশ্বরী এবং এই স্থানের নাম চীনীশপুর হইয়াছে।

গগনের কথা শুনিতে শুনিতে আমার শরীরের গ্রন্থিগুলা যেন এলাইয়া পড়িল; আমি অজ্ঞাতসারে ঘুমাইয়া পড়িলাম। প্রাতে নিদ্রাভঙ্গ হইলে গগন দরজা খুলিয়া বাহিরে গেল, আমিও শয্যা হইতে উঠিয়া বাহিরে আসিলাম এবং গগনকে মন্দিরের পশ্চাৎভাগে একটা বিল্ববৃক্ষতলে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া আমি শৌচে গমন করিলাম। পরে প্রাতঃ-কৃত্যাদি সমাপনান্তে রাত্রের কথা জিজ্ঞাসার জন্য গগনকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। গগনের সাড়া শব্দ নাই; অনুসন্ধানে কালীবাড়ীতে গগনকে পাওয়া গেল না। চতুর্দিকে লোক প্রেরিত হইল—কিন্তু কৈ?—কেহই গগনের কোন সংবাদ বলিতে পারিল না। এমন কি কালীবাড়ীর কেহ প্রাতে গগনকে দেখিয়াছে একথাও স্বীকার করিল না; সকলেই আশ্চর্য্য হইল।

গগনের অন্তর্ধানে আমার চমক ভাঙ্গিল। মনে মনে নানাকথা তোলপাড় করিতে লাগিল। ভাবিতে লাগিলাম,—গগন এত অল্প সময়ের মধ্যে এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে কোথায় লুকাইল? দ্বিজ রামপ্রসাদ এতদ্দেশবাসী নয়, তিনি জয়নারায়ণের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন; ইনি যে রাজা রামকৃষ্ণের অগ্রজ—তাহার প্রমাণ কি? গগনের কথা কি মিথ্যা, না—নিরীহ, সরল বেচারা মিথ্যা বলিবে কেন? তবে এ গগন কে? তাহাকে গঞ্জিকা-ধুম-বিকৃত মস্তিষ্ক মনে করিব, না—ছদ্মবেশী কোন মহাপুরুষ?

এইরূপ দিনরাত্র চিন্তা করিতে করিতে আমার মাথা গরম হইয়া উঠিল, এই বিষয় কাহাকেও না বলিয়া আর স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমার শিক্ষিত বন্ধুগণের সহিত এ বিষয়ের আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণের জন্য যথাসময়ে আমি ঢাকা রওনা হইলাম।

ঢাকা উপনীত হইয়া রাত্রি সাড়ে দশটার সময় ইসলামপুর আমার কাকার বাসায় গেলাম। রাত্রে আর কাহারও সহিত দেখা করিবার সুবিধা হইল না। আহারান্তে কাকার সহিত বৈষয়িক আলাপ হইল; আমি তৎকর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া আবার চীনীশ-

পুর ফিরিয়া আসিলাম। কাকার কার্য্য সমাধান্তে পুনরায় ঢাকা যাওয়ার ইচ্ছা থাকিল। কালীবাড়ী উপনীত হইয়া আহারান্তে রাত্রে শয়ন করিলাম। অমনি গগন ও তাহার বাক্য-গুলি মনে পড়িয়া গেল; কিন্তু কোন বিষয়ের মিমাংসা করিতে পারিলাম না। অশান্তি—উদ্বেগে অনেকক্ষণ নিদ্রা আসিল না। মনে হইল,—একটা ভুল করিয়াছি, রামপ্রসাদ ও রামকৃষ্ণের জন্মস্থানের কথা গগনকে জিজ্ঞাসাকরা কর্ত্তব্য ছিল। যাহাহউক গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনায় লাভ নাই। আমি নানারূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। এক অপূর্ব্ব স্বপ্ন দর্শনকরিয়া অল্প রাত্রি থাকিতে নিদ্রা ভঙ্গিয়াগেল।*

স্বপ্ন বৃত্তান্ত।

আমাদের বাড়ীর পূর্ব্বভাগে একটা পুরাতন পুকুর, পশ্চিমপার্শ্বে রাস্তা। স্বপ্নে দেখিতেছি যে, ঐ রাস্তা দিয়া আমি বাড়ী যাইতেছি, আমার কনিষ্ঠ ভাই পাছে আসিতেছে। এমন সময় গ্রামের মধ্যে গোল উঠিল যে, "খাসী চুরিকরিয়া চোর পলাইতেছে।"—একটী ক্ষুদ্র মাঠের দিকে আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইল; দেখিলাম চোর পলাইতেছে, আর আমার সেই কাকা চোরের পাছে দৌড়াইতেছেন। কাজেই চোরের পলাইবার সুবিধা হইল না। অগত্যা সে কাকাকে আক্রমন করিল। আমি কাকার সাহায্যার্থ অগ্রসর হইলাম। আমাকে দেখিয়া কাকার সাহস বাড়িল,—চোরের আশা ভরসা ফুরাইল; কাকা তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন।

চোর আমাদের পরিচিত, আমি বলিলাম, "ওরে! তোর এই কর্ম্ম?" চোর লজ্জিত হইয়া পার্শ্বস্থ একটা স্ত্রীলোককে দেখাইয়া বলিল, "উহারই অনুরোধে আমি একার্য্যে লিপ্ত হইয়াছি, আমার দোষ নাই।" স্ত্রীলোকটীও আমার পরিচিত; উহার হাতে একখানা বড় চাকু এবং একটা গ্লাস। চাকু ও গ্লাসটী আমার অগ্রজের বলিয়া চিনিতে পারিলাম। মেয়েটার উপর আমার বিজাতীয় ঘৃণা ও ক্রোধের সঞ্চার হইল। আমি বলিলাম, "চোর মাগি! এ চাকু ও গ্লাস কোথা পেলি?"

স্ত্রীলোকটী আরক্ত নয়নে,-"মুখ সাম্‌লে কথা ক, তুই চোর, না—আমি চোর" বলিয়া চাকু দ্বারা আঘাত করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু আবার দয়া করিয়া চাকু নামাইয়া চলিয়া গেল।

সেই মাঠে আমি আবার একাকী। চারিদিকে চাহিয়া দেখিতে অদূরে এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি নয়নগোচর হইল। লোকটী সুপুরুষ বটে; বিরাট্ দেহ, প্রশস্ত ললাট, বিশাল বক্ষ, আরক্ত নয়ন; গলায় বড় বড় তুলসীর মালা, গোঁপদাড়ি কামান এবং কটিদেশ কৌপীনাচ্ছাদিত। আমার দৃষ্টি পড়িবামাত্র

*স্বপ্ন সকল মস্তিষ্কের বিকার; অমূলক চিন্তামাত্র। দিনের বেলায় যাহা চিন্তা করা যায়, তাহাই স্বপ্নে প্রতিফলিত হয়; ইহাই সাধারণের ধারণা। তথাপি এ স্বপ্নবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিতে আমি বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। কারণ আমার জীবনের অধিকাংশ স্বপ্ন সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এ স্বপ্নটীরও পূর্ব্বার্দ্ধ বর্ণে বর্ণে সত্য; পরার্দ্ধের বিষয় ৺চণ্ডীশ্বরী জানেন। আমার ভরসা আছে, আমার পরিচিত শিক্ষিত বন্ধুগণ এই স্বপ্নবৃত্তান্তটীতে কখনও সন্দিহান হইবেন না। গ্রঃ লেঃ।

তিনি চলিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এক একবার আমার প্রতি সন্দেহ বক্রদৃষ্টি করিতে লাগিলেন। মন্ত্রমুগ্ধবৎ আমি তাঁহার পশ্চাৎগামী হইলাম। কিছুক্ষণ গমনকরিয়া তিনি স্বেচ্ছায় একস্থানে দাঁড়াইলেন; এবার আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম।

এক অপূর্ব্ব চিত্র আমার চিত্তে বিকশিত হইয়া উঠিল। নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে রামপ্রসাদের সাধনার আসন। আসনে রামপ্রসাদ পূর্ব্বমুখে উপবিষ্ট; তাঁহার অস্থিচর্ম্মবিশিষ্ট সুগঠিত দেহ, যেন তেজ ফুটিয়া বাহির হইতেছে। বড় বড় চুল দাড়ী, গলায় রুদ্রাক্ষমালা, রক্ত চক্ষু, বক্ষে ও ললাটে রক্তচন্দন চর্চ্চিত, হস্ত-পদতল টুকটুকে লাল, যেন সর্ব্বাবয়বে সাধকের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিতেছে। আর তাঁহারই পার্শ্বে এই স্বপ্নদৃষ্ট সাধু দণ্ডায়মান। যুগপৎ এদৃশ্যগুলি আমার হৃদয়ে প্রতিফলিত হইল।

আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আমি আপনাকে চিনিয়াছি,—আপনি সাধু রামদাস বাউল; আমি রামপ্রসাদের নিকট আপনাকে দেখিয়াছি। আপনি সর্ব্বদা তথায় যাতায়াত করিতেন। আমি দ্বিজ রামপ্রসাদের ইতিবৃত্ত সংগ্রহের জন্য ব্যাকুল, আপনি আমাকে তাঁহার পরিচয় প্রদান করিতে পারেন কি?

রামদাস মৃদুস্বরে বলিলেন, "হাঁ সে-কে-গা।"
আমি। রামপ্রসাদের পিতার নাম কি?
রামদাস। কি-ষ-ণ-গো-বি-ন-কো-ও-য়া-স্তে।

আমি বুঝিতে না পারিয়া ভীতচিত্তে পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় তিনি পুনরায় বলিলেন "আ—আ—বা—বা—কি—ষ—ণ—গো—বি—ন—কো—ও—য়া—স্তে—হব—রি—শে—ব।

কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। কিন্তু সাধু দ্রুতপদে চলিতে আরম্ভ করিলেন। আমি তাঁহার পশ্চাতে দৌড়াইতে লাগিলাম। কিছু নিকটবর্ত্তী হইয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রামপ্রসাদের বাড়ী কোথায় ছিল?"

এবার স্পষ্ট শুনিলাম, "ঘাটগ্রাম।" কিন্তু সাধু কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া চলিতে লাগিলেন। আমি চিত্রার্পিতের ন্যায় তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলাম। তিনি দৃষ্টির অন্তরালে চলিয়া গেলে মনটা উদাস হইয়া পড়িল। আমি আর দাঁড়াইতে পারিলাম না, পা দু'টী শির্ শির্ করিতে লাগিল; আমি বিষণ্ণচিত্তে তথায় বসিয়া পড়িলাম।

সাধু রামদাস বাউলের পরিচয়।

অমনি ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল; জাগরিত হইয়া আত্যধিক আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। আমি শয্যার উপর বসিয়া আছি। স্বপ্নের কথা মনে পড়িল, কাগজে তাহা লিখিয়া রাখিলাম। স্বপ্নবৃত্তান্ত হইতে কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। সমস্ত দিনটার মধ্যে কেবল স্বপ্নের বিষয়ই চিন্তা করিলাম। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটী রওনা হইলাম। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্বপ্নদৃষ্ট চোরটা আমার পরিচিত; আমি তাহার বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া নাম ধরিয়া ডাকিলাম। তাহার মা উত্তর করিল, "সে বাড়ী নাই।"

বাড়ী আসিলাম; অদ্যরাত্রেও ভাল ঘুম

হইল না। ভোরে উঠিয়া কালীবাড়ী চলিলাম পথে আবার সেই লোকটার অনুসন্ধান লইলাম। সে তখন বাড়ীতেই ছিল। আমাকে দেখিয়া হুকাহস্তে বাহিরে আসিতেছিল। আমি তাহার পায়ে কাদা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোর পায়ে এত কাদা কেন রে।"

সে বলিল, "এইমাত্র আমি মাসীর বাড়ী হইতে এলাম; অল্প রাত্রি থাকিতে যাত্রা করিয়াছিলাম। কর্ত্তা! খাসী কিন্‌বেন?"

আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত মনে পড়িল; আমি বলিলাম, "কৈ দেখি ?" সে খাসী দেখাইল এবং খাসী সম্বন্ধে যে সকল বৃত্তান্ত বলিল, সমস্তই অপ্রামাণিক। আমি তাহার পায়ের কাদা ও ভোরে জাগার কারণ বুঝিতে পারিলাম। "খাসীতে দরকার নাই" বলিয়া কালীবাড়ী আসিলাম। রাস্তায় ভাবিতে ভাবিতে মনে পড়িল, "স্বপ্নে যে স্ত্রীলোকটীর হাতে চাকু ও গ্লাস দেখিয়াছি, বহুদিন হইল—দাদার মৃত্যুর পর তাহা আমিই অপাত্রে দান করিয়া ফেলি। আমার পিতৃদেব একদা তাহার অনুসন্ধান করিলে আমি "জানি না" বলিয়া অম্লানবদনে মিথ্যাকথা বলিয়াছি; সুতরাং আমিই চোর। স্বপ্নের প্রথমাংশ এইরূপ ফলিয়া যাওয়ায় আমি বিস্মিত হইলাম। অপরার্দ্ধ সত্য না হইবে কেন, এই চিন্তায় আমার উৎসাহ আবার প্রবলবেগে বর্দ্ধিত হইল। আমি অনুসন্ধান আরম্ভ করিলাম।

ঘাটগ্রামকে প্রথমতঃ ঝিঘাটা মনে করিয়া তথায় অনুসন্ধানে জানিলাম, সেখানে ব্রাহ্মণের বসতি নাই,—কখনও ছিল না। নিরুপায় হইয়া "কালীকুমার ইনিষ্টিটিউসনের" আসিষ্টাণ্ট মাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে সমস্ত বিষয় বিবৃতকরিয়া বলিলাম। সেই সময়ের হেডমাষ্টার শ্রীযুক্ত বাবু করুণাকিশোর গুহ (ইনি বি, এল পাস করিয়া মুন্সিগঞ্জে এক্ষণে ওকালতি করিতেছেন) মহাশয়ও এই বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। আমার অনুসন্ধান, গগনের কথা, স্বপ্নবৃত্তান্ত সমস্তই তাঁহাদিগকে বলিলাম। তাঁহারা আমাকে ইহা প্রকাশের জন্য উৎসাহিত করিলেন। নাটোরের বর্ত্তমান মহারাজাকে পত্র লিখিয়া এ বিষয়ের অনুসন্ধান করাই স্থির হইল। শীতলবাবু নিজে পত্র লিখিলেন; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহার কোন উত্তর পাইলাম না।

আমি একদিন রামদাস বাউলের আখ্‌ড়ায় গমন করিলাম। তাঁহার আখ্‌ড়া নরসিংহদি ষ্টিমারঘাটের নিকটবর্ত্তী—মেঘ্‌না নদীর উত্তরপারে অবস্থিত। রামদাসের পূর্ব্ব নাম-ধাম সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তিনি গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করেন; পরিশেষে বিক্রমপুর—আবদুল্লাপুরের সুধারাম বাউলের নিকট বাউলধর্ম্মে দীক্ষিত হন। পরে নানাস্থানে ভ্রমনকরিয়া এই স্থানে আখড়া করিয়াছিলেন। তিনি এতদ্দেশে সিদ্ধপুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাঁহার অলৌকিক শক্তি সম্বন্ধে আজিও নানাবিধ গল্প শুনাযায়! তাঁহার মৃত্যুর বিবরণ আশ্চর্য্য। এতদ্দেশে রামদাস বাউলের প্রভাব ও প্রতিপত্তি সকলেই অবগত আছে, তাঁহার মতও অতি উদার; কোনরূপ সাম্প্রদায়িক ঈর্ষা দ্বেষে কলঙ্কিত নহে। তিনি ৺চীনেশ্বরী কালীর

মহাভক্ত ছিলেন। তাঁহার আখড়ার বাউলগণ অদ্যাপি এই কালীবাড়ীর প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন। তাঁহারা মায়ের গান করে এবং বার্ষিক প্রণামী দিয়া থাকেন। মাঘী পূর্ণিমার দিন এখানে যজ্ঞ এবং তৎপরদিন মহা সমারোহে মহোৎসব হইয়া থাকে। এই উৎসবে সহস্রাধিক লোক সমবেত হয়। ইঁহারা কয়দিন সকলকেই অকাতরে অন্ন বিতরণ করিয়া থাকেন।

আমি আখড়ায় উপনীত হইয়া হিরণী বাউলনীর নিকট আমার স্বপ্নবিবরণ বিবৃত করিলাম। হিরণীর বয়স প্রায় ৮৫ বৎসর হইবে; সে রামদাসকে দেখিয়াছে। রামদাস বাউলের কত বয়স হইয়াছিল কেহই নির্ণয় করিয়া বলিতে পারে না। আমার স্বপ্নবৃত্তান্ত শুনিয়া হিরণী চমকিয়া উঠিল, ভক্তির সঞ্চারে তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে বলিল, "আপনি ঠিক দেখিয়াছেন, বাউল ঠাকুরের ঠিক ঐ প্রকার চেহারা ছিল; কেন না তিনি পূর্ব্বে বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি ভক্তবৃন্দকে নানারূপে দেখা দিয়া থাকেন। তিনি চীনীশপুর রামপ্রসাদের নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহার মুখে শুনিয়াছি—রামপ্রসাদ ব্রাহ্মণ এবং কোনও রাজার বড় ভাই।"

এখানেও আমার ইষ্টসিদ্ধি হইল না; রামপ্রসাদের জন্মভূমি ও পিতার নাম পূর্ব্বের ন্যায় অন্ধকারেই রহিল। আমি যথাসময়ে কালীবাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। (ক্রমশঃ)।

—:0:—

আশ্রম-সংবাদ।

আশ্রম-অধিষ্ঠাতা শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব ভক্তগণের আহ্বানে গত ৯ই পৌষ সশিষ্যে পূর্ব্ববঙ্গে পরিভ্রমণে বহির্গত হইয়াছেন; বর্ত্তমান সময়ে তিনি ঢাকা ২২৬নং নবাবপুর অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার দর্শন-পিপাসু পূর্ব্ববঙ্গবাসী ভক্ত ও সেবকগণ এ সুযোগ পরিত্যাগ করিবেন না, ঢাকা হইতে শীঘ্রই তাঁহার দিনাজপুর অঞ্চলে যাওয়ার কথা। এসুযোগ পরিত্যাগ করিলে শীঘ্র তাঁহার শ্রীচরণ দর্শনলাভ—পিপাসু অথচ দরিদ্র ভক্তগণের পক্ষে দুর্ঘট হইবে। সম্ভবতঃ তিনি বর্ত্তমানমাসের শেষভাগে আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। কৃষ্ণবিরহে বৃন্দাবনের যে দশা হইয়াছিল আনন্দময়ের অনুপস্থিতিতে শান্তি-আশ্রমের দশাও আজ তদ্রূপ।

ভুল সংশোধন। পৌষ মাসের "আর্য্য-দর্পণে" ১৯৫ পৃষ্ঠায় নয় ছত্রে "চৌধুরীপাড়া" স্থলে "টেঙ্গুরীপাড়া" পাঠ হইবে।

—:0:—

Regd. No. D. 65.

৫ম বর্ষ। ফাল্গুণ। ১১শ সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ।

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

———:0:———

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। | প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।৹ আনা।

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

থাটন হইতে

শ্রীযুক্ত অনাথবন্ধু মুখোপাধ্যায়	২৲
,, ভুবনমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
,, মনীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	২৲
,, রাসকুমার দে প্রভৃতি	১০/
,, অন্নদাচরণ দে	১৲
,, বিনয়েন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
	৯০/

মৌলমিন হইতে

শ্রীযুক্ত হরিচরণ ঘোষাল	৩৲
,, বিজয়মাধব সিংহ	২৲
,, শ্রীধর মুখোপাধ্যায়	২৲
,, যতীন্দ্রনাথ সরকার	২৲
,, সতীশচন্দ্র দসগুপ্ত	১৲
,, গৌরচন্দ্র চৌধুরী	১৲
,, শরচ্চন্দ্র গুহ	১৲
,, রঙ্গচন্দ্র গুহ	১৲
,, হামিদ কাসিম	১৲
মৌলমিন হিন্দু মেছ	৩৲
শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত মুখোপাধ্যায়	১৲
,, বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়	৫৲
	২৩৲

পেগু হইতে

শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ দে	২৲
,, নৃপেন্দ্রকুমার মিত্র	২৲
,, মুকুন্দলাল গোস্বামী	১৲
,, অবিনাশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	২৲
,, হরিভূষণ দে	১৲
,, এস্, চক্রবর্ত্তী	২৲
,, বীরেন্দ্রনাথ সান্ন্যাল	২৲
,, নবীনচন্দ্র দত্ত	৷০
,, রাজেন্দ্রলাল বড়ুয়া	৷০
,, গণেশ মিস্ত্রি	৷০
,, নরসুন্দর মেস্	১০/
	১৪৷৴

টঙ্গু হইতে

শ্রীযুত মন্মথনাথ ভাদুড়ী কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ হইতে সেবকগণের নিকট প্রদত্ত ১০৸০

রেঙ্গুণ হইতে

শ্রীযুত এ, বি, বানার্জ্জি	২৲
,, গিরীন্দ্রনাথ সরকার	১৲
,, রসিকচন্দ্র দে	২৲
,, দীনেশচন্দ্র মুন্সী	২৲
,, ভবপ্রসন্ন রায়	২৲
,, উমেশচন্দ্র বসু	১৲
,, প্রসন্নকুমার হাজরা	৷০
,, কৃপানাথ দত্ত	২৲
,, জগতচন্দ্র দে	১৲
,, বিজয়চন্দ্র দে	১৲
,, কে, ডি, সিংহ	১৲
শ্রীযুক্ত ০, তালুকদার	৫৲
জনৈক হিতৈষী	১৲
শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র দে	১৲
,, মানদাকুমার দে	১৲
,, অমৃতলাল সেন	৷০
,, নবীনচন্দ্র দে	৷০
,, গোপালচন্দ্র দে	৷০
,, নগেন্দ্রনাথ দে	১৲

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ১১শ সংখ্যা। } ফাল্গুন। { বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

দ্বিজ রামপ্রসাদ।

(দশম সংখ্যার পূর্ব্বপ্রকাশিত অংশের পর।)

আলোচনা।

সাধকপ্রবর দ্বিজ রামপ্রসাদের বিশেষ পরিচয় এপর্য্যন্ত কেহই দিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রসঙ্গে নানারূপ জনশ্রুতি,—কল্পনাও নানারূপ। কেহ বলিতেছেন,—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদই দ্বিজ রামপ্রসাদ। কারণ তিনি বৈদ্যবংশজ; বৈদ্যজাতির উপনয়ন সংস্কার আছে; সুতরাং তিনি তাঁহার রচিত গানের ভণিতায় "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার করিতেছেন। (একবার বিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় সেন রামপ্রসাদকে কায়স্থজাতি বলিয়া প্রমাণিত করিতে চেষ্টা হইয়াছিল।) কেহ বলিতেছেন,—তা নয়—দ্বিজ রামপ্রসাদ গৃহী নহেন; তিনি উদাসীন—ব্রহ্মচারী। বাস্তবিক দ্বিজ রামপ্রসাদের পরিচয় পন্থা বড় জটিল ও আবর্জ্জনাপূর্ণ; এ সমস্যার মিমাংসা যেমন দুরূহ, তেমনি তাঁহার জন্ম-মৃত্যুর সময় সঠিক নির্ণয় করাও দুঃসাধ্য। তবে তাঁহার পরিচয় প্রদান সুকঠিন হইলেও অসাধ্য নহে।

দ্বিজ রামপ্রসাদের ভক্তি-নিঝ'রিণীর বারি-ধারায় শত শত সঙ্গীত প্রবাহিতহইয়া ত্রিতাপ-দগ্ধ মানবহৃদয়কে সুশীতল করিতেছে। তাঁহার গানগুলি বঙ্গদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার প্রিয়। তাঁহার রচিত গানের ভাষায়—তিনি যে পূর্ব্ব-বঙ্গবাসী ছিলেন, তাহা সহজেই নিঃসন্দেহে প্রতীয়মান হয়; এবং জনশ্রুতিগুলিও ইহার যথেষ্ট সমর্থনকরে। প্রাচীন ইতিহাস-সংগ্রহে কিম্বদন্তী অপ্রামাণ্য নহে। তাঁহার জন্ম এক-স্থানে,—কর্ম্মপ্রচার অন্যত্র; বিশেষতঃ তাঁহার সিদ্ধপীঠ এবং দেবোত্তর জায়গীরাদির স্বত্বাধি-

কার কন্যাগতপরম্পরা হওয়ায়, দলিলপত্র পর্য্যন্ত আমাদের হস্তগত হয় নাই। সুতরাং তাঁহার ইতিবৃত্ত সংগ্রহকরা সহজসাধ্য নহে। দ্বিজ রামপ্রসাদের জীবনসংক্রান্ত ঘটনাবলি লোকপরম্পরাগত প্রবাদের উপরই ভিত্তি স্থাপন করিতেছে। তদীয় রচিত গানগুলির দ্বারাও ঐ সকল বিষয়ের সত্যতা উপলব্ধি করাযায়।

যে দ্বিজ রামপ্রসাদের সিদ্ধপীঠের অধিকারী হইয়া আমরা স্বচ্ছন্দে জীবনাতিবাহিত করিতেছি এবং যাত্রিগণের নিকট প্রণামী আদায় করিতেছি, তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত ও প্রকৃত তথ্য আমরা সাধারণকে জানাইতে পারিতেছি না, এতদপেক্ষা পরিতাপের বিষয় আর কি হইতে পারে? সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলান্তর্গত মহেশ্বরদি পরগণার চীনীশপুর-পীঠের ব্রাহ্মণকুলজাত সিদ্ধ রামপ্রসাদই যে "দ্বিজ রামপ্রসাদ" ইহার সমর্থন ও সাধারণকে বিশ্বস্তভাবে অবগত করানই আমার মুখ্য উদ্দেশ্য হেতু এ কম্পিত-দুর্ব্বলহস্তও লেখনী ধারণকরিতে সাহস করিয়াছে। আমার অন্য কোন উপাদান না থাকিলেও অদম্য উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফল প্রীতচিত্তে সাধারণের করে অর্পণ করিলাম।

"শূর্পবৎ দোষমুৎসৃজ্য গুণান্ গৃহন্তে সাধক।"

সম-সাময়িক সঙ্গীত-রচয়িতা শক্তিসাধক ভক্তগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তিনজন রামপ্রসাদের অস্তিত্ব জানাযায়। যথাঃ—

১। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী।
২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন।
৩। দ্বিজ রামপ্রসাদ।

প্রোক্ত রামপ্রসাদ ত্রয়ের কোন্ রামপ্রসাদ সাধক ও সিদ্ধ এবং প্রকৃতপক্ষে দ্বিজ রামপ্রসাদের সম্মান ও গৌরবলাভের অধিকারী?

১। কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী। ইনি বিখ্যাত কবিওয়ালা নীলুঠাকুরের সহোদর। ব্যবসার খাতিরে তিনি সঙ্গীত রচনা করিতেন; তবে তাঁহার রচণা-নৈপুণ্য ছিল। ১১৬০ সালে তাঁহার জন্মহয় এবং ১২৪২ সালে পরলোক গমন করেন। ইনি কলিকাতা নিবাসী;—যে সকল গানে কলিকাতার ভাষা পরিলক্ষিত হয় এবং বিজাতীয় শব্দ সংযুক্ত আছে, অথচ ইতর কবির ভাব প্রকটিত ও প্রস্ফুট; ঐ সকল গান কবিওয়ালা রামপ্রসাদের রচিত। আমরা পূর্ব্বেই তাঁহার গানে ডিক্রি-ডিস্‌মিসের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া তাহা প্রতিপন্ন করিয়াছি। ইনি সাধক ছিলেন না; সুতরাং দ্বিজ রামপ্রসাদের সঙ্গে তাহার তুলনাই হয় না।

২। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন। ইনি স্বভাব-কবি; কালীকীর্ত্তন, কৃষ্ণকীর্ত্তন বিদ্যা-সুন্দর প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁহার কীর্ত্তিস্তম্ভ। ইনি গৃহী; নবদ্বীপাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের মনস্তুষ্টি-হেতু বিদ্যাসুন্দরকাব্য রচনা করিয়াছিলেন তজ্জন্য মহারাজা তাঁহাকে, "কবিরঞ্জন" উপাধি এবং দেড়শত বিঘা নিস্কর জমি প্রদান করেন। কলিকাতার কোন জমিদার ইহাঁকে মাসিক ৩০৲ টাকা বৃত্তি দিতেন। ইনি ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত হালিসহরের কুমারহট্ট বা কুমারহাটী নামক গ্রামে ১৬৪২ শকাব্দার জন্মগ্রহণ করেন। ব্যবসায়ী হইলেও তিনি সাধক—তবে সিদ্ধ নহেন।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন সম্ভ্রান্ত বৈদ্যবংশ-

সম্ভূত এবং ধনবান্ ছিলেন; তদীয় বিদ্যাসুন্দর পাঠে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন;—

ধন হেতু মহাকুল, পুর্ব্বাপর শুদ্ধমূল
কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কই।
দয়াশীল দানরত শিষ্ট শান্ত গুণান্বিত,
প্রসন্ন কালিকা কৃপাময়ই।
সেই বংশ সমুদ্ভূত, পুরুষার্থ কব কত,
ছিল কত কত মহাশয়।
অনচির দিনান্তর, জন্মিলেন রামেশ্বর,
দেবীপুত্র সরল হৃদয়॥
তদঙ্গজ রামরাম, মহাকবি গুণধাম,
সদা যাঁরে সদয়া অভয়া।
তদঙ্গজ এ প্রসাদে, কহে কালিকার পদে,
কৃপাকরি মরি কুরু দয়া॥

বিদ্যাসুন্দর।

কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা পাণ্ডিত্য-প্রকাশক; রচনা-নৈপুণ্য দেখিয়া শতমুখে প্রশংসা করিতে হয়। তবে তিনি নিজের রচিত কাব্যে বা কবিতায় ভণিতাপ্রসঙ্গে যেরূপ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে তিনি গানে যে "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার করিবেন, তাহা আদৌ বিশ্বাসকরিতে প্রবৃত্তি হয় না। পাঠক! তদীয় বিদ্যাসুন্দর কাব্যখানি পাঠ করিলেই ইহার সত্যতা প্রতিপাদিত হইবে। যাঁহারা বৈদ্যের উপনয়নসংস্কার আছে মনে করিয়া সেন রামপ্রসাদকেই দ্বিজ রামপ্রসাদ করেন, তাঁহাদিগের ধারণাকরা উচিৎ যে, সেকালের ভক্ত ও সাধক কবি আপনার রচিত কাব্যে ও গানে একবার শ্রীষক-প্রসাদ, দাসপ্রসাদ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করিয়া আবার কি "দ্বিজ" শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন?—একথা স্বেচ্ছাচারী ভিন্ন সকলের নিকটই অযৌক্তিক।

সেন রামপ্রসাদের রচনা প্রাঞ্জল নয়; কিন্তু ভাব ও ভাষার চমৎকারিত্বে তাঁহার রচনার মধুরত্ব অস্বীকার করিবার উপায় নাই। একটা নমুনা দেখুন,—

কে হর-হৃদি বিহরে।
তনুরুচির,—সজল ঘন-নিন্দিত, চরণে উদিত,—
বিধু নখরে॥
নীল কমলদল, শ্রীমুখমণ্ডল,
শ্রমজল শোভে শরীরে।
মরকত মুকুরে, মুগ্ধ মুকুতা দল
রচিত কিবা শোভা মরি মরিরে॥
গলিত চিকুর ঘটা, নবজলধর ছটা,
ঝাঁপল দশদিশি তিমিরে।
গুরুতর পদভর, কমঠ ভুজগবর
কাতর মূর্চ্ছিত মহীরে॥
ঘোর বিষয়ে মজি, কালী পদ না ভজি,
সুধা ত্যজিয়া বিষপান করিরে।
ভণে শ্রীকবিরঞ্জন, দৈববিড়ম্বন,
বিফলে মানব দেহ ধরিরে॥

(ক্রমশঃ)

———:0:———

অর্চ্চনা।

হৃদয় মন্দিরে, মানস মুকুরে,
তুলেছি তোমারি ফটো,
আর তার মাঝে কত স্থান আছে
এ হৃদি নহে তো ছোট।

তোমার সাধের জড় জগতের
প্রীতির যতেক আছে,
সকলি আনিয়া দিব সাজাইয়া
ঐ প্রতিমার কাছে।
সন্ধ্যায় উষায় শুভ্র জোছনায়
রাখিব দুয়ার খুলি,
নিভৃত কুটীরে হেরিয়া তোমারে
আপনা যাইব ভুলি;
সহস্র ওঁকারে জপিব তোমারে
স্থাপিয়া হৃদয় পটে;
শারদ সেফালি অর্পিব অঞ্জলি
ও রাঙ্গা চরণ তটে।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী দেবী।

—:0:—

রসতত্ত্ব ও মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেব।

রসের পিপাসা জীবের প্রাণে প্রাণে। কেবল জীব কেন,—কুসুম ফুটিয়া রূপে—রসে ফাটিতে থাকে; বৃক্ষের নবীন শ্যামপত্র-কুঞ্জে রূপ আর রস। পৃথিবীময় রূপ আর রসের বৈচিত্র্যলীলা। স্বর্গমর্ত্ত্য এই রূপ আর রসের অচ্ছেদ্যবন্ধনে বাঁধা। কোকিলের সুর এই রূপ আর রসের পঞ্চম, শিশির রূপ-রসের অশ্রু, মলয়ানিল সেই রূপ-রসের স্নিগ্ধ-শ্বাস, নৈশগগনে দিগন্তব্যাপী সঙ্গীতময় মাধুর্য্য—সেই রূপ আর রসের জীবন্ত মর্ত্ত্যলীলা। রূপ শক্তিক্রীড়া—রস সুখের নামান্তর। কাজেই তত্ত্ববিদের বিশ্লেষণ—ধার্ম্মিকের প্রাণের অনুসন্ধান ঐ শক্তি আর রসের দিকে। কেন না ব্রহ্মই রসস্বরূপ। যথাঃ—

রসো বৈ সঃ।
শ্রুতি।

রস তিনি। তিনি কে? ঋষিরা বলেন,—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।" যিনি বাক্য ও মনের অগোচর, তিনি ব্রহ্ম; ব্রহ্মই আনন্দামৃত রূপ রস। এই রস আস্বাদনার্থই ভগবানের সৃষ্টিকার্য্য;—জীব সেই বাসনা-বিদগ্ধ হইয়া, রসের পিপাসু হইয়া, ঘুরিয়া মরিতেছে। গোপীভাবের সাধনায় সেই রসরতি জ্ঞান হয়,—হৃদয়ে তাহার প্রকাশ পায়। ভগবানের যে রসপ্রাপ্তি কামনা, সেই রস পূর্ণভাবে রাধায় বিরাজিত;—সুতরাং রসের বিকাশ রাধাতত্ত্বে। রাধার সহিত শ্রীকৃষ্ণের যে ব্রজলীলা তাহাই রসের আশ্রয় বা রসসাধনা।

রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে রসতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ব্রজধামে উভয় দেহ ধারণ করিয়াছিলেন। সেই রাধাকৃষ্ণ আত্মস্বরূপে অর্থাৎ আত্মারূপে প্রতি জীব-হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন। তাই জীব সেই আনন্দ বা সুখের অন্বেষণে জলভ্রান্ত মৃগের মরীচিকায় ছুটিয়া যাওয়ার ন্যায়—এই সংসার মরু-ভূখণ্ডে এত ব্যর্থ ছুটাছুটি করিয়া থাকে। কিন্তু অপূর্ণ জগতে পূর্ণ সুখের আশাকরা বিড়ম্বনা। মায়ামুগ্ধ জীব জানিতে পারে না যে পূর্ণানন্দ—পূর্ণসুখ যে তাহার আত্মায় অবস্থিত। মৃগ যেরূপ আপন নাভিস্থিত কস্তুরির গন্ধে উদ্ভ্রান্ত হইয়া বনমধ্যে ব্যাকুল-

ভাবে ছুটিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ জীবও আনন্দের অনুভূতিতে পার্থিব বিষয়ে প্রধাবিত হইয়া বেড়াইতেছে। জন্ম-জন্মান্তরের সুকৃতিবশতঃ এবং সাধু শাস্ত্রের কৃপায় জীব যখন জানিতে পারে যে, তাহার চির-আকাঙ্ক্ষিত পদার্থ তাহার আত্মাতেই অবস্থিত, তখন তাহার বিষয়-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়,—সে তখন আত্মানুসন্ধানে নিযুক্ত হয়। অনন্তর আত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া, আত্মায় রাধাকৃষ্ণতত্বের বিকাশ করিতে পারিলেই পূর্ণরস ও আনন্দের অধিকারী হওয়া যায়। তাহা সাধন সাপেক্ষ। জগতে অতি সামান্য একটী তত্বের অনুসন্ধান করিতে জীবনব্যাপী অধ্যবসায়ের প্রয়োজন। কিন্তু ভারতের সুবর্ণযুগে দেবকল্প ঋষিগণ যোগের সুমহান্ পর্ব্বতশৃঙ্গে অধিরোহণপূর্ব্বক জ্ঞানের দীপ্তবহ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়া লইয়া যে সন্ধান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথিত শাস্ত্রের আশ্রয়ে আমরা এখনও সে তত্বের অনুসন্ধান প্রাপ্ত হই। কিন্তু তাহাতেও কিঞ্চিৎ সাধনা সাপেক্ষ;—সেই সাধনা কি প্রকারে করিতে হয়, কি প্রকারে শক্তিমানের শক্তিকে আয়ত্ব করাযায়, কি প্রকারে প্রকৃতির বাসনা-বাহুর বন্ধন হইতে মুক্তি পাওয়া যায়,—আর কি প্রকারে রসের তত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া রসের ভাণ্ড-নিঃসৃত দর-ধারায় জলিত-কণ্ঠ-জীবের প্রাণ সুশীতল হয়,—তাঁহার সাধন-তত্ব কলিপাবন মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও তাঁহার ভক্তগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইয়াছে।

গোপীভাবে যে ঈশ্বরানুশরণ, তাহার নাম রাগমার্গ। সন্ধ্যাহ্নিক, রোজানেমাজ, প্রার্থনা-উপাসনা প্রভৃতি বিহিতাবিহিত কর্ম্ম, জাতি-কুল লোকধর্ম্ম, সুখদুঃখ মানাভিমান, আচারনিয়ম বিধিনিষেধ ইত্যাদি [সমস্ত বৈধীমার্গের অনুষ্ঠান কীর্ত্তিনাশার জলে বিসর্জ্জনপূর্ব্বক কেবল প্রাণের অনুরাগে—আনন্দের রসে মত্ত হইয়া, আকুল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া যে ঈশ্বরোপাসনা করা যায়, তাহাকেই রাগমার্গ বলে। এই রাগমার্গের সাধনা প্রবর্ত্তনার্থ ব্রজলীলা। ব্রজগোপিগণ এই রাগমার্গের সাধিকা। এই রাগমার্গের সাধনা প্রচার করিতেই দ্বাপরের অবতার। যখন যে ধর্ম্মের সংস্থাপন প্রয়োজন, তখনই তাহার পূর্ণ আদর্শের প্রয়োজন;—আদর্শ ভিন্ন মানব শিক্ষালাভ করিতে পারে না। তাই ভগবান্ যোগমায়াবলম্বনে শরীরী হইয়া ইচ্ছাদেহ ধারণ করিয়া কৃষ্ণরূপে ব্রজধামে লীলা করিয়াছিলেন। সেই ব্রজলীলার প্রধান সহায়কারিণী—রাধা।

ভগবানের যে শক্তি জীবকে সর্ব্বদা অনন্তউন্নতির পথে—পূর্ণ মঙ্গল ও আনন্দের পথে আকর্ষণ করেন, তাহাই কৃষ্ণ। আর যদ্দ্বারা আমরা তাঁহার দিকে—অনন্ত আনন্দের দিকে আকৃষ্ট হই, তাহাই ভক্তি। ভক্তি যখন গুণাবরণে আবৃত থাকেন, তখন তাঁহার স্বরূপ উপলব্ধ হয় না। কিন্তু আবরণ উন্মুক্ত হইলেই মেঘান্তরিত সূর্য্যের ন্যায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশিত হইয়া "প্রেম" আখ্যা প্রাপ্তহয়। এই প্রেম সচ্চিদানন্দ ভগবানের হ্লাদিনীশক্তির বিকাশ মাত্র। ভগবানের তিন প্রকার শক্তি। যথাঃ—

হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।

বিষ্ণু পুরাণ।

হ্লাদিনী সন্ধিনী ও সম্বিৎ এই তিন শক্তি ভগবান্‌কে আশ্রয়করিয়া আছেন। তন্মধ্যে

হ্লাদিনী প্রেমস্বরূপা; ইনিই রাধা নামে কীর্ত্তিতা। যথা:—

হরতি শ্রীকৃষ্ণ মনঃ কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী।
অতো হরত্যেনৈব রাধিকা পরিকীর্ত্তিতা॥
সাধনতত্ত্বসার।

যিনি শ্রীকৃষ্ণের মন হরণ করেন, তিনিই হরা; কৃষ্ণাহ্লাদস্বরূপিনী রাধাই এই নামে অভিহিতা হইয়া থাকেন। রাধ্ ধাতু হইতে রাধা শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। রাধ্ ধাতুর অর্থ সাধনা, পূজা বা তুষ্ট করা; যিনি সাধনা করেন, পূজা করেন বা তোষণ করেন,—তিনিই রাধা। আর এই শক্তিকে যিনি আকর্ষণ করেন, তাহার নাম কৃষ্ণ। কৃষ্ ধাতু হইতে কৃষ্ণ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। কৃষ্ ধাতুর অর্থ আকর্ষণ করা;—যিনি সাধনাকারিনীশক্তির সর্ব্বেন্দ্রিয় আকর্ষণ করেন, তাঁহাকেই কৃষ্ণ বলে। অতএব রাধা ও কৃষ্ণ একই আত্মা। তাঁহারা অগ্নি ও দাহিকাশক্তির ন্যায় ভেদাভেদরূপে নিত্য বর্ত্তমান থাকিয়া সমগ্র প্রাপঞ্চিক জীবসমূহের অন্তর্ব্বাহে বিরাজ করিতেছেন। তাই শ্রীকৃষ্ণ গোপীদিগকে বলিয়াছিলেন;—

অহং হি সর্ব্বভূতানামাদিরন্তোঽন্তরং বহিঃ।
ভৌতিকানাং যথা খং বা ভূর্ব্বায়ুর্জ্যোতিরঙ্গনাঃ॥
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০স্কঃ, ৮২ অঃ।

যেরূপ আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, ও ক্ষিতি এই পঞ্চ মহাভূত, সমুদায় ভৌতিক পদার্থের কারণ ও কার্য্য হইয়া, তাহাদিগের অন্তর্ব্বাহ্যে বর্ত্তমান রহিয়াছে; তদ্রূপ আমিই একমাত্র সর্ব্বপ্রাণীর কারণ ও কার্য্য বলিয়া সকলেরই অন্তর্ব্বাহে বিরাজ করিতেছি; সুতরাং আমার সহিত তোমাদের বিচ্ছেদ, কদাপি সম্ভবপর নহে। অতএব রাধা আর কৃষ্ণ একই আত্মা; জীবকে প্রেমতত্ত্ব আস্বাদন করাইতে ব্রজধামে উভয়দেহ ধারণ করিয়াছিলেন।

দ্বাপরযুগের শেষসন্ধ্যায়—যখন জীব কর্ম্ম ও জ্ঞানের কর্কশ সাধনায় জ্বলিতকণ্ঠে ভগবানের কৃপাবারির আশায় ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়াছিল,—বাসনাবিদগ্ধ হইয়া আনন্দের অনুসন্ধানে ঘুরিতেছিল, ভগবান্ সেইসময় মনুষ্যের ঊর্দ্ধগতি দানজন্য—পরানন্দ দানজন্য—পিপাসিত-কণ্ঠে মধুর প্রেমরসের পূর্ণধারা ঢালিয়া দিবার জন্য হ্লাদিনীশক্তির সহিত রাধাকৃষ্ণরূপে ব্রজধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। জগতের প্রধান ভাব প্রেম;—সেই প্রেম দানকরিতে, প্রেমশিক্ষা প্রদান করিতে, প্রেমে জগৎকে জাগাইতে ভগবান্ আপনার হ্লাদিনীশক্তির সহিত বৃন্দাবনে মাধুর্য্যের রাসলীলা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ অবতারের উদ্দেশ্যই অপূর্ণ মানবকে প্রেমের আস্বাদন করাইয়া, ভগবানের ক্ষরিত প্রেম-সুধা পান করাইয়া নিবৃত্তির পথে লইয়া যাওয়া। আদর্শ ব্যতীত মানব এক পদ অগ্রসর হইতে পারে না; অপূর্ণ জীব কি কখন পূর্ণানন্দ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে? গুণাবৃত গুণময় জীব কি কখন নির্গুণ প্রেমের আদর্শ হইতে পারে? অপূর্ণ জগতে পূর্ণ আর কে আছে? তাই ভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন। যথা:—

অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতং।
ভজতে তাদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরো ভবেৎ
শ্রীমদ্ভাগবত, ১০ স্কঃ।

ভগবান্ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ বিকাশার্থ

মানুষদেহ আশ্রয় করিয়া সেইরূপ ক্রীড়া করিয়াছিলেন,—যাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ—মানবগণ তাহা করিতে পারে। সেই ক্রীড়াই ব্রজলীলা। সেই প্রেমলীলার রাধাই প্রাণ। যেহেতু রাধিকার চিত্ত, ইন্দ্রিয়, দেহ প্রভৃতি সর্ব্বস্ব কৃষ্ণ-প্রেম-ভাবিত এবং তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিজ হ্লাদিনীশক্তি, রসক্রীড়ার সহায়। তিনি স্নেহাদি অষ্টবৃত্তিকে সখীরূপে সঙ্গে করিয়া ব্রজধামে অবতীর্ণা হইয়াছিলেন। সুতরাং গোপীভাবসাধনায় রাধাই প্রধান আদর্শ।

রাধাকৃষ্ণই রসতত্ত্ব,—সুতরাং জীবের ইহাই-সাধ্য। যে সাধনাবলম্বন করিয়া রাধাকৃষ্ণের রস-রতি জ্ঞান হয়, তাহাই সাধ্য-সাধন। রাধাই গোপীভাবনিষ্ঠ প্রেমময় স্বভাবলুব্ধভক্তের একমাত্র আদর্শ। জীবকে এই আদর্শ দেখাইয়া প্রেমভক্তির পথে পূর্ণানন্দ প্রদানের জন্যই ব্রজলীলা—ভগবানের 'রাধাকৃষ্ণ' অবতার। অতএব ব্রজলীলা বা রাধাকৃষ্ণের রতিরস কদর্য্য বা ঘৃণ্য নহে। ভগবান স্ব-স্বরূপেই রমমান্, তাই তাঁহার নাম আত্মারাম ঈশ্বর। সেই রমণলীলাই ব্রজলীলা। জীব আর শক্তি লইয়াই তাঁহার সকল; জীব আর শক্তি না থাকিলে তিনি নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়। জীব যখন সাধনবলে—নিষ্কামভাবে প্রকৃতির বাহুবন্ধন-মুক্ত হইয়া ভগবানে আত্মসমর্পণ করে, তখন ভগবানের স্বরূপশক্তি প্রাপ্ত হন। কিন্তু জীব তখন নিষ্কাম—তিনি শক্তি লইয়া কি করিবেন? তাঁহার কামনা গিয়াছে,—কর্ম্ম গিয়াছে, শক্তির তাঁহার প্রয়োজন কি? তাই জীব সে শক্তি তাঁহাকেই প্রত্যর্পণ করেন। সে শক্তি নিজ শক্তি বলিয়া—আনন্দময়ী হ্লাদিনীশক্তি বলিয়া ভগবান্ তাহা গ্রহণ করিয়া মধুরভাবে আলিঙ্গনকরতঃ মিলিত হয়েন। এইরূপে ভগবান্ ও ভক্তের স্বরূপগত অভেদাত্মক মিলনের নাম রমণ;—যোগীর ইহাই সমাধি। ভগবান্ ভক্তের সহিত রমণ করিবেন; ভক্তও ভগবানের সহিত রমণ করিবেন। এ রমণ বা মিলন পরস্পরের ইচ্ছায় নহে, স্বাভাবিক। ভগবান্ এইপ্রকারে যে নিজশক্তি বা প্রকৃতির সহিত রমণ করেন,—এ রমণ মায়িক জগতের কেহ জানিতে পারে না; ইহাই ব্রজের অমানুষী গূঢ়লীলা। এই স্বরূপশক্তির শীর্ষস্থানীয়া হ্লাদিনীশক্তি,—সেই আনন্দদায়িনী হ্লাদিনী ভগবান্‌কে আনন্দাস্বাদ করাইয়া থাকেন। হ্লাদিনীশক্তির দ্বারাই ভক্তের পোষণ হয়, তজ্জন্য তাঁহার অপর নাম গোপী। শ্রীমতী রাধাই গোপীকুলশিরোমণি,—তাই রাধার প্রেম ও সাধ্যের শিরোমণি। নিরবচ্ছিন্ন আনন্দদায়িনী হ্লাদিনীশক্তি রাধার সহিত পরমপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের যে মিলন, তাহাই রমণ বা রসক্রীড়া নামে অভিহিত। তাই গোপীভাবের সাধনায় শৃঙ্গার রসকে মধ্যগত করতঃ প্রেমিক-প্রেমিকা উভয়ের চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া সম্ভোগ-মিলন সংঘটিত হয়, তাহাতে সমস্তপ্রকার ভেদ-ভ্রম দূরীভূত হইয়া যায়। তাহাতেই কখন শ্রীকৃষ্ণ—রাধার ভাবে বিভোর হইয়া রাধা-প্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন; কখনও বা রাধিকা—শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ আচরণ করিয়া লীলানন্দ-সুখ অনুভব করিয়াথাকেন। ইহারই নাম বিবর্ত্তবিলাস। মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবে এই ভাব সম্যক প্রকাশিত হইয়াছিল।

রাধাকৃষ্ণ লীলায় জীব প্রেমভক্তির আদর্শ পাইল বটে, কিন্তু কিরূপ সাধনায় তাহা লাভ হইবে জানিতে পারিল না। সুতরাং তাহাদের

প্রেম-রসের পিপাসা মিটিল না। তাই তাঁহাকে আবার অবতীর্ণ হইতে হইল। ভগবানের কোন কর্ম্ম না থাকিলেও—

"আপনি করিয়া কর্ম্ম জীবেরে শিখায়।"

মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া নিজে কর্ম্ম-আচরণের দ্বারা জীবশিক্ষা দিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণের আদর্শে প্রেমভক্তি লাভের জন্য যখন জীবগণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল, তখন দয়ার সাগর ভগবান্ রাধাভাবে অর্থাৎ—হ্লাদিনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হইয়া গৌরাঙ্গ-রূপে নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইলেন। তাই তদীয় সম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ বলিয়া থাকেন যে,—"রাধাকৃষ্ণ একদেহে গৌরাঙ্গ হইয়াছেন,—গৌরাঙ্গের বহির্ রাধা, অন্তর কৃষ্ণ; অর্থাৎ—কৃষ্ণই রাধাভাবকান্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এ তত্ত্ব শাস্ত্র-পণ্ডিতের বোধগম্য না হইলেও সাধন-পণ্ডিতের বুঝিতে বিলম্ব হইবে না।

রাধাকৃষ্ণ প্রণয়বিকৃতি হ্লাদিনী শক্তিরস্মা—
দেকাত্মনাবপি ভুবিপুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকট মধুনাং তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধাভাবদ্যুতি সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্॥

ললিত মাধব।

শ্রীরাধাকৃষ্ণ এক আত্মা হইয়াও দ্বাপরের শেষে ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন; পরে সেই উভয়মূর্ত্তিই পুনরায় একতালাভে কলির প্রথমসন্ধ্যায় প্রকটিত হইয়া চৈতন্য নামক রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত কৃষ্ণ-স্বরূপে প্রেমরস আস্বাদ করিয়াছিলেন। কারণ এই যে, রাধা ও কৃষ্ণ উভয়েই জড়-প্রতিযোগী—চিদ্ঘনমূর্ত্তি; সুতরাং উভয় স্বরূপেরই প্রায় একবিধ উপাদান, কেবল কান্তি ও ভাব মাত্র বিভিন্ন। এইহেতু লীলা অন্তে তাঁহাদের স্বরূপের মহামিলনে কেবল কান্তি ও ভাবেরই পরিবর্ত্তন সঙ্গত, নতুবা অন্য কোনরূপ অবস্থান্তর সম্ভবপর নহে; পক্ষান্তরে শক্তি অপেক্ষা শক্তিমানের প্রাধান্যবশতঃ উভয়ের সম্মিলনে কৃষ্ণ স্বরূপই রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত হইয়াছেন, কিন্তু রাধা স্বরূপ কৃষ্ণ-ভাবদ্যুতি-সুবলিত হন নাই। শাস্ত্রপণ্ডিত ইহা স্বীকার করেন না, অর্থাৎ বুঝিতে পারেন না। কিন্তু যোগী, জ্ঞানী বা সাধকগণের এতত্ত্ব বুঝিতে কোনই বেগ পাইতে হয় না।

ভগবান্ রাধাকৃষ্ণ অবতারে যে তত্ত্ববিকাশ করিয়াছিলেন, সেই সাধ্যতত্ত্বের সাধনপ্রণালী গৌরাঙ্গ-অবতারে প্রচারিত হইয়াছিল। রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব সাধ্য অর্থাৎ—ভগবানের ভাব; আর গৌরাঙ্গতত্ত্ব সাধনা অর্থাৎ—ভক্তের ভাব। সুতরাং যিনি ভগবদ্ভাবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিয়াছিলেন, তিনিই ভক্তভাবে সেই লীলা-রস-মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জীবকে সেই-পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই রাধাকৃষ্ণ ও গৌরাঙ্গ অবতারের বিভিন্নতা; নতুবা তাঁহা-দিগের উপাদানগত কোনও পার্থক্য নাই। ইহাই বৈষ্ণবীয় দর্শনের অচিন্ত্যভেদাভেদতত্ত্ব।

ভগবানের হ্লাদিনীশক্তিই রাধা; সুতরাং শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত শক্তি শ্রীরাধার বস্তুগত কোন পার্থক্য নাই। যথাঃ—

শক্তি শক্তি মতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চনঃ।

শ্রুতি।

যেমন মৃগমদ ও তাহার গন্ধে গুণগত কোন পার্থক্য নাই এবং অগ্নি ও তাহার জ্বালাতে রূপগত কোন পার্থক্য নাই, সেইরূপ কৃষ্ণ ও

যাথায় রূপ-গুণগত কোন প্রভেদ নাই; সুতরাং তাঁহারা সর্ব্বদা অভিন্ন ও একমূর্ত্তি। শক্তিই জীব ও জগতের কারণ, সুতরাং জীব ও জগৎ কার্য্য ; কার্য্য কারণে লয় হইবে, আবার কারণ ব্রহ্মে বিলীন হয়। তাই জ্ঞানবাদী সন্ন্যাসিগণের অদ্বৈততত্ত্বই চরম লক্ষ্য,—তাঁহারা জীব-জগতের ধার ধারেন না। ভক্তগণ লীলারস-আস্বাদলুব্ধ বলিয়া লীলা অর্থাৎ জীব ও জগৎ অগ্রাহ্য করিতে পারেন না; কাজেই ভেদভাবও রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু তদীয় শক্তি বা শক্তির কার্য্য জীব-জগৎ ভিন্নবৎ প্রতীয়মান হইলেও বস্তুতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন ভবে এই অভেদ যেমন অচিন্ত্য, তেমনি ভেদ-প্রতীতিও অচিন্তনীয়; অন্যান্য দর্শন হইতে বৈষ্ণব-দর্শনের ইহাই বিশিষ্টতা। অল্পবুদ্ধি-লোকসকল লক্ষ্যভেদে যে মতবিভেদ ইহা না বুঝিয়া অন্যান্য বৈদান্তিকমতের নিন্দাকরতঃ নিজ নিজ মতের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করে। আপন আপন লক্ষ্যকে স্পষ্টরূপে প্রকাশিত করাই বিচারশাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং সেই উদ্দেশ্য লইয়া মতভেদে বেদান্তের ভাষ্য ও টীকা রচিত হইয়াছে। তাই ভক্তবৈদান্তিক বলেন, ভগবান্ হইতে তদীয় শক্তির ভেদকল্পনাও যেমন আমাদের সামর্থ্যাতীত, অভেদকল্পনাও তেমনি আমাদের সামর্থ্যাতীত। অথবা ভেদাভেদবাদ অবশ্যই স্বীকার্য্য, অর্থাৎ—স্পষ্টরূপে উহার বিকল্পনা অসম্ভব—উহা চিন্তার আয়ত্ব নহে, সেইজন্য এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য।

গৌরাঙ্গদেব অভেদতত্ত্ব আর রাধাকৃষ্ণ ভেদতত্ত্ব; সাধনায় গৌরাঙ্গত্ব লাভ করিয়া রাধাকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই প্রেমিকভক্তের চরম লক্ষ্য। ইহাই সুনিশ্চিত সাধ্যবিধি। তাই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ে অচিন্ত্যভেদাভেদমতই বেদান্ত হইতে গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সাধনায় অদ্বৈততত্ত্ব অর্থাৎ গৌরাঙ্গত্ব লাভ করিয়া ভেদ-তত্ত্বের অর্থাৎ রাধাকৃষ্ণের লীলারস-মাধুর্য্য আস্বাদন করাই পঞ্চম পুরুষার্থ। গোপীভাবে রসতত্ত্বের সাধনায় গোপী স্বরূপে আত্মোপলব্ধি হয়,—ভক্ত তখন রাধাকৃষ্ণানন্দ অনুভব করিতে পারেন। তখন ভক্ত গৌরাঙ্গ-দেবের ন্যায় কখনও শ্রীকৃষ্ণরূপে রাধার ভাবে বিভোর হইয়া রাধাপ্রকৃতি অবলম্বন ও রাধার স্বরূপ আচরণ করেন, কখনও বা শ্রীরাধিকা রূপে কৃষ্ণের স্বরূপ আচরণ করিয়া লীলানন্দ সুখ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপ ভাবের উদয় হওয়ায় ভক্ত উভয়েরই প্রেমরসাস্বাদ করিয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

—:০:—

সাধক-সঙ্গীত।

[১]

আমার গতি কি হবে গো ত্রিনয়নি।
মতি সতত কুপথগামিনী ॥

ভারত পুরাণে যেরূপ শুনি,
তাতে আমা হেন পাপীর—ভার ত ভারতভূমি
সহে না গো ভূভারহারিণী ॥
অহং প্রভাবে নাই সোহং সদ্ভাবে জ্ঞান,
মোহময়ী প্রমোদ মদিরা পানে গেল প্রাণ,
হ্রী-মান ভাঙ্গিব কিসে, কিসে বা হব শ্রীমান্,
তাই ভাবি দিবস রজনী ॥
রমণীর প্রেম পাশ, হেম রজত পিপাস মন,—
পাসরে না পাষণ্ড এমনি।—
বান্ধা আছি সুতাদি বান্ধবের মায়া সুতা দিয়ে,
গিরিসুতা না গেল কাল তন্নাম সু-তান গেয়ে,
পশু, তাই ভূলে থাকি তোর মত প্রসূতা পেয়ে,
আশু তার উপায় কি জননী।
চাহে মন চতুর তুরগাদি চতুরঙ্গ সেনা,
চাহে মন মুকুট রাজধানী।
এইরূপে গেল কাল, কিরূপে কুটিল প্রাণ—
দারা সুতের দ্বারা তারা।
তারাই ত কালের দ্বারবান্;
তোমা বিনে এ সংসারে গোবিন্দে করিতে ত্রাণ,
আর কারে না দেখি না শুনি।

———:0:———

পাগলের খেয়াল্।

চতুর্থ উচ্ছ্বাস।

(১)

জ্ঞান কাহাকে বলে? কর্ম্মের চরমাবস্থা অর্থাৎ ফল, যাহা স্থূলভূত হইতে ইন্দ্রিয়ে, ইন্দ্রিয় হইতে মনে, মন হইতে অহংকারে, অহংকার হইতে মহত্তত্বে যুক্ত হয়; চৈতন্যের স্পন্দনের প্রথম স্থান প্রকৃতি; যাহাতে আঘাত প্রাপ্ত হইলে চৈতন্যে প্রতিঘাত হয়, এবং সেই প্রতিঘাত ব্যক্তপ্রক্ষেপকারণ শক্তিরূপে প্রকাশিত হইয়া চৈতন্য হইতে স্থূলভূত পর্য্যন্ত পৌঁছিলে, যে বোধ জন্মে, তাহাই জ্ঞান।

ইউরোপীয় জড়বৈজ্ঞানিকগণ বলিয়া থাকেন, কোন বিষয় ইন্দ্রিয় হইতে মস্তিষ্কে পৌছিয়া, পুনরায় ইন্দ্রিয় পর্য্যন্ত পৌছিলেই আমাদের বিষয়ের জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। পাগলের বিবেচনায় তাঁহারা যেন একটু স্থূলভাবে বুঝিয়াছেন, যেহেতু মস্তিষ্ক প্রকৃতির শক্তিতে শক্তিসম্পন্ন, প্রকৃতি চৈতন্যের আশ্রিত সুতরাং মস্তিষ্কের কার্য্য করিতে হইলে প্রকৃতি হইতে শক্তিলাভ করিতে হয় প্রকৃতি চৈতন্যের আশ্রিত হেতু, মস্তিষ্ককে শক্তি প্রদান করিতে হইলে চৈতন্য হইতে তাঁহাকে শক্তি সংগ্রহ করিতে হয়। ইহা হইতে বুঝাযায় যে প্রত্যেকেই প্রত্যেকের সহিত নিত্য সম্বন্ধে যুক্ত রহিয়াছে; সুতরাং বিচ্ছিন্ন অবস্থায় কখনও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে না। মোটামোটিভাবে বুঝিতে গেলে যাহা বোধহয় তাহাই জ্ঞান।

যাহা বোধহয় তাহা কিরূপে হইয়া থাকে? কতকগুলি বিষয় আমাদের ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎসংযোগের দ্বারা উপলব্ধি হইয়া থাকে, এই প্রকার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকে প্রত্যক্ষ-জ্ঞান বলে।

কোন কোন বিষয় আমরা অনুমান দ্বারা জ্ঞাত হইয়া থাকি। গৃহে শয়ন করিয়া বাহিরে রৌদ্র দেখিলে, আকাশে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে জানিতে পারি। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি আকাশে সূর্য্যের উদয় হইলে, রৌদ্র প্রকাশিত হয়, সুতরাং সূর্য্য প্রত্যক্ষ না করিয়াও পূর্ব্বলব্ধ জ্ঞান হইতে আকাশে সূর্য্যের উদয় নিশ্চয় হইয়াছে জানিতে পারি। যদিও এখানে সূর্য্য প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, তথাপি রৌদ্র দৃষ্টে অনুমান দ্বারা সূর্য্যের উদয় হইয়াছে জানিতে পারিয়াছি; এইরূপ অনুমানসিদ্ধ জ্ঞানকে অনুমিতি বলে।

বেদাদি শাস্ত্রের অনুশীলনে অথবা গুরু-স্থানীয় ব্যক্তির কথায় বিশ্বাস করিয়া, যে জ্ঞান লাভহয়, তাহাকে শব্দজ্ঞান বলে। এইপ্রকার জ্ঞানে ভুলথাকা অসম্ভব নয়। ঈদৃশ শব্দজ্ঞানদ্বারা মনুষ্যের স্বাধীনচিন্তায় ব্যাঘাত জন্মিয়া থাকে। কোন ব্যক্তি প্রকৃত গুরুস্থানীয় নয়, অথচ জ্ঞানের সম্বন্ধতার দরুণ তাহাকে চিনিতে না পারিয়া, তাহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে নিশ্চয়ই ভ্রমাত্মক জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। একমাত্র তাহার কথায় বিশ্বাস করিয়া স্বাধীনচিন্তায় প্রবৃত্ত না হইয়া, ভ্রমে পতিত হইতে হইল। সুতরাং এইরূপ জ্ঞান উৎকৃষ্ট নয় এবং স্বাধীন চিন্তা দ্বারা উন্নতির ইহা প্রতিবন্ধক স্বরূপ।

ন্যায়শাস্ত্রে আর একপ্রকার জ্ঞানলাভের উপায় নির্দ্ধারিত আছে তাহা উপমিতি। একাধিক বিষয়ের উপমা দ্বারা সমগুণবিশিষ্ট অন্য কোন বিষয় সম্বন্ধে যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাকেই উপমিতি কহে। সূক্ষ্মভাবে দেখিলে বুঝাযায় যে, যাহা উপমিতি তাহা অনুমিতিরই প্রকারভেদ মাত্র। এইজন্য সাংখ্যকার ইহাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করেন নাই, বাস্তবিক পৃথকভাবে উল্লেখ করিবার কোন আবশ্যকতাও নাই।

এক্ষণে বুঝাগেল যে, আমরা যাহা জানিয়াছি বা যাহা জানি তাহা প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই তিনপ্রকার জ্ঞানের

উপর নির্ভর করিয়াই জানিয়া থাকি। শব্দ-জ্ঞান উৎকৃষ্ট নয়, প্রত্যক্ষও অনুমানসিদ্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ও জ্ঞানের মূল।

প্রত্যেকটী বিষয় সূক্ষ্মভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া জ্ঞান লাভ করা, সীমাবদ্ধ মনুষ্যের কার্য্য নয়। এইজন্য একমাত্র অনুমানের সাহায্যেই অধিকাংশ বিষয়ের জ্ঞান লাভকরিতে বাধ্য হয়। যে বিষয়ের কখনও প্রত্যক্ষ জ্ঞান-লাভ হয় নাই, এমন বিষয় অনুমান দ্বারা নিষ্পন্ন করা অসম্ভব।

যদি কখনও সূর্য্য না দেখিতাম তাহা হইলে রৌদ্র ও সূর্য্যের অস্তিত্ব অনুমান করিতে সক্ষম হইতাম না। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যাহা কিছু প্রত্যক্ষ জ্ঞানগোচর হইয়াছে, তদতিরিক্ত কোন বিষয় কি অনুমান করাযায়? নিশ্চয়ই যায় না। সুতরাং প্রত্যক্ষ ভিন্ন অনুমান-সিদ্ধ জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। তাহা হইলে দেখাযায় যে, একমাত্র প্রত্যক্ষপ্রমাণই জ্ঞানের মূল।

মনুষ্যের জ্ঞান তীক্ষ্ণ বলিয়া অল্প বিষয় প্রত্যক্ষ করিয়াও বহুবিষয়ের জ্ঞান অনুমানের সাহায্যে লাভকরিতে সক্ষমহয়। এইজন্য জাগতিক অধিকাংশ কার্য্যাদি একমাত্র অনু-মানের সাহায্যেই সাধিত হইতেছে। দর্শন বিজ্ঞানাদি অনুমানের উপরই নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু যাহা নিষ্পন্ন হইতেছে বা হইয়াছে তাহার মূলে সূক্ষ্ম প্রত্যক্ষজ্ঞান প্রচ্ছন্ন আছে।

ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান যদিও অনুমানদ্বারা বুঝিতে হয় তথাপি মূলে প্রত্যক্ষজ্ঞান বর্ত্তমান রহিয়াছে। কর্ত্তা ভিন্ন যে ক্রিয়া হয় না ইহা-প্রত্যক্ষপ্রমাণ দ্বারাই জ্ঞাত হই; সুতরাং জগৎ দেখিয়া ইহার অবশ্য একজন কর্ত্তা আছেন, এইরূপ অনুমান করিতে সহজেই সক্ষম হওয়া যায় এবং সেই অনুমানসিদ্ধ কর্ত্তাকেই ব্রহ্ম বলিয়া থাকি। যদি কর্ম্ম থাকিলেই কর্ত্তা থাকিবে এইরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ না হইত তাহা হইলে ব্রহ্ম সম্বন্ধে কোন ধারণাই করা যাইত না।* এক্ষণে স্পষ্ট বুঝাগেল যে, একমাত্র প্রত্যক্ষজ্ঞানই জ্ঞানের মূল।

(২)

এই প্রত্যক্ষবিষয়টী কি? ইহা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষাৎ-সংযোগে বোধউৎপাদক কর্ম্ম। তাহা-হইলে জ্ঞান ও কর্ম্মে কি সম্বন্ধ?

প্রথমে দেখা যাউক অগ্নি ও আলোকে কি সম্বন্ধ? যেখানে অগ্নি সেইখানেই আলোক বর্ত্তমান থাকে, ইহা আমরা সর্ব্বত্র দেখিতে পাই। সুতরাং উভয়ে এক অবিচ্ছেদ্য নিত্য-সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। অগ্নি স্থূল সে দহন করে; আলো সূক্ষ্ম, সে মধুর শান্তিময়। অথচ এই মধুর শান্তিময় আলো কেন্দ্রীভূত হইলেই প্রচণ্ড দহ-শক্তি অগ্নিরূপে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। যখন অগ্নি না দেখিয়া কেবল আলোকের বিকাশ দেখি তখন সে কি মধুর, তখন ভ্রমেও মনে হয় না যে, এই আলোকই কেন্দ্রীভূত হইলে স্থূলপ্রাপ্ত অগ্নিরূপে প্রকাশিত হয়। সেইরূপ কর্ম্ম—অগ্নি, জ্ঞান—আলো। উভয়ে এক অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান রহিয়াছে। কর্ম্ম স্থূল সে আয়াসসাধ্য, দুঃখজনক;

---

*কোন প্রকার প্রমাণ দ্বারা ব্রহ্ম প্রমাণ করা যায় না; ইহা নাস্তিকবাদ সুতরাং উল্লেখ যোগ্য নয়।

জ্ঞান সূক্ষ্ম, সে স্বভাবসিদ্ধ, মধুর শান্তিময়। অগ্নি হইতে আলোক যেমন বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না, সেইরূপ কর্ম্ম হইতে জ্ঞানও বিভক্ত হইতে পারে না। তাই যেখানে কর্ম্ম সেই-খানেই জ্ঞান, যাহা জ্ঞান তাহা কর্ম্মের চরমাবস্থা।

কর্ম্মের চরমাবস্থায় অর্থাৎ কর্ম্ম যখন সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্তহয়, তখনই তাহা জ্ঞানে পরিণত হয়। সুতরাং তখন জ্ঞানের স্থূলা-বস্থা (অর্থাৎ কর্ম্ম) লয় হইয়া যায়। তাই জ্ঞানোদয়ে কর্ম্মের আবশ্যকতা বুঝা যায় না। কিন্তু জীব প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে কর্ম্ম না করিয়া ক্ষণকালও অবস্থান করিতে পারে না। জ্ঞানোদয়ে অহংকারের অস্তিত্ব লয় হইয়া যায়, সুতরাং সেই অবস্থায় যে কর্ম্ম থাকে তাহা নিষ্কাম। যাহা নিষ্কাম তাহা মুক্ত, যাহা মুক্ত, তাহা অহংকার হইতে বিচ্ছিন্ন, তাহা আমার কর্ম্ম নয়; যাহা আমার কর্ম্ম নয়, তাহা প্রকৃতির কর্ম্ম, যাহা প্রকৃতির কর্ম্ম, তাহা সগুণ ব্রহ্মের কর্ম্ম এবং এই কর্ম্মের ফল তাঁহারই জ্ঞাতব্য।

গভীর নিদ্রাভিভূতাবস্থায় জ্ঞানের অস্তিত্ব প্রকৃতিতে লীন থাকে, সুতরাং সেই অবস্থায় শ্বাস প্রশ্বাসাদি জ্ঞানগোচর না থাকিলেও প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে চালিত হইয়া থাকে। জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকে বলিয়া, আমিত্বের অস্তিত্ব থাকে না, সুতরাং শ্বাস-প্রশ্বাসাদি অহংকার অভাবে নিষ্কাম কর্ম্ম। যাহা নিষ্কাম কর্ম্ম তাহা প্রকৃতির কর্ম্ম,—যাহা, প্রকৃতির কর্ম্ম—তাহা আত্মার কর্ম্ম। অহংকার হইতে বিচ্ছিন্ন আত্মা শুদ্ধ সুতরাং শুদ্ধাবস্থায় নিষ্কাম কর্ম্মের ফল আত্মার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না।

কর্ম্ম নিষ্কাম হইলেই বিকারশূন্য হয়, যাহা নির্ব্বিকার তাহা শুদ্ধ। যাহার স্থূলাবস্থা শুদ্ধ তাহার সূক্ষ্মাবস্থাও শুদ্ধ। যাহা উভয় অবস্থায়ই নির্ব্বিকার, শুদ্ধ, তাহা নিত্য ও আনন্দময়, যাহা নিত্য ও আনন্দময় তাহা আত্মার বিশুদ্ধাবস্থা; তাহা তাহার বন্ধনের কারণ হইতে পারে না। নিষ্কামকর্ম্ম বন্ধনের কারণ নয় বলিয়াই শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে নিষ্কাম কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। মানুষ সাধারণতঃ কর্ম্মফল আকাঙ্ক্ষা করিয়াই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয় এবং কর্ম্মের বিভিন্নতানুসারে সুখদুঃখ ভোগ করিয়াথাকে। স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দুঃখদায়ক কর্ম্ম পারিত্যাগ করিয়া সুখকর কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়। কিন্তু যেমন সকাম কর্ম্মই হউক না কেন, আকাঙ্ক্ষার নিবৃত্তি কখনও হয় না সুতরাং স্থায়ী সুখলাভ করিতে সক্ষম হয় না।

যদিও সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানে স্থায়ী সুখলাভ হয় না, তথাপি ইহা দ্বারা উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে। অতি জঘন্য কর্ম্মানুষ্ঠান হইতেও, শুদ্ধ জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া পরিণামে উন্নতি লাভ হইয়া থাকে। বিল্বমঙ্গল ঠাকুর ইহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

সকামভাবে সুখদায়ক কর্ম্মের অনুষ্ঠানে সুখী হইলে, অধিকতর সুখদায়ক কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে, এইরূপে কর্ম্মের ও জ্ঞানের ক্রমোন্নতি সাধিত হয়। জ্ঞানের চরমাবস্থায় কামনা দ্বারা সুখের পূর্ণতা লাভ হয় না বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক নিষ্কাম হইয়া পরাশান্তি লাভ করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। এই অবস্থায় সাধক নির্গুণ ব্রহ্ম-ভাবে অবস্থান করিয়া থাকেন। বেদে যজ্ঞাদি

সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানের যে উল্লেখ আছে, তাহার উদ্দেশ্য একমাত্র কর্ম্মযোগী সমাজকে উন্নত করা। সমাজ উন্নত থাকিলে তদ্ভুক্ত মানবমণ্ডলী নিশ্চয়ই উন্নতি লাভ করিতে সক্ষম হয়। যদিও বৈদিক যজ্ঞাদি সকাম তথাপি ইহা নিষ্কামে পৌছিবার উৎকৃষ্ট পথ।

সকাম ব্রহ্মোপাসনা হইতে ব্রহ্মে প্রীতি, কৃতজ্ঞতা, স্নেহ ও রাগাত্মিকা ভক্তি জন্মিয়া থাকে। ইহাদিগের অনুশীলনে ক্রমে কামনার অতীত হইয়া যায়; এই অবস্থায়ই নিষ্কাম ধর্ম্মের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। এই নিষ্কাম ধর্ম্মের ফল হইতে নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, শুদ্ধ নিত্যজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

ধর্ম্মাচরণের ক্রিয়ার বিভিন্নতানুসারে জ্ঞান উন্নত হয় এবং ক্রমে তাহা ভূমার দিকে প্রসারিত হইতে হইতে নিরঞ্জন, নিরাকার ভূমা-ব্রহ্মে নিষ্কামভাবে লয় হইয়া যায়। যেখানেই সকাম ব্যক্ত, সেইখানেই নিষ্কাম অব্যক্তাবস্থায় বর্ত্তমান রহিয়াছে। যাহা সকাম, তাহা নিষ্কামের ব্যক্তাবস্থা মাত্র। সকাম—অগ্নি, নিষ্কাম—আলো। সকামে দুঃখ আছে, নিষ্কাম মধুর, শান্তিময়। সকাম—বন্ধনের কারণ; নিষ্কাম—মুক্তির পথ। নিষ্কামাবস্থায় জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করিলে ভেদাভেদ লয় হইয়া যায়, তখন সসীম—অসীম হয়, সগুণ—নির্গুণ হয়; অবশেষে নির্গুণ ব্রহ্মে লয় হইয়া যায়। এই অবস্থাই মুক্তি নামে অভিহিত।

(৩)

জ্ঞানের আবশ্যকতা কেন? মুক্তিপথে জ্ঞানই একমাত্র পরিচালক। হীনাবস্থা হইতে উন্নতাবস্থা লাভ করিতে জ্ঞানই একমাত্র অবলম্বনীয়। জ্ঞান ভিন্ন কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং ভক্তি ও জ্ঞান ভিন্ন হইতে পারে না। জ্ঞান হইতে শুদ্ধত্ব, শুদ্ধত্ব হইতে বিশ্বাস, বিশ্বাস হইতে অনুরাগ, অনুরাগ হইতে কৃতজ্ঞতা, কৃতজ্ঞতা হইতে প্রীতি, প্রীতি হইতে প্রেম, প্রেম হইতে রাগাত্মিক ভক্তি, রাগাত্মিকা-ভক্তি হইতে অহৈতুকীভক্তির উদয় হইয়া থাকে। এই অবস্থায় পূর্ণ নিষ্কামতা লাভ হয়। নিষ্কাম হইলেই ভূমা, ভূমা হইতে-নির্ব্বিকার, নির্ব্বিকার হইতে শুদ্ধে, শুদ্ধ হইতে-নিত্যে, নিত্য হইতে সত্যে, সত্য হইতে ব্রহ্মত্ব লাভ হইয়া থাকে। ইহাই মোক্ষলাভ।

জ্ঞান এবং ভক্তিতে প্রভেদ কি? ভক্তি জ্ঞানের আশ্রিত, জ্ঞান প্রকৃতির আশ্রিত, প্রকৃতি চৈতন্যের আশ্রয়ে রহিয়াছে। চৈতন্য অচৈতন্যের ব্যক্তাবস্থান, অচৈতন্য—চৈতন্য ও অচৈতন্যের অতীত কোন একটা কিছুও বলা যায় না, এইরূপ কিছু একটার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠাতাই গুণাতীত, জ্ঞানাতীত ব্রহ্ম। *

জ্ঞান কর্ত্তা, ভক্তি কর্ম্ম, ভক্তি স্থূল, জ্ঞান সূক্ষ্ম, বস্তুতঃ ভক্তির অন্তর্মুখী অবস্থাই জ্ঞান। জ্ঞানের অন্তর্মুখী অবস্থা হইতেই মুক্তি। এই মুক্তিপথে জ্ঞানের সপ্ত ভূমিকার উল্লেখ আছে। শুভেচ্ছা, বিচারণা, তনুমানসা, সত্ত্বাপত্তি, অসংশক্তি, পদার্থভাবিনী ও তুর্য্যগা। এই সপ্ত স্তরের আশ্রয়ে ক্রমে উন্নত হইয়া মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

বিষয়ে বৈরাগ্য, শাস্ত্রোপদেশ শ্রবণে রত, গুরু, প্রতিমা, দেবালয়, শৌচাচার, তীর্থ ইত্যাদিতে অনুরাগ, ব্রহ্মোপাসনায় ঐকান্তিক

* এসম্বন্ধে পাগলের দর্শন প্রবন্ধে দ্রষ্টব্য।

ইচ্ছা ইত্যাদি শুভ ইচ্ছাকে—শুভেচ্ছা কহে।

আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছি। কি করিতে হইবে? ব্রহ্ম কি? তাহার উপাসনায় কি ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে? এই-রূপ বিচারের নাম সুবিচারণা। বিচারে ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান স্থিরতা লাভ করিলে তাহাতে তন্ময় হইয়া অবস্থান করার নাম তন্মানসা, এই তিন ভূমিকায় দ্বৈতজ্ঞান বর্ত্তমান থাকে; এইজন্য ইহা জাগ্রতভূমিকা নামে অভিহিত।

যে ভূমিকায় সমস্ত বিশ্ব স্বপ্নতুল্য বোধ হয় এবং সকলই ব্রহ্ম বলিয়া উপলব্ধি হয়; এই প্রকার অদ্বৈত জ্ঞানসম্পন্ন, ভূমিকার নাম সত্ত্বাপত্তি। রাজর্ষি জনক এই ভূমিকায় সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন।

যে ভূমিকায় অবস্থান কালে, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপ জ্ঞানহয়, ভূমা বলিয়া নিরাসক্ত ও অহংকারশূন্য হয়, তাহাই অসংসক্তি-ভূমিকা নামে খ্যাত। যোগীবর শুকদেব, এই ভূমিকায় সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন।

যে অবস্থায় কোন বিচারে সামর্থ্য থাকে না, বুদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে এবং ঘোরতর সুষুপ্তি অবস্থার ন্যায় অবস্থান করিতে হয়; তাহাই পদার্থভাবিনী ভূমিকা নামে অভিহিত।

যে অবস্থায় সমস্ত ভাবের অভাব হয়, ধ্যেয় ও ধাতা উভয়ের ভেদাভেদ লয় হইয়া যায় এবং নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ করিয়া অজ্ঞাতসারে কেবলমাত্র বায়ু দ্বারাই জীবন রক্ষিত হয়, তাহাই তুর্য্যগা ভূমিকা নামে খ্যাত। এই ভূমিকায় যোগিনীশ্রেষ্ঠা দেবহুতি এবং যোগীশ্রেষ্ঠ যামদগ্নি, ভরত, ঋষভ-দেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ সর্ব্বদা অবস্থিত ছিলেন।

এই তুর্য্যগা ভূমিকায়ই জ্ঞান, ভক্তি, যোগ, কর্ম্ম ইত্যাদি পূর্ণরূপে বিকশিত হইয়া ব্রহ্মে অনন্তকালের জন্য লয় হইয়া যায়। এই অবস্থায় সুখ, দুঃখ, কামনা সকলেরই চিরকালেরতরে নির্ব্বাণ হয়, খণ্ডত্ব ও অখণ্ডে—চিরকালের জন্য লয় হইয়া যায়। সুতরাং নিত্য, নিরঞ্জন, নির্ব্বিকার, ভূমা—ব্রহ্মত্ব লাভে সমর্থ হয়।

জ্ঞান চৈতন্যস্পন্দনের বিস্তৃতিহেতু প্রকৃতি হইতে প্রকাশিত। এই ভূমা স্পন্দনের সাহায্যেই জ্ঞান হইতে অহংকারের বিকাশ হইয়া, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কার্য্য সংঘটিত হইতেছে; এবং এই জ্ঞান দ্বারাই পুনরায় মুক্তিলাভ হইয়া থাকে। দর্শন, বিজ্ঞানাদি এই জ্ঞান হইতেই প্রকাশিত, বস্তুতঃ জ্ঞান ভিন্ন সকলই অব্যক্ত, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়, অক্ষম, তাই শাস্ত্রকারগণ জ্ঞানকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৃত্তি বলিয়া নির্দ্দেশকরিয়া গিয়াছেন।

—:0:—

উপদেশ—সংগ্রহ।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১০৪। পায়ে কাদা মাখিয়া যে স্থানে পা দিবে সেই স্থান যেমন কাদাময় হয় সেই-রূপ কলুষিত চিত্তে যাহা দেখিবে তাহাই কলুষিত বিবেচনা হইবে।

১০৫। এজগতে মিথ্যা কিছুই নাই সকলের মূলে একটু না একটু সত্য নিহিত আছেই আছে।

১০৬। আহার নিদ্রা ভয় এ তিনটার হাত হইতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা কেহই মুক্ত নহে; এ তিনটাকে আয়ত্ব করিতে না পারিলে সাধন ভজন বৃথা।

১০৭। যাহার ত্যাগের দিকে লক্ষ্য নাই তাহার সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন বৃথা, গৃহাস্থাশ্রমই তাহার পক্ষে বিধেয় কেননা উহাই তাহার স্বধর্ম্ম।

১০৮। কলির সবই উল্‌টা; বাচাল রোগী চিকিৎসকে বলিয়া থাকে—"আমার এই রোগ অমুক ঔষধ দেন"—ধর্ম্ম জগতেও তাই, কোন শিষ্য গুরুকে বলিতেছেন—'আমাকে প্রাণায়াম শিক্ষা দেন,' কেহ বলিতেছেন—'আমাকে খেচরীমুদ্রা শিখাইয়া দেন' ইত্যাদি গুরুশিষ্যে সম্পর্ক যেরূপ ফল ও তদ্রূপ।

১০৯। "গুরু" খেলার কথা নয়—গুরুই সব, গুরুকে না চিনিলে—গুরুতে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করিতে না পারিলে যোগ যাগ মুদ্রা প্রাণায়াম সব বিফল।

১১০। প্রণাম অর্থ কি ?—প্র—নম্+ ঘঞ্—প্রকৃষ্টরূপে নতি অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ।

১১১। ভরা পেটে মিষ্টান্নেও স্পৃহা থাকে না।

১১২। আমি "অমুকের শিষ্য" একথা বড় অহাঙ্কারজনক; শিষ্য বলিয়া পরিচয় দিবারই কোন দরকার নাই; কেননা যখন লোকে গুরুর সমস্ত গুণ তোমাতে প্রতিফলিত দেখিবে তখন তোমার কার্য্যাবলীই তোমার শিষ্যত্বের পরিচয় প্রদান করিবে এবং সেই সময়েই তুমি প্রকৃত শিষ্যপদ বাচ্য।

১১৩। মনকে এরূপ ভাবে তৈয়ার করিতে হইবে যেন সে ইন্দ্রত্ব ব্রহ্মত্ব পাইলেও তুচ্ছ জ্ঞান করে, তখনই মানবের পূর্ণত্ব।

১১৪। পতিব্রতা বা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের অর্থ এই নয় যে সুধু পতিকেই ভক্তি, শ্রদ্ধা, প্রেম করিতে হইবে, যিনি পতিকে ভগবান মনে করিবেন, তিনি যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন সেই দিকেই পতির বিকাশ দেখিতে পাইবেন; এবং সেইভাবে জগৎকে গ্রহণ করিবেন। যদি ভগবান সর্ব্বব্যাপী হন, তবে পতিরূপে ভগবান কেন না সর্ব্বব্যাপী হইবেন ? ভগবান কামগন্ধের অতীত সুতরাং যখন পতিকে ভগবান রূপে ধ্যান করিবে তখন তাহাতে কামগন্ধের লেশমাত্র থাকিবে না ইহাই পতিব্রতা বা পাতিব্রত্য ধর্ম্মের লক্ষণ।

১১৫। যে কথা প্রাণের সহিত বলিতে পারিব না তাহাতে সত্য সম্বন্ধে সন্দেহ আছে বুঝিতে হইবে, কেন না প্রাণের কথা সর্ব্বদা সত্য; সত্য বলিতে কোন শঙ্কা নাই।

১১৬। আসক্তি ও ভক্তি একই জিনিষ কেবল ব্যবহার ভেদে ভিন্ন। পরানুরক্তি বৃত্তির বিষয়ের দিকে গতি হইলে আসক্তি আর ভগবানের দিকে গতি হইলে ভক্তি নামে আখ্যাত হয়।

১১৭। আসক্তিপরিহার বা বিষয়বিরক্তি একই কথা; সুতরাং ভক্তিলাভ করিতে পারিলে আপনা হইতেই বৈরাগ্যের উদয়

হয়, সেজন্য গৃহত্যাগ, দেশত্যাগ বা চিমটা করঙ্গ লইয়া সন্ন্যাসী সাজিবার দরকার হয় না।

১১৮। তিনিই জ্ঞানী বা প্রেমিক যিনি সাপ বাঘকে আপন বলিয়া বুকে তুলিয়া লইতে পারেন; আর তিনিই গৃহস্থ যিনি আপনার উপযুক্ত পুত্রকে হাসিতে হাসিতে মৃত্যুর কোলে তুলিয়া দিতে পারেন।

১১৯। কাম না থাকিলেই সন্ন্যাসী বা ভক্ত হয় না তাহা হইলে বালক বা বৃদ্ধও সন্ন্যাসী পদবাচ্য।

১২০। যার বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি তার ক্ষয়ও তাড়াতাড়ি যেমন কলাগাছ; আর যার বৃদ্ধি যত দেরীতে হয়, তার স্থায়ীত্বও তত বেশী, যেমন তালগাছ।

১২১। ভাষার পারিপাট্য থাকুক আর নাই থাকুক প্রাণের কথা প্রাণস্পর্শী হবেই হবে।

১২২। গৃহেই থাক আর বনেই থাক সৎসঙ্গই কর আর অসৎসঙ্গই কর—নিরপেক্ষ ও চিত্ত স্থির না হইলে জীবনে কেহ কিছু করিতে পারিবে না।

১২৩। যতই ভগবানে নির্ভরতা আসিবে ততই ভয়, ভাবনা, অশান্তি দূরে পলায়ন করিবে।

১২৪। আপন আপন অদৃষ্টের উপর নজির বসাইওনা, অদৃষ্ট নজিরের ধার ধারে না।

১২৫। অচল বিশ্বাস রাখিয়া ধৈর্য্য সহকারে সময়ের অপেক্ষা কর নিশ্চয় সত্যলাভ হইবে।

১২৬। উপদেশ অপেক্ষা উদাহরণ অধিক কার্য্যকরী।

১২৭। যতক্ষণ সমুদ্রের জল মেঘ হইয়া বৃষ্টিরূপে পতিত না হয় ততক্ষণ সমুদ্রের জল কোন কাজে লাগান যায় না, সেইরূপ ততক্ষণ ব্রহ্ম দ্বারাও কোন কাজ হয় না যে পর্য্যন্ত ব্রহ্ম জীবরূপে পরিণত না হইয়াছেন।

১২৮। নাম করার উদ্দেশ্য প্রেমলাভ।

১২৯। শুধু পুস্তক পড়িলে হয় না, ইহার ভিতর হইতে শিক্ষনীয় কথা—প্রাণের কথা সংগ্রহকরতঃ নিজের জীবনে প্রতিফলিত করিতে হইবে তবেই পুস্তক পাঠের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

১৩০। যদি শিক্ষনীয় বিষয় নিজের জীবনে ফলান যায় তবে তাহাই হইল প্রকৃত শিক্ষা।

—:0:—

মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তল্লোভোপায়।

(১০ সংখ্যার ২১৭ পৃষ্ঠা হইতে ২২১ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলে আত্মস্বরূপে কিম্বা সচ্চিদানন্দ বিগ্রহে মনোনিবেশ হইয়া চিত্ত শান্তমূর্ত্তি ধারণ করিয়া অটল হয়। কারণ এই অবস্থায় চিত্তের বৃত্তি-

বৈরাগ্য দ্বারা পাশ-বন্ধনও ছিন্ন হইয়া যায়।

সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে; অর্থাৎ চিত্তের আর কোনরূপ ক্রিয়া থাকে না; কাজেই ঘৃণা, লজ্জা, মায়াদি অন্তর্হিত

হইয়া সাধক তখন শিবস্বরূপে অবস্থিত করেন। কারণ—

এতৈর্ব্বদ্ধঃ পশুপ্রোক্তো মুক্ত এতৈঃ সদাশিবঃ।
ভৈরবযামল।

ঘৃণা, শঙ্কা, ভয়, লজ্জা, জুগুপ্সা, কুল অর্থাৎ জাত্যাভিমান, শীল, মান, এই অষ্ট পাশে যে বদ্ধ, তাহাকে পশু বলাযায়; আর এই পাশ হইতে যিনি মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই সদাশিব। এইরূপে শিবত্ব লাভ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান প্রকাশিত হয়। তখন অহংবুদ্ধি বিনষ্ট হওয়ায় কর্ত্তব্যজ্ঞান এবং স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি কারুণ্যভাব তিরোহিত হয়। সেই সময় স্ব স্বরূপে অবস্থিতির জন্য সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিবে, ইহাই শাস্ত্রকার ঋষিগণের অভিপ্রায়। যথাঃ—

তত্ত্বজ্ঞানে সমুৎপন্নে বৈরাগ্যং যায়তে যদা।
তদা সর্ব্বং পরিত্যজ্য সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রয়েৎ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র, ৮উঃ, ১৫ শ্লোঃ।

মুমুক্ষুর সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ।

দৃঢ়তর বৈরাগ্যাভ্যাসে যখন তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইবে, তখন সমুদয় পরিত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিবে। জ্ঞান না হইলে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। তাই শাস্ত্রে আছে যে,—

ব্রাহ্মণস্য বিনাহন্যস্য সন্ন্যাসো নাস্তি চণ্ডিকে।

ব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যতীত অন্যের সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার নাই। অন্যে গ্রহণ করিলে পাপভাগী হইবে মাত্র, কোন উপকার পাইবে না। সন্ন্যাস অর্থে সম্যকরূপে ত্যাগ। যাহারা নির্ব্বাণ মুক্তিলাভের বাঞ্ছা করেন, সন্ন্যাস কেবল তাহাদিগের পক্ষেই আশ্রয়নীয়;—তাঁহাদিগের পক্ষেই সন্ন্যাস যথার্থ সশরীরে মোক্ষসুখ ভোগকরা। নতুবা অন্যের পক্ষে তাহা কেবল কষ্টের কারণ মাত্র।

অনধিকারীর সন্ন্যাস গ্রহণে ব্যভিচার হয়।

বিশেষতঃ সন্ন্যাসের অধিকারী না হইয়া যাহারা সংসার-কার্য্যসমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে বহির্গত হয়, তাহাদিগকে ভ্রষ্টাচারী ব্যতীত আর কিছুই বলিতে পারা যায় না। অতএব যাহাদিগের সন্ন্যাসের অধিকার না জন্মিয়াছে, তাহারা যেন কদাচ উহা গ্রহণ না করেন। কারণ, তদ্দ্বারা তাহাদিগের উভয় দিকই নষ্ট হইবে; কেবল শ্রমমাত্র সার হইবে। পূর্ব্বকালে যাহারা অধিকারী না হইয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিত, সমাজ তাহাদিগকে তজ্জন্য দণ্ডভাগী করিতেন। এক্ষণে সমাজ স্বেচ্ছাচারী, তাই যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই করিয়া যাইতেছে। ইহাতে সে নিজে ত প্রতারিত হইতেছে, উপরন্তু অন্যকেও ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিতেছে।

সন্ন্যাসআশ্রমের শ্রেষ্ঠতা ও অধিকার নির্ব্বাচন।

অতএব যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে যখন অক্ষমতাপ্রযুক্ত ক্রিয়ামাত্র হইতে বিরত হইবে এবং যখন অধ্যাত্মবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা জন্মিবে, তখনই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণকরা কর্ত্তব্য। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থোক্ত "আশ্রমনামহং তুর্য্যো" অর্থাৎ—আমি আশ্রমের মধ্যে সন্ন্যাস, এই ভগবদ্বাক্য দ্বারা এবং গীতায় "অনিকেতঃ" শব্দ দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট সন্ন্যাসীপ্রিয় বলিয়া, যে আশ্রম বা আশ্রমীর

মহত্ত্ব বিঘোষিত করিয়াছেন, যাহার দ্বারা সেই পবিত্র সন্ন্যাসধর্ম্মে কলঙ্ক-কালিমা অর্পিত হয়, তাহারা দেশের—দশের—সমাজের ঘোর শত্রু। অতএব উপযুক্ত অধিকার লাভকরিয়া সন্ন্যাসাশ্রমে প্রবেশ করিবে। ফল পক্ক হইলে আপনা হইতেই বৃক্ষচ্যুত হয়, কিন্তু বলপূর্ব্বক পাতিত করিলে না পাকিতেই পচিয়া যায়, কিম্বা পাকিলেও তেমন সুমিষ্ট হয় না। তদ্রূপ সাধনার পরিপক্কাবস্থায় আপনা হইতেই সংসার-বন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়, নতুবা যাহারা বল-পূর্ব্বক সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করে, তাহারা বিড়ম্বনাভোগ ব্যতীত কখন সুফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে না। অতএব সন্ন্যাসাশ্রমের অধিকারী হইয়া তবে সংসারধর্ম্ম ত্যাগ করিবে।

স্ত্রী-পুত্রাদি আশ্রিত পরিবারবর্গকে পরিত্যাগপূর্ব্বক গৃহ হইতে পলায়ন করার নাম সন্ন্যাস নহে, গৈরিকবসন পরিধান, দণ্ড-কমণ্ডলু ধারণ ও মস্তক মুণ্ডন করিলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। মহাত্মা কবীর বলিতেন;—

মুড় মুড়ায়ে জটা রাখায়ে মস্ত ফিরে য্যায়সা ভেঁষা।
খলরি উপর খাক্ লাগায়ে মন য্যায়সা তো ত্যায়সা॥

অর্থাৎ—মস্তক মুণ্ডন করিলে কি হইবে, জটা রাখিলেই বা কি হইবে, আর গাত্রো-বেশ ভূষায় সন্ন্যাসী পরি ভস্ম লেপন করিলেই বা হওয়া যায় না। কি হইবে?—মনোজয়-পূর্ব্বক তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে না পারিলে এই সকল বেশভূষা কি কার্য্য-কারক? যাহার আত্মানুভূতি নাই, মনস্থিরতা নাই, ভগবদ্ভক্তি-রসের উচ্ছ্বাস নাই, সে রঙ্গিন বসন পরিয়া, কৌপীন ও কমণ্ডলু ধারণ-পূর্ব্বক জটাজুট বাড়াইয়া ভস্ম মাখিয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকিলে কি হইবে? সেরূপ সাজা-সন্ন্যাসী যাত্রা-সম্প্রদায়েও দৃষ্ট হইয়া থাকে।* আবার কেবল ফলাহারে, জলাহারে, স্বল্পাহারে বা অনাহারে মুক্তিভাগী সন্ন্যাসী হওয়া যায় না; তাহা হইলে পশু, পক্ষী, জলচর বা পন্নগগণ মুক্তিলাভ করিতে পারিত। যথাঃ—

বায়ুপর্ণ কণাতোয় ব্রতিনো মোক্ষভাগিনঃ।
সন্তি চেৎ পন্নগা মুক্তাঃ পশুপক্ষিজলেচরাঃ॥
মহানির্ব্বাণতন্ত্র।

তবে সন্ন্যাস কি?—সং=সম্যক্ প্রকারে+ন্যাস=ত্যাগ, অর্থাৎ—সম্পূর্ণরূপে ত্যাগের নাম সন্ন্যাস। এই সন্ন্যাসতত্ত্ব অতি দুর্ব্বিজ্ঞেয়, সহজে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না।

প্রকৃত সন্ন্যাস কাহাকে বলে।

কাম্যকর্ম্ম ত্যাগের নাম সন্ন্যাস ইহাই সাধারণ মত। কারণ কাম্যকর্ম্মের ফলজনকতা প্রযুক্ত তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক। কাম্যকর্ম্মের ফলকামনা পরিত্যাগ ও তৎসহ কাম্যকর্ম্মের পরিবর্জ্জনকরার নাম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ফলাশা আদৌ করিবেন না। কামক্রোধাদি ত্যাগ যেমন একান্ত কর্ত্তব্য, কেহ কেহ সমস্ত কর্ম্মকেই সেইরূপ ত্যাগ করিতে পরামর্শ দিয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ বলেন যজ্ঞ, দান ও তপোরূপ কর্ম্ম কোনক্রমেই পরিত্যাগ করিতে নাই,

---

* এসকল বেশ ভূষা ও নিয়ম সংযমাদির যে সন্ন্যাসে প্রয়োজন নাই, আমি এমন কথা বলিতেছি না। প্রকৃত ঔষধের সঙ্গে অনুপান সেবনই ব্যবস্থা: আবার অনুপান ছাড়া ঔষধে কতকটা ফল লাভ হয়; কিন্তু ঔষধ পরিত্যাগ করিয়া কেবল অনুপান সেবন করিলে কি হইবে? সেইরূপ প্রকৃত ত্যাগ-বৈরাগ্য ব্যতীত বেশ-ভূষা ধারণও অনর্থক।

কেন না এতদ্বারা চিত্ত পরিশুদ্ধ হইয়া থাকে। তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে কর্ম্মানুষ্ঠান-ত্যাগ ও কর্ম্মফলত্যাগ, এই দুইত্যাগের তারতম্য জিজ্ঞাসা করিলে পর, শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—হে পার্থ! যজ্ঞ, দানাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান-কালে কর্তৃত্বাভিমান ও স্বর্গাদির ফলকামনা ত্যাগই আমার মতে শ্রেষ্ঠ। কাম্যকর্ম্ম বন্ধনের হেতু বলিয়া মুমুক্ষুগণ তাহা ত্যাগ করিবেন বটে, কিন্তু নির্দ্দোষ নিত্যকর্ম্ম কোনমতেই ত্যজ্য নহে। নিত্যকর্ম্ম বেদবিহিত, পরমার্থ-লাভের হেতু—ধর্ম্মসাধনের হেতু—ধর্ম্ম সাধনের পরমানুকূল ও অবশ্যানুষ্ঠেয়; না বুঝিয়া বা হঠকারিতাবশতঃ যাহারা ইহা ত্যাগ করে; তাহারা তমোগুণী—কাপুরুষ ও জড়। অতএব—

কাম্যানাং কর্ম্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

কাম্যকর্ম্মের ত্যাগকেই পণ্ডিতগণ সন্ন্যাস বলিয়া থাকেন। দেহসত্ত্বে মনুষ্যসকল কর্ম্ম কোনমতেই পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না। যিনি কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান করিয়াও কর্ম্মফল ত্যাগ করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনিষ্ট, ইষ্ট ও মিশ্র অর্থাৎ—পাপ পুণ্যরূপ কর্ম্মফলরাশি অত্যাগীকে দেহান্তে আশ্রয় করিয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিদিগকে ইহা কদাচ স্পর্শও করিতে পারে না।

সাত্ত্বিক, রাজস ও তামস ভেদে ত্যাগ ত্রিবিধ। ফলেচ্ছা পরিত্যাগকরিয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠানকরা সাত্ত্বিকত্যাগ, ফল কামনাসত্ত্বে যে কর্ম্মের ত্যাগ, তাহা রাজস এবং ফলেচ্ছাসহ কর্ম্মানুষ্ঠান ত্যাগের নাম তামস ত্যাগ। কর্ম্ম ক্লেশসাধ্য ও নিষ্ফল বলিয়া ত্যাগকরা রাজস ত্যাগের বিভিন্নতা। ও ভ্রান্তিপূর্ব্বক কর্ম্মত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়াছে।

সুতরাং সন্ন্যাসীর পক্ষে সাত্ত্বিকত্যাগ অবশ্য কর্ত্তব্য। এইসকল গুণময় ত্যাগ ব্যতীত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় "ত্রৈগুণ্য বিষয়াবেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন" বলিয়া যে ত্যাগ বা সন্ন্যাসের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নির্গুণাত্মক। এই গুণাতীত সন্ন্যাসই মুমুক্ষু-গণের অবলম্বনীয়। কর্ম্মফলত্যাগরূপ সাত্ত্বিক সন্ন্যাসেও নিত্যকর্ম্মের কর্ত্তব্যবুদ্ধি বর্ত্তমান রহিয়াছে। আবার কর্ত্তব্যবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে না পারিলে সন্ন্যাসাশ্রমে অধিকার হয় না বলিয়া শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে এই দুই বিরুদ্ধমতের সামঞ্জস্য এই যে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত না হইয়া উপস্থিত কর্ম্মসকল ফলাভিসন্ধি পরিত্যাগপূর্ব্বক করিয়া যাওয়ার নাম নির্গুণত্যাগ। পদ্মপত্র যেমন জলমধ্য থাকিয়াও জলে লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ যাঁহারা কর্ত্তব্যবুদ্ধিশূন্য হইয়া স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মসকল যথাযথভাবে সম্পন্ন করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্ম বা কর্ম্মফলে জড়িত হয়েন না। এইরূপ ত্যাগের নামই গুণাতীত ত্যাগ,—ইহাই প্রকৃত সন্ন্যাস। এই ত্যাগ-সন্ন্যাসের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন;—

"সর্ব্বলোকেষ্বপি ত্যাগ সন্ন্যাসী মম দুর্লভঃ॥"

ত্যাগ-সন্ন্যাসী সকললোকের, এমন কি আমারও দুর্লভ। কর্ম্ম সম্বন্ধীয় ত্যাগের ইহাই সুন্দর মীমাংসা। কর্ম্মত্যাগ ব্যতীত বিষয়ভোগত্যাগও সন্ন্যাসীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

কিন্তু তাহাও গুণাতীত হওয়া প্রয়োজন। শাস্ত্রবিধি না মানিয়া কঠোর তপস্যায় দেহ নষ্টকরাকে তামসত্যাগ, সমাজে খ্যাতি-প্রতিপত্তি আশায় ফল মূলাহারে তপস্বী হওয়ার নাম রাজসত্যাগ, এবং চিত্ত-

প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণ।

শুদ্ধির জন্য যে বিধিবিহিত সংযম তাহাই সাত্বিকত্যাগ। কিন্তু এই সকল ত্যাগ গুণময় বিধায় সন্ন্যাসীর অবলম্বনীয় নহে। সন্ন্যাসের ত্যাগ নিগু‍র্ণাত্মক। প্রলুব্ধ না হইয়া অনাসক্তভাবে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্বস্ব বিষয় ভোগকরার নাম, গুণাতীত ত্যাগ। নতুবা লেংটি পরিয়া বা লেংটা হইয়া বৃক্ষতলে বসিয়া থাকার নাম ত্যাগ নহে। লেংটিতে আসক্তি আর গরদে বিরক্তি, কুটিরে আসক্তি আর কোঠায় বিরক্তি, শাকে আসক্তি আর মিষ্টান্নে বিরক্তি, কম্বলে আসক্তি আর গদিতে বিরক্তি নিগু‍র্ণ-

প্রকৃত ত্যাগীর লক্ষণ।

ত্যাগের লক্ষণ নহে। অসক্ত বা বিরক্তভাব পরিত্যাগ-পূর্ব্বক স্ব স্ব ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাযোগ্য বিষয়ভোগ করাকেই গুণাতীত ত্যাগ বলে। এইরূপ নিগু‍র্ণত্যাগীই প্রকৃত সন্ন্যাসী। যথাঃ—

> সমন্নে বা কদন্নে বা লোষ্ট্রে বা কাঞ্চনেঽপি বা।
> সমবুদ্ধির্যস্য শশ্বৎ স সন্ন্যাসী চ কীর্ত্তিতঃ॥

যাঁহার উত্তমান্ন ও নিকৃষ্টান্নে এবং মৃত্তিকা ও কাঞ্চনে সমান বুদ্ধি জন্মিয়াছে, তিনিই সন্ন্যাসী বলিয়া কীর্ত্তিত। তবে ত্যাগের অর্থ কি?—শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন;—

> ত্যাগোঽপি কিমস্তিঃ আসক্তি পরিহারঃ।
>
> মণিরত্নমালা।

আসক্তি পরিত্যাগের নামই ত্যাগ। জ্ঞানগরিষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠ বশিষ্টদেবও বলিয়াছেন;—

> যত্ত্যক্তং মনসা তাবৎ তত্ত্যক্তং বিদ্ধি রাঘবঃ।
> মনসা সংপরিত্যজ্য সেব্যমানঃ সুখাবহঃ॥
>
> যোগবাশিষ্ট।

যাহা মন হইতে ত্যাগ করা যায়, তাহাই প্রকৃত ত্যাগ, বাহিরের ত্যাগ মাত্র প্রশস্ত নহে। মন হইতে বিষয় পরিত্যাগ করিয়া—সংকল্প বিকল্প বর্জ্জিত হইয়া সুখী হও। অতএব যিনি মন হইতে ভোগ্য বিষয়ের আসক্তি ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী। অনেকে আপনার সকল বস্তুই পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু আপনাকে কেহ সহজে ত্যাগ করিতে পারে না। সুতরাং সর্ব্বোত্তম সন্ন্যাসী তিনিই, যিনি সমস্ত কামনা পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে শরণাগত ও ভক্তবশংবদ হইয়া আপনাকেও পরমেশ্বরের চরণে সমর্পণ করিয়াছেন। যখন তোমার "তুমিত্ব" ব্রহ্মস্বরূপে কিম্বা ভগবানের সত্বায় ডুবিয়া যাইবে;—যখন তোমার নিজ অস্তিত্বের কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা থাকিবে না; তখনই তুমি ত্যাগী—তখনই তুমি বৈরাগী—তখনই তুমি প্রকৃত সন্ন্যাসী।

এতাবতা যতদূর আলোচিত হইল, তাহাতে প্রমাণিত হইল যে, যিনি কর্ত্তব্যবুদ্ধিশূন্য হইয়া উপস্থিত কর্ম্মসকল করিয়া যান এবং নির্লোভ হইয়া অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ করিয়া থাকেন, তিনিই নিগু‍র্ণত্যাগী। সম্যক্‌রূপে এই প্রকার ত্যাগের নামই প্রকৃত সন্ন্যাস। ভগবান্ নিগু‍র্ণ—গুণের অভাব নহে, গুণের অতীত অবস্থা মাত্র; অর্থাৎ—তিনি গুণে লিপ্ত না হইয়া গুণের দ্বারা কার্য্য করিয়া থাকেন। তদ্রূপ সন্ন্যাসীর ত্যাগ

নির্গুণাত্মক,—তাহারাও গুণে লিপ্ত না হইয়া গুণের কর্ম্ম করিয়া যান; তাহাতে বিরক্ত বা আসক্ত নহেন। এইরূপ ন্যাস প্রকৃত সন্ন্যাস পদবাচ্য। গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া মুমুক্ষুও তবে সন্ন্যাসী হইতে পারেন; গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়াও তাই জনক, অম্বরিশ প্রভৃতি সন্ন্যাসী হওয়া যায়। গৃহিগণ সন্ন্যাসী পদবাচ্য। আর যাহারা কৌপীন-করঙ্গের মায়া ছাড়াইতে পারে না, তাহারা সন্ন্যাসাশ্রমী হইলেও গৃহস্থাধম। আবার যে কোন আশ্রমী হইয়া নির্লিপ্ত-ভাবে সংসারে থাকিতে পারিলে, তিনিই সন্ন্যাসী এবং মুক্তিলাভের অধিকারী। নির্লিপ্ত গৃহী এবং প্রকৃত সন্ন্যাসী একাসনে অবস্থিত; তাঁহাদের মধ্যে ব্যাবহারিকভাবে পার্থক্য থাকিলেও পারমার্থিকভাবে কোন বিভিন্নতা নাই। আমরা পুরাণের

হরি-হর মূর্ত্তি

হইতে এতত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছি। এখানে হর শব্দে শ্মশানবাসী শিব এবং হরি শব্দে বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণুকে বুঝিতে হইবে। হিন্দুমাত্রেই অবগত আছে যে, হরি-হর অভিন্ন; যে মূঢ় তাঁহাদের ভেদ কল্পনা করে সে নারকী। যথাঃ—

গঙ্গাদুর্গা হরীশানং ভেদকৃন্নারকী তথা॥

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ।

হরি ও ঈশানে ভেদবুদ্ধি করিলে নিরয়-গামী হইতে হয়। সুতরাং তাঁহারা উভয়ে যে এক, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহ্যতঃ আকাশ পাতাল ভেদ দৃষ্ট হয়। একজন সর্ব্বস্বত্যাগী শ্মশানবাসী, খর্পরমাত্র সম্বল—বিরূপবেশে ভ্রমণ করিতেছেন; কাজেই হর ত্যাগী—বৈরাগী—সন্ন্যাসী। অপর একজন মণি-মুক্তাখচিত ও নৃত্যগীতপূরিত বৈকুণ্ঠবিহারী, পার্শ্বে—অতুল্যা সুন্দরী, কাজেই হরি—ভোগী, বিলাসী,—গৃহবাসী। স্থূলতঃ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য দৃষ্ট হইলেও মূলতঃ কোন বিভিন্নতা নাই। শিব সন্ন্যাসী সত্য! কিন্তু দেখিয়াছ কি,

হরিহর-মূর্ত্তির সমন্বয়

উঁহার কোলে কে?—বিশ্ব-বিমোহিনী রমণী, উনি কে?-উনি জীবজগৎরূপা বিশ্ব-রূপিনী প্রকৃতি। শিব সন্ন্যাসী হইয়া আমিত্ব ও আমিত্বের সঙ্কীর্ণ গণ্ডী ভাঙ্গিয়াছেন বটে, কিন্তু জগৎসংসারকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়াছেন; পরার্থে স্বার্থ পদদলিত করিয়াছেন,—তাঁহার নিজের বলিতে কিছু নাই বটে, কিন্তু তিনি প্রত্যেক ভূতের হিত সাধনের রত, তাই ভূতনাথ নামে পরিচিত। তাহাহইলে শিব সন্ন্যাসী হইয়াও সংসারে লিপ্ত। আর আমরা হরিকে গোকুলবিহারী-রূপে দেখিয়াছি যে, তিনি গোকুলে গোপ-গোপীর প্রেমে মাতোয়ারা—রাধাপ্রেমে যেন বিহ্বল। রাধার সামান্য হেলাতে রাধাকুণ্ডে প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত। সকলেই জানিত শ্রীকৃষ্ণের রাধাগত জীবন;—রাধার ক্ষণকালের বিরহে বুঝি তিনি বাঁচিতেন না। কিন্তু কৈ?—যেমন অক্রূর আসিয়া মথুরার সংবাদ বিজ্ঞাপিত করিলেন, অমনি শ্রীকৃষ্ণ মথুরা রওনা হইলেন, রাধার নিকট বিদায় লইয়া যাওয়াও আবশ্যক বোধ করিলেন না। শ্রীকৃষ্ণের মথুরাগমন সংবাদ পাইয়া সঙ্গিনিগণ সহ রঙ্গিনী রাই আসিয়া পথিমধ্যে রথচক্রের নীচে বুকদিয়া পড়িয়া বলিলেন, "আমাদের হৃদয় রথচক্রে নিষ্পেষিত করিয়া মথুরায় গমন কর।"

শ্রীকৃষ্ণ সেই প্রেমোন্মাদিনী গোপরমণীর মর্ম্মভেদী কাতরতায় ভ্রুক্ষেপ না করিয়া মথুরা চলিয়া গেলেন। রাম অবতারে পতিপ্রাণা জানকীকে বিনা অপরাধে কেবল রাজার কর্ত্তব্যে বনে দিলেন। তাহা হইলে তিনি যতই স্ত্রী-পুত্র বিষয়-বিভবের মধ্যে থাকুন না কেন, কখন স্ত্রী-পুত্রের আঁচল ধরিয়া কর্ত্তব্যে অবহেলা করেন নাই; আত্মসুখে অন্ধ হইয়া তিনি জীবের দুঃখ বিস্মৃত হন নাই; কাজেই হরি গৃহী হইলেও নির্লিপ্ত। তবেই হর সন্ন্যাসী হইয়াও লিপ্ত আর হরি গৃহী হইয়াও নির্লিপ্ত, আবার লিপ্ত সন্ন্যাসী ও নির্লিপ্ত গৃহী একই কথা—সুতরাং হরি-হর অভেদ। এ দিকে আবার গৃহীর আদর্শ হরি, এবং সন্ন্যাসীর আদর্শ

হরি-হরের আদর্শে হর। অতএব যে গৃহী গঠিতজীবন ব্যক্তি- হরির আদর্শে এবং যে মাত্রেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিয়াছেন;

তাহারা উভয়েই সমান,—তাঁহাদিগের মধ্যে বিভিন্নতা নাই। বরং হরির আদর্শে গঠিত-জীবন গৃহস্থ—যে সন্ন্যাসী হরের আদর্শে জীবন গঠন করিতে পারেন নাই, তাঁহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর হরের আদর্শে গঠিত-জীবন সন্ন্যাসী সর্ব্বপ্রকারে গৃহস্থাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; একথা বলাই বাহুল্য। তাই সে-কালের ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়গণ ব্রহ্মবিদ্যায় সমান পারদর্শী হইয়াও বিলাসী রাজাগণ ত্যাগী ব্রাহ্মণগণের নিকট জোড়হস্ত ছিলেন। তাই জনকরাজা অনেক ব্রাহ্মণের শিক্ষাদাতা গুরু হইয়াও তাহাদের নিকট শিষ্যের ন্যায় অবস্থান করিতেন। আর হরি-হর অভিন্নাত্মা হইয়াও সন্ন্যাসী হরই জগদ্‌গুরু পদবাচ্য হইয়াছেন।

অতএব গৃহস্থ কিম্বা সন্ন্যাসী হউন, যিনি আত্মস্বরূপে অবস্থানকরতঃ নির্লিপ্তভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান এবং অনাসক্তভাবে বিষয় ভোগ-করিয়াও জগতের হিতানুষ্ঠানে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। এই প্রকার গৃহস্থ ও সন্ন্যাসীতে কোনই পার্থক্য নাই। তাই গৃহী ব্যাসদেব এবং সন্ন্যাসী শঙ্করাচার্য্য, একই আসন প্রাপ্ত হইয়াছেন। সুতরাং অশনে কিম্বা বসনে, সংযমে কিম্বা স্বেচ্ছাচারে, কৌপীনে কিম্বা কন্থায়, দণ্ড কিম্বা কমণ্ডলে, ছাই-মাটী কিম্বা ত্রিপুণ্ড্র-তিলকে অথবা দেশে দেশে ভেসে বেড়াইলে সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। আবার বলি যেন স্মরণ থাকে,—যে কোন আশ্রমভুক্ত হউক না কেন, যিনি আমিত্বের সঙ্কীর্ণগণ্ডী বিশ্বময় প্রসারিতপূর্ব্বক সমবুদ্ধি ও সমদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া জগতের মঙ্গল সার সঙ্কল্প করিয়াছেন,—যিনি পরকে অমৃত বিলাইয়া নিজের জন্য কালকূট সঞ্চিত করিতে এবং পরের গলায় মণিহার জড়াইয়া আপন কণ্ঠে ফণীহার দোলাইয়া আনন্দে গালবাদ্য করিয়া নৃত্য করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত সন্ন্যাসী। আর এইরূপ সন্ন্যাসীর নিকট জগৎ গললগ্নী কৃতবাসে প্রণত হয়।

যাঁহার জ্ঞান-ভক্তির মন্দাকিনী আমিত্ব-রূপ গোমুখীর মুখ বিদীর্ণ করিয়া, সংসার-রূপ হর জটার জটিল বর্ত্ম পার হইয়া পৃথিবী প্লাবিত করতঃ বহিয়া যায়, যাহার উচ্ছ্বসিত-বেগে নাস্তিক-পাষণ্ডরূপী মত্ত ঐরাবতও তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইতে বাধ্য-

হয়, সেই সন্ন্যাসের ত্যাগমন্ত্র সমুদ্ভূত পুণ্যময় আনন্দপ্রবাহে আপনাকে ভাসাইয়া দিয়া আত্মহারাবৎ চালিত হইতে পারিলেই, তাহার জীবন সার্থক হইল। এইরূপ মানবজীবন সার্থক করিবার জন্য হিন্দু-শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুইটী পথ নির্দ্দিষ্ট আছে; একটী জ্ঞান পথ,—অপরটী ভক্তিপথ।

জ্ঞান ও ভক্তি এই দুইপথেই মুক্তি লাভহয়।

যাহারা জ্ঞানকে জ্ঞানপথ এবং ভক্তিকে ভক্তিপথ বলিয়া মনে করে, তাহারা সমধিক ভ্রান্ত। জ্ঞানপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সম্মিলনে যাইতে হয় এবং ভক্তিপথেও কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়ে গমন করিতে হয়। সুতরাং উভয় পথেই গমনের উপায় একই প্রকার, কিন্তু পথের বিভিন্নতা আছে। জ্ঞানমার্গের নাম বিশ্লেষণ-পথ আর ভক্তিমার্গের নাম সংশ্লেষণপথ। কার্য্য ধরিয়া কারণে যাওয়ার নাম বিশ্লেষণ-বিচার আর কারণ লাভ করিয়া কার্য্য-রহস্য অবগত হওয়ার নাম সংশ্লেষণ-বিচার। যাহারা জড়জগৎ ধরিয়া "নেতি" "নেতি" করিতে করিতে স্থূল সূক্ষ্ম অতিক্রমপূর্ব্বক ব্রহ্মানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন, তাঁহারাই জ্ঞানমার্গী আর যাঁহারা ব্রহ্মকে জ্ঞাত হইয়া এই জীবজগৎ তাঁহারই বিকাশ মনেকরতঃ লীলানন্দে বিশ্রাম লাভ করেন তাঁহারাই ভক্তিমার্গী।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য আবির্ভূত হইয়া সচ্চিদানন্দ ভগবানের যে স্বরূপলক্ষণ সাধারণের নিকট ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন; তাহার উদার-গর্ভে সর্ব্বাধিকারী জনগণ বিশ্রামলাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। মানব এক নূতন চক্ষু লাভকরিয়া জড়জগতের সুস্থূল যবনিকার অন্তরালে দৃষ্টি করতঃ মরজগতে অমরত্ব লাভে ধন্য হইয়াছে কিন্তু আচার্য্যদেব যে উপায়ে ব্রহ্মস্বরূপ লাভ করিবার পন্থা প্রকটিত করিয়াছেন, তাহা বিশ্লেষণ পথ—জ্ঞানমার্গ। আর ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব তাহা লাভ করিবার যে উপায় প্রচার করিয়াছেন, তাহা সংশ্লেষণপথ—ভক্তিমার্গ। তাই শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানাবতার এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তাবতার নামে অভিহিত হন। (ক্রমশঃ।)

শঙ্করাচার্য্য জ্ঞানপথের এবং গৌরাঙ্গদেব ভক্তিপথের প্রচারক।

———:0:———

ভুল-সংশোধন—মাঘ মাসের "আর্য্য-দর্পণে" ২৩৪ পৃষ্ঠায় ২য় কলমে ৪র্থ ছত্রে "রাজা রামকৃষ্ণের ভাই" স্থলে "রাজা রামকৃষ্ণের বড় ভাই" ও ২৩৮ পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে "সাধু রামদাস বাউলের পরিচয়" পাঠ না হইয়া ২৩৯ পৃষ্ঠার ২য় কলমের ১৪ ছত্রে "উত্তর পাইলাম না" শব্দের পর অন্য প্যারার উপরিভাগে হইবে।

———:0:———

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ দে	১৲	শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার দে	৶
,, যামিনীকুমার দে	॥০	,, গৌরচন্দ্র দে	৶
,, বিপিনচন্দ্র রায়	।০	জনৈক ভদ্রলোক	১৲
,, মাণিকচন্দ্র দত্ত	॥০	শ্রীযুক্ত শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী	১৲
,, কামিনীকুমার দে	৷০	,, মহিমচন্দ্র চৌধুরি	॥০
,, ক্ষীরোদচন্দ্র দে	॥০	,, অতুলচন্দ্র দাস	।০

(ক্রমশঃ ।)

Regd. No. D. 65.

৫ম বর্ষ। চৈত্র। ১২শ সংখ্যা।

সন ১৩১৯ সাল।

আর্য্য-দর্পণ

(ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।)

——:0:——

শান্তি—আশ্রমের

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতন হইতে শ্রীকুমার স্বরূপানন্দ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সূচী।

(প্রবন্ধগুলির মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নহেন।)

যোরহাট,

দর্পণ-প্রেসে শ্রীটুনিরাম শর্ম্মা দ্বারা মুদ্রিত।

শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুলসহ ২৲ টাকা। } { প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ।০ আনা।

---:0:---

শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথ-নিকেতনের চাঁদা প্রাপ্তি স্বীকার।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রেঙ্গুণ হইতে	
শ্রীযুক্ত মথুরানাথ দেব	॥০
,, বসন্তকুমার দেব	॥০
,, অনঙ্গমোহন দাস	॥০
,, ধনঞ্জয় চৌধুরি	॥০
,, জগদীশচন্দ্র দত্ত	॥০
শ্রীযুক্ত কুরনচন্দ্র দালাল	॥০
,, কামিনীকুমার দাস	॥০
,, ঈশানচন্দ্র পাল	॥০
,, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ	।০
,, বীরেন্দ্রকিশোর দেব	॥০
,, রামচন্দ্র ধর	১৲

ওঁ তৎসৎ

আর্য্য-দর্পণ।

ধর্ম্ম-বিষয়ক-মাসিক-পত্রিকা।

৫ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা।	চৈত্র।	বঙ্গাব্দ ১৩১৯। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬।

মুক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তল্লাভোপায়।

(১১শ সংখ্যার ২৫৭ পৃষ্ঠা হইতে ২৬৪ পৃষ্ঠায় পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর।)

জ্ঞানী বা ভক্তকে জ্ঞানমার্গের বা ভক্তিমার্গের লোক বলে না। জ্ঞানমার্গেও ভক্ত ও জ্ঞানী এবং ভক্তি মার্গেও জ্ঞানী ও ভক্ত, এই উভয় শ্রেণীর লোক বিদ্যমান রহিয়াছে। কিন্তু অল্পবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং সাম্প্রদায়িক গোঁড়া ব্যক্তিসকল এ অধ্যাত্ম-সত্য অবগত না হইয়া স্ব স্ব বিদ্বেষবুদ্ধি-বশতঃ চালিত হইয়া অনর্থক কোলাহল করিয়া থাকে। জ্ঞানপথ বড় কি ভক্তিপথ বড় এই বিচার করিতে গিয়া কেবল বাজে বাক্‌বিতণ্ডা লইয়া কালাতিপাত করে। যত মত তত পথ; রুচি ও প্রবৃত্তি অনুসারে যাহার যে পথে অধিকার জন্মিয়াছে, তাহাকে সেই পথেই চলিতে হইবে। মুর্শিদাবাদের নবাব ও বর্দ্ধমানের মহারাজা, এই দুই জনের মধ্যে কে বড়, তাহা বিচার করিতে যাইয়া সময় নষ্ট করিলে পরপিণ্ডভোজী ভিখারীর ক্ষুধা নিবৃত্তি হইবে কি? এই সকল বাজে তর্ক ছাড়িয়া ভিক্ষায় বাহির হওয়া যেমন ভিক্ষুকের কর্ত্তব্য; তদ্রূপ ধর্ম্মের ছোট বড় না বাছিয়া সর্ব্বথা আপন আপন অধিকারানুরূপ ধর্ম্মকার্য্য করিয়া যাওয়াই বুদ্ধিমানের কার্য্য। নদীতীরস্থিত গ্রামবাসী যেমন নদীর ঘাটে গমন করিবার জন্য আপন আপন বাসস্থান হইতে সুবিধা-মুরূপ রাস্তা প্রস্তত করিয়া লয়, তদ্রূপ মানবও জন্মান্তরের সঞ্চিত গুণকর্ম্মে যে যেরূপ অধিকার লাভকরিয়া অগ্রসর হইয়াছে; তাহাকে এবার সেইস্থান হইতে গমন করিতে হইবে। অন্যের গম্যপথ তাহার পক্ষে

বাদ-বিতণ্ডা না করিয়া অধিকারানুসারে যে কোন পথাশ্রয় করাই কর্ত্তব্য।

ভয়াবহ; সুতরাং পরের পথ লইয়া সাধকের আন্দোলন—আলোচনা বিড়ম্বনা মাত্র। অবতার লইয়া যাহারা ছোট বড় বিচার করিতে যায়, তাহারা ধর্ম্মদ্রোহী নারকী মাত্র। একটী অবতারকে চিনিতে পারিলে কোন অবতারের রহস্যই অজ্ঞাত থাকে না। খৃষ্টান অবতার-বাদ বুঝে না, তাই শঙ্কর বা গৌরাঙ্গের মহত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া তাঁহাদের অযথা নিন্দা করিয়া থাকে। আবার যে হিন্দু-সাধক অবতারতত্ত্ব বুঝিয়াছে, সে মহম্মদ বা যীশুকেও ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে সম্মান দান করিয়া থাকে। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি অস্মদ্দেশের লোকের ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যকে বুঝিবার কোন সময়েই সুযোগ হয় নাই; তবে গৌরাঙ্গদেবের এই দেশেই লীলাভূমি,—কাজেই অধিকাংশ লোক তদীয় ভক্ত। কিন্তু তাহারা সংস্কারবশে গৌরভক্ত হইয়াছে মাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে অতি অল্পলোকই তাঁহার মহিমা জ্ঞাত আছে। তাঁহারা গোঁড়ামীর চশ্‌মায় চক্ষু আবৃত করিয়া একের প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিতে অন্যের নিন্দা প্রচার করিয়া থাকে। পরের ধর্ম্মনিন্দায় নিজ ধর্ম্মের গৌরবহানি হয়, এই সোজা কথা যে সকল ব্যক্তি বুঝিতে পারে না, ভগবানের কৃপাব্যতীত তাহাদের গত্যন্তর নাই।

অবতার কথাটাই প্রেমে মাখা।

এক অবতার দয়াল; কিন্তু কোন্ অবতার দয়াল নহে? একই ভগবান্ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে জীবের অভাব পূরণার্থ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। অবতার কথাটাই যে দয়ায় মাখা, জীবের প্রতি দয়া না হইলে তিনি স্বরূপ ছাড়িয়া জীবভাব অবলম্বন করিবেন কেন? আর কোন্ অবতার অপ্রেমিক আমরা তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। যিনি রাজৈশ্বর্য্য, পতিব্রতা স্ত্রী ও শিশুপুত্র পরিত্যাগ করিয়া জীবদুঃখ মোচনের জন্য যৌবনে সন্ন্যাসী হইলেন, সে বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি বিম্বিসার রাজার নিকট নিজের অমূল্য জীব-নের বিনিময়ে কতকগুলা ছাগলের প্রাণভিক্ষা চাহিয়াছিলেন, সেই বুদ্ধদেব কি অপ্রেমিক? যিনি ক্রুশে বিদ্ধ হইয়া অত্যাচারী ব্যক্তিবর্গের জন্য দয়াভিক্ষা করিয়াছিলেন, সেই যীশু কি অপ্রেমিক? আর শঙ্করাচার্য্য ত প্রেমের বীজ বপন করিয়া গিয়াছেন। পাপী পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ চণ্ডাল কিম্বা কীট পতঙ্গকে সমবুদ্ধিতে ভাল-বাসিতে যাওয়া কি সোজা কথা? ধরে বেধে কি পীরিত হয়? কিন্তু আমি আমাকে ভাল-বাসি ইহা বুদ্ধি খরচ করিয়া বুঝিতে হয় না। আবার আকীট ব্রহ্মপর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ সেই আমিত্বেরই বিকাশ; ইহাই শঙ্করমতের মূল-মন্ত্র। সুতরাং আমিত্বের স্বরূপ উপলব্ধি হইলে আত্মপ্রীতি বিশ্বপ্রেমে পরিণত হইবে। অনেকে মনে করে শঙ্করাচার্য্য ভক্তিতত্ত্ব জ্ঞাত ছিলেন না। যিনি বিবেক-চূড়ামণিগ্রন্থে মুক্তি-সাধনের যতপ্রকার উপায় আছে, তন্মধ্যে "ভক্তিরেব গরিয়সী" বলিয়া ভক্তির প্রাধান্য প্রমাণ করিয়াছেন, তিনি ভক্তিতত্ত্ব বুঝিতেন না বলিলে নিজেরই মূর্খতা ও নির্লজ্জতা প্রকাশ পায়।

আবার আর একশ্রেণীর দেশদ্রোহী, ভগবান্ গৌরাঙ্গদেবকে শচীপিসির বেটা মনে করিয়া মুন্সিয়ানা চালে

গৌরাঙ্গদেব বাঙ্গালীর নাসিকাটি কুঞ্চিত করিয়া

জাতীয়সম্পত্তি ও থাকে। অথচ পাশ্চাত্য জাতীয়গৌরব এবং ধর্ম্মজগতের প্রধান পণ্ডিত ধার্ম্মিক মাত্রের আদর্শ। মোক্ষমুলার বলিয়াছেন, "যে দেশে গৌরাঙ্গের ন্যায় মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, সে দেশ এবং সে জাতি কখন হীন নহে, তাহা হইলে তাহাদিগের দেশে এমন মহাপুরুষের জন্ম হইত না"। যাহার আবির্ভাবে পতিত দেশের ও পতিত জাতির কলঙ্ক ঘুচিয়া গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাঁহাকে হৃদয়ের ভক্তি শ্রদ্ধা অর্পণ করিলে ম্লেচ্ছদাসত্ব-উপজীবী জীবের ঘৃণ্য-জীবনের উপায় হইবে কি? এমন দিন কবে হইবে, যেদিন দেখিব প্রত্যেক বাঙ্গালী ভক্তিবিনম্রহৃদয়ে গৌরাঙ্গ-পদে প্রাণের প্রেম-পুষ্পাঞ্জলী প্রদান করিতেছে। গৌরাঙ্গদেব যে আমাদের জাতীয়সম্পত্তি;—ঘরের ধন। বাঙ্গালী না যতদিন গৌরাঙ্গদেবের আদর শিখিতেছে; ততদিন তাহাদের জাতীয় উন্নতি সুদূরপরাহত। ওরে আজিও যে পাঁচ-শত বৎসর হয় নাই; এখনও বাঙ্গালার অনেক পল্লীর ধূলিতে তাঁহার পদধূলি মিশ্রিত রহিয়াছে; বাঙ্গালার রজে লুটাইলেও বুঝি তাহার করুণা প্রাপ্ত হইতে পারিবে।

ভগবানেরই অবতার হইয়া থাকে, সুতরাং অবতার মাত্রেই মূলতঃ এক। এক অবতার অন্য অবতারের মত বিনষ্ট করিয়া নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেন, ইহা ভ্রান্ত ধারণা। আমরা জানি এক অবতার কর্তৃক অন্য অবতারের মত পরিণতি ও পরিপুষ্টি লাভ করিয়া থাকে। তবে সমাজের সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য পরবর্ত্তী

অবতারগণের সমন্বয়।

অবতার পূর্ব্ববর্ত্তী অবতারের মতগুলির নিন্দা করিয়া নূতন সংস্কারে সংস্কৃত করিয়া দেন। তাই বুদ্ধদেবকে কামনামূলক কর্ম্মের অসারতা প্রতিপন্ন করিতে সময়ে সময়ে বেদের নিন্দা করিতে হইয়াছে। আবার ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের তিরোধানের বহুপর হিন্দুসমাজ কেবল জ্ঞানের শুষ্ক কথায় ভরিয়া গেল, আত্ম-সমাধি, আত্মজ্ঞানের পরিবর্ত্তে কেবল বিরাট্ তর্কজাল বিস্তার করিয়া মুখে ব্রহ্মবিৎ এবং কার্য্যে নাস্তিকতা ও ভোগলোলুপতাপ্রযুক্ত হিন্দুগণ যখন উন্মার্গগামী হইয়া পড়িল, তখনই ভগবান্ গৌরাঙ্গদেব আবির্ভূত হইয়া সংশ্লেষণপথ অর্থাৎ ভক্তিমার্গের দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়া দিলেন। অহংবুদ্ধিবিশিষ্ট সোঽহং-জ্ঞানীর সংস্কার নষ্ট করিবার জন্য আত্মানাত্ম-বিচার রূপ বিশ্লেষণপথের অর্থাৎ জ্ঞানমার্গের নিন্দাবাদও তজ্জন্য তাঁহাকে প্রচার করিতে হইয়াছিল। দেশের লোক কি ভুলিয়া গিয়াছে গৌরাঙ্গদেব, শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত সন্ন্যাস-ধর্ম্মাশ্রিত ভারতী-সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমৎ কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাস গ্রহণান্তর বিশ্লেষণপথে যাইয়া আত্মজ্ঞান লাভকরতঃ তিনি সংশ্লেষণপথ অবলম্বনপূর্ব্বক সেইপথেই হিন্দুসমাজকে পরিচালিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। অনেক নিকট ভক্ত গৌরাঙ্গদেবের মহত্ত্ব প্রচার করিতে গিয়া বলিয়া থাকে যে মহামহোপাধ্যায় বাসুদেব সার্ব্বভৌম এবং সন্ন্যাসীর নেতা শ্রীমৎ প্রকাশানন্দ সরস্বতী তাঁহার নিকট বিচারে পরাস্ত হইয়া তদীয় মত গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা সাধক মাত্র, আর গৌরাঙ্গদেব অবতার; সাধক বুঝিতে পারিলে বিনা বিচারে অবতারের চরণে লুণ্ঠিত

হইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে গৌরাঙ্গদেবের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে উপস্থাপিত করিলে তাঁহার আর মহত্ব কি? বরং গৌরবের হানি হইয়া থাকে। এইসকল লোকের দ্বারা সমাজের মঙ্গল দূরে থাক, হিংসা-দ্বেষ বৃদ্ধি হইয়া সমাজের সমধিক অমঙ্গলই সাধিত হয়।

বিশ্লেষণ অর্থাৎ—জ্ঞানপথের সাধকগণ ব্রহ্মসত্তায় নিমগ্ন হইয়া যান, লীলানন্দ ভোগ করিতে পারেন না; আবার সংশ্লেষণ-পথের লোক লীলানন্দে ডুবিয়া স্বরূপানন্দে বঞ্চিত হয়েন। কিন্তু যিনি বিশ্লেষণপথে গমন করিয়া সংশ্লেষণপথে ফিরিয়া আসেন, তিনিই সচ্চিদানন্দ সমুদ্রে ডুবিয়া আত্মস্বরূপে লীলানন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। একমাত্র তাহার জীবনই সম্পূর্ণ। যাহারা কেবল লীলানন্দে মাতিয়া যান, তাহারা নিত্যানন্দের আস্বাদ না পাইয়া নিত্যাবস্থা কঠোর ও শুষ্ক জ্ঞানে বিরক্ততা প্রকাশ করেন, আবার যাঁহারা কেবল নিত্যানন্দে মাতোয়ারা, তাঁহারা অনিত্য জ্ঞানে লীলানন্দে অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা জানি ভগবান্ যেমন নিত্য অর্থাৎ অনাদি ও অনন্ত, ভগবানের লীলাও তদ্রূপ অনাদি ও অনন্ত। সুতরাং নিত্য ও লীলা, ভগবানের এই উভয়ভাব যুগপৎ যিনি উপলব্ধি করিয়াছেন, তিনি ব্রহ্মবিৎ—তিনিই প্রেমিক শিরোমণি। ভক্তিমার্গ জ্ঞান ও মার্গের মধ্যে একটি পথ অবলম্বন করিলে পূর্ণ সচ্চিদানন্দ উপলব্ধি হয় না।

জ্ঞান ও ভক্তি মার্গের সমন্বয়ই জীবনের পূর্ণত্বসাধনের উপায়।

উভয়মার্গাবলম্বনে অর্থাৎ জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয়-মার্গে গমন না করিলে পূর্ণানন্দের অধিকারী হওয়া যায় না; এবং হৃদয়ের সংকীর্ণতা দূর হইয়া সার্ব্বভৌম উদারতা জন্মে না। কাজেই তাঁহারা সাম্প্রদায়িক গণ্ডী ছাড়াইতে না পারিয়া হিংসা-দ্বেষে ধর্ম্মজগৎ কলুষিত করিয়া থাকে। আর যাঁহার হৃদয়ে জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইয়াছে তাঁহার নিকট কোন গোল নাই, কোন বিদ্বেষ নাই, তিনি সকল সম্প্রদায়ে মিশিয়া, সকল রসে রসিয়া, এবং সকলের নিকট বসিয়া সর্ব্বপ্রকার আনন্দ লাভ করিয়া থাকেন। হনুমান্, প্রহ্লাদ, শুকদেব, জনক প্রভৃতি মহাত্মারা জ্ঞান-ভক্তির মিলনে কৃতকৃতার্থ হইয়াছিলেন। রামপ্রসাদ, তুলসীদাস, গুরু নানক প্রভৃতি মহাপুরুষগণও জ্ঞান-ভক্তির মিলনানন্দের আস্বাদ পাইয়াছেন। শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলনেই জ্ঞান-ভক্তির সমন্বয়। আমরা—

ভগবান্ রামকৃষ্ণ

পরমহংসদেবের জীবনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের অপূর্ব মিলন দেখিয়াছি। "অদ্বৈত জ্ঞান আঁচলে বেধে যা খুসী তাই কর" এই বলিয়া তিনি এক নিশ্বাসে ধর্ম্ম জগতের যাবতীয় গোল মিটাইয়া দিয়াছেন। কেননা বিশ্লেষণ অর্থাৎ জ্ঞানপথে অদ্বৈততত্ত্ব লাভ করিলে, যে কোন সংশ্লেষণ অর্থাৎ ভক্তিপথ অবলম্বন করা যাইতে পারে। কারণ জ্ঞানলাভ হইলে সাধক বুঝিতে পারে যে একই অদ্বৈত-তত্ত্ব অনন্ত আধারে অনন্ত রূপে অনন্ত ভাবে প্রকাশিত হইতেছে। সুতরাং তখন সমস্ত ভেদভাব বিদূরীত হয়—হিংসা বিদ্বেষ পলায়ন করে। আর একস্থানে পরমহংসদেব বলিয়াছেন, জ্ঞানিরা নেতি নেতি করিয়া সিঁড়িগুলি অতিক্রমপূর্ব্বক ছাদে উঠিয়া যান;

ধর্ম্ম-সমন্বয়ের আদর্শ রামকৃষ্ণ।

কিন্তু ছাদে যাইয়া দেখেন যে, ছাদও যে চূণ সুরকি ইটের সমষ্টি, সিঁড়িগুলিও তাহাই। রামকৃষ্ণ সর্ব্বসাম্প্রদায়িক ধর্ম্মের ভাব স্বতন্ত্র রাখিয়া তাহাদের ঔৎপত্তিক কারণ একস্থানে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। তিনি খৃষ্টান, মুসলমান, হিন্দুর শাক্ত-বৈষ্ণববাদী, কাহারও ভাব নষ্ট করিয়া দেন নাই, সর্ব্ব ধর্ম্ম সত্য জানাইয়া নৈষ্ঠিকভাবে আপনাপন সাম্প্রদায়িক ভাব সাধন করিতে উপদেশ করিয়াছিলেন। সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয় বলিলে একথা বুঝিও না যে সব ভাব ভাঙ্গিয়া চুরিয়া এক করিয়া দেওয়া। স্ত্রীজাতি এক হইলেও ভগ্নী ভাবে মাতার ভাব বুঝা যায় না। আবার ভগ্নীতে স্ত্রীভাবে উপলব্ধি করিতে যাইলে ভগ্নীভাব বিকৃত হয়। সেইরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের উপাস্য একবস্তু হইলেও ভাবের তারতম্য থাকা প্রযুক্ত, সেই সেই ভাব শিক্ষা দ্বারা সাধন করিলে তবে সেই ভাব প্রস্ফুটিত হইতে পারে। বৌদ্ধভাবে কি আর গোপীভাব উপলব্ধি করা যায়? আমার সাধন পথটী একমাত্র সত্য, অন্যগুলি ভ্রান্ত, এই ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া সকলের নিন্দা না করিয়া, সতী নারীর ন্যায় আপন ভাবে বিভোর হইয়া থাক। যে যেরূপে উপাসনা করে, তাহার মনোরথ সেইরূপে সিদ্ধ হয়। রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন,—"ভাব বহু কিন্তু মূলে এক, সর্ব্ব-সাম্প্রদায়িক ভাব নৈষ্ঠিকভাবে সাধন করিলে একই সত্যে উপস্থিত করে।" নৈষ্ঠিকভাব ও গোঁড়ামি এক কথা নহে। আপন ভাবে সতীর ন্যায় সাধনা কর, কিন্তু কাহারও ভাবের নিন্দা করিও না। স্থূলে বিভিন্নতা নিশ্চিত হইলেও মূলে এক; ইহাই সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়। ইহাই শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের পূর্ণ মিলনাদর্শ। ভগবান্ রামকৃষ্ণদেবের আদর্শ বর্ত্তমান ধর্ম্মবিপ্লব-কালে নিতান্ত প্রয়োজন, এই সত্য সকলের প্রাণে প্রাণে অঙ্কিত না হইলে আমাদের আর মঙ্গল নাই। শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই পূর্ণ সত্য—প্রকৃত ধর্ম্ম। সুতরাং সাধক মাত্রেই সযত্নে হৃদয়মন্দিরে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে একাসনে স্থাপন কর। আমরা কাহারও হৃদয়ে একাসনে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গকে দেখিলেই, বিনা পরিচয়ে তাঁহাকে রামকৃষ্ণ-ভক্ত বলিয়া বুঝিতে পারিব। গৌরাঙ্গের মধ্যে শঙ্করকে এবং রামকৃষ্ণের মধ্যে গৌরাঙ্গ ও শঙ্করকে একাসনে না দেখিতে পাইলে, তাঁহাদিগকে অবতার বলিতে জগৎ কুণ্ঠিত হইত। আমরা কবে দেখিব—এমন দিন কবে হইবে যে, প্রত্যেক সাধকের হৃদয়ে ওতপ্রোতভাবে শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ বিরাজ করিতেছেন।

শঙ্কর ও গৌরাঙ্গের মিলনেই ধর্ম্মের পূর্ণতা ও সামঞ্জস্য হইবে।

শঙ্কর ও গৌরাঙ্গ অর্থাৎ—জ্ঞান-ভক্তির মিলন হইলেই ধর্ম্মজগতের যাবতীয় হিংসা-দ্বেষ—দ্বন্দ্বকোলাহল দূরীভূত হইয়া শান্তির—প্রেমের অমিয়ধারা প্রবাহিত হইবে। তাঁহাদের অঙ্কে সাধারণ লোকও নির্ব্বিবাদে স্থানলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য ও গৌরাঙ্গদেবের মিলন হইলে, জগতের যাবতীয় ভেদভাব দূরীকৃত হইয়া প্রেমের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে।

—:0:—

(ক্রমশঃ।)

প্রেমিক।

আমার হৃদয় তোমার কথায়,
থাকে সদা ভরপুর।
তোমার আশীষ ঝরিলে আনন্দে,
শোক দুঃখ হয় দূর।
আমার বুকে তোমার বুক,
আমার মুখে তোমার মুখ,
আমার সুখে তোমার সুখ,
সদাই রয়েছে লেগে।
আমার প্রাণে তোমার প্রাণ,
কথায় মোর তোমার গান;—
আমার ওষ্ঠে অধর দান,
করিয়া রয়েছ জেগে।
অবশ দেহ পরশে তব,
ভুলেছি আমি বিশ্বের সব,
গাইছে সদা তোমারি রব,
মুগধ গানের সুর।
আমার হৃদয় তোমার কথায়,
থাকে সদা ভরপুর।

শ্রীপীযুষকিরণ চক্রবর্ত্তী।

—:0:—

ভক্তিমার্গের আলোচনা।

প্রেমভক্তি লাভকরতঃ স্ব স্বরূপে বর্ত্তমান থাকিয়া ভগবানের লীলারস মাধুর্য্য আস্বাদন করাই জীবের চরম সাধ্য; সুতরাং সার্ব্বভৌম ধর্ম্ম। সাধনার দ্বারা পর পর ধর্ম্মে উন্নীত হইতে হয়। সাধনার তিনটী উপায়—কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি। এই তিনটী উপায় ওতপ্রোতঃসম্বন্ধে জড়িত—একসূত্রে গাথা; ইহার কোনটী ছাড়িলে ধর্ম্মের পূর্ণ সাধনা হইতে পারে না। যেমন মৎস্য দুই পার্শ্বের দুইটী পাখ্‌না ও একটী পুচ্ছ দ্বারা জলমধ্যে অনায়াসে সন্তরণ করিয়া বেড়ায়, কিন্তু একটীর অভাবে, অন্য দুইটী অঙ্গও বিকল হইয়া পড়ে,—কাজেই আর সুখে সাঁতার দিতে পারে না; তদ্রূপ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে জীব, ধর্ম্মরাজ্যে অক্লেশে ভ্রমন করিতে পারিবে, কিন্তু ইহার একটীর অভাবে, অন্যগুলিও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িবে—কাজেই জীব মোহান্ধকারে নিমগ্ন হয়। বর্ত্তমানে হিন্দুসমাজে এই দুর্দ্দশা উপস্থিত হইয়াছে। অনেকেই হিন্দুধর্ম্মরূপ কল্পপাদপের আশ্রয় ছাড়িয়া পরছায়া অবলম্বন করিয়াছে; কাজেই কল্পতরুর ফললাভ ঘটিয়া উঠিতেছে না। তাই, একধর্ম্মাশ্রিত হইয়াও আজি জ্ঞানবাদী, কর্ম্মবাদী ও ভক্তিবাদী পরস্পর বিদ্বেষ কোলাহলে ধর্ম্ম জগতে ভীষণ গণ্ডগোল উঠাইয়াছে। সম্প্রদায়ান্ধগণ অনর্থক জ্ঞান, ভক্তি ও যোগ লইয়া বিবাদ করেন। বস্তুতঃ ঐ তিনই এক। অন্য বিষয় ত্যাগ করিয়া পরমাত্মাকেই সদা বোধগম্য রাখা প্রকৃত জ্ঞানের লক্ষণ, আর, অনুরাগের বস্তুতে নিয়ত চিত্ত থাকা ভক্তির লক্ষণ। এই উভয়কেই যোগশাস্ত্রে চিত্তসমাধান অর্থাৎ সমাধি বলে। সুতরাং অভীষ্ট বস্তুতে অনন্যচিত্ততা ভক্তি, যোগ ও জ্ঞান এই তিনেই আছে। যাহারা কিছু স্থূলবুদ্ধি—দার্শনিকতত্ত্ব পরিপাক করিতে পারে না এবং সংযমে অশক্ত, অথচ হৃদয়ের আবেগসম্পন্ন, তাহারাই ভক্ত্যাভিমানী হয়।

তাদৃশ স্থূলবুদ্ধি ব্যক্তিগণও যাহাদের হৃদয়াবেগ কম, কিন্তু শারীরিক সংযম অধিক, তাহারাই যোগাভিমানী হয়। আর যাহাদের হৃদয়াবেগ ও শারীরিক সংযমের অভাব, কিন্তু দার্শনিকবিষয় আয়ত্ব করিবার ক্ষমতা আছে, তাহারা জ্ঞানাভিমানী হয়। ইহারা সকলেই অধম অধিকারী। বস্তুতঃ লম্ফঝম্ফ করা, বা শারীরিক সংযম করা, কিম্বা কেবল শাস্ত্রোপদেশ ও বক্তৃতা করা, প্রকৃত ভক্ত, বা যোগী, কিম্বা জ্ঞানীর লক্ষণ নহে। সদ্বিষয়ে তীব্র আবেগ, পূর্ণ শরীর-সংযম ও সম্যক্ প্রভা, এই তিন না থাকিলে কেহ ভক্ত, যোগী বা জ্ঞানী কিছুই হইতে পারে না—কোন মার্গেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না।

এক সময় এতদ্দেশে কর্ম্মযোগের প্রাধান্য ছিল; কিন্তু জ্ঞান ও ভক্তির অভাবে তাহা পুনঃ পুনঃ সকামে পরিণত হয়, তাই বুদ্ধদেব কর্ম্মের সম্প্রসারণ করিয়া জ্ঞানযোগ প্রচার করেন। কিন্তু তাহাও ঈশ্বর সম্বন্ধে নীরবতাপ্রযুক্ত নাস্তিকতা ও জড়ত্বে পরিণত হয়। তাই শঙ্করাচার্য্য বৌদ্ধধর্ম্মের জড়ত্ব ঘুচাইয়া জ্ঞানের সম্প্রসারণপূর্ব্বক স্বীয় সার্ব্বভৌম জ্ঞানবাদে বিলীন করেন। কিন্তু তাহাও শিক্ষা ও মায়াবাদের কঠোরতায় পরিণত হইলে, চৈতন্যদেব আবির্ভূত হইয়া, তাহার সহিত প্রেমভক্তি মিলাইয়া, হিন্দুধর্ম্ম মধুর করিয়াছেন। সুতরাং ধর্ম্মপিপাসু সাধকগণ কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিযোগের আশ্রয়ে সাধনা করিয়া মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠিত করিবেন।

চৈতন্যদেব শেষ অবতার; সুতরাং চৈতন্যোক্ত প্রেমভক্তিলাভই সাধ্যাবধি অর্থাৎ চরম ধর্ম্ম। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সাহায্যে প্রেমভক্তিলাভই মানবের পরম পুরুষার্থ। আমরা নানা প্রবন্ধে সেই প্রেমভক্তি লাভেরই উপায় বিবৃত করিয়া আসিয়াছি। তবে ভক্তির অধিকারী ও স্তরভেদে তাহার সাধনা ও সাধ্যফল পৃথক পৃথক ভাবে লিখিত হইলেও সুধীব্যক্তিগণ তাহাহইতে সাধ্য প্রেমভক্তিলাভের উপায় স্বরূপ এক সার্ব্বভৌম সাধনপন্থাই দেখিতে পাইবেন। আরও দেখিবেন যে, ঐ সাধন-পন্থার মধ্যে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির অপূর্ব্ব সমাবেশ রহিয়াছে। আধুনিক বৈষ্ণবগণ "কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড, সকলই বিষের ভাণ্ড" বলিয়া মুন্সিয়ানা চালে বিজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করিলেও, মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেবের পার্ষদ স্বরূপ শ্রীমৎ কবিরাজ গোস্বামী "স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়" বলিয়া কর্ম্মযোগেই ভক্তির ভিত্তি স্থাপন করিয়াছেন। একদা মহাপ্রভু চৈতন্যদেব রায় রামানন্দকে অতুল সম্মান প্রদান করিয়া, শিক্ষার্থী শিষ্যের ন্যায় প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—রামানন্দ ভাবকণ্টকিতগাত্রে আত্মবিস্মৃত ও বিহ্বল হইয়া দেবাবিষ্টের ন্যায় উত্তর করিয়াছিলেন। সেই প্রশ্নোত্তর হইতে আমরা, আমাদের প্রতিপাদ্য বিষয়টীর মীমাংসা করিব। যথাঃ—

প্রভু কহে কহ মোরে সাধ্যের নির্ণয়।
রায় কহে স্বধর্ম্মাচরণে কৃষ্ণভক্তি হয়॥
এহ বাহ্য প্রভু কহে আগে কহ আর।
রায় কহে কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ সর্ব্ব সার॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে স্বধর্ম্মত্যাগ সর্ব্বসাধ্য সার॥

প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানমিশ্রাভক্তি সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহ বাহ্য আগে কহ আর।
রায় কহে জ্ঞানশূন্যাভক্তি সাধ্য সার॥
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে প্রেমভক্তি সর্ব্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহ হয় আগে কহ আর।
রায় কহে দাস্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহ হয় কিছু আগে আর।
রায় কহে সখ্যপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে বাৎসল্যপ্রেম সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এহোত্তম আগে কহ আর।
রায় কহে কান্তাপ্রেম সর্ব্ব সাধ্যসার॥
প্রভু কহে এই সাধ্যবিধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ কিছু আগে যদি হয়॥
রায় কহে রাধাপ্রেম সাধ্য শিরোমণি।
যাঁহার মহিমা সর্ব্ব শাস্ত্রেতে বাখানি॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।

অতএব প্রেমময়-স্বভাব লাভ করিয়া রাধাপ্রেমাস্বাদ করাই সাধ্য শিরোমণি অর্থাৎ চরম সাধ্য। সেই চরম সাধ্য, স্বধর্ম্মাচরণে আরম্ভ হইয়া ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্ম্ম, স্বধর্ম্মত্যাগ জ্ঞানমিশ্রাভক্তি, জ্ঞানশূন্যাভক্তি, প্রেমভক্তি, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, বাৎসল্যপ্রেম ও কান্তা-প্রেমে উত্তরোত্তর পরিপুষ্ট হইয়া রাধাপ্রেমে পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। সুতরাং ইহারা এক একটী স্বতন্ত্রসাধ্য ভক্তিপন্থা নহে; উহারা চরম সাধ্যে উপনীত হইবার ক্রমোন্নতি স্তর মাত্র। স্বধর্ম্মাচরণে আরম্ভ করিয়া এই স্তর-গুলির ভিতর দিয়া সাধন করিতে করিতে পরিশেষে রাধাপ্রেমের অধিকারী হইতে হইবে। ইহা আমাদের হাতগড়া কথা নহে,—প্রেমভক্তি-জগতের শ্রেষ্ঠ মহাজন কর্ত্তৃক ইহা প্রকটিত এবং রাগমার্গের রসিক ভক্ত কর্ত্তৃক কথিত। অতএব সাধকগণ নানা পন্থা ধরিয়া নানা শাস্ত্র খুঁজিয়া হয়রাণ না হইয়া, এই পন্থা অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ রাধাপ্রেমের অধি-কারী হইয়া সর্ব্বাভীষ্টসিদ্ধি এবং নিত্য পূর্ণানন্দের অধিকারী হইবে, মরজগতে অমরত্ব লাভ এবং মানবজীবনের পূর্ণত্ব প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে। আমরা ধারাবাহিক-ভাবে একবার প্রেমভক্তি লাভের সার্ব্বভৌম পথটা আলোচনা করিয়া, এবিষয়ের উপসংহার করিব।

যাঁহারা হঠাৎ ভগবৎ-কৃপা লাভ করিয়া প্রেমভক্তির অধিকারী হইয়া কৃতার্থ হইয়া যান, তাঁহাদিগের কথা স্বতন্ত্র; সেরূপ ভাগ্য-বান্ জীব কয়জন আছেন, জানি না। সাধা-রণতঃ আমাদিগের ন্যায় জীবের, অন্ততঃ তাঁহার কৃপা আকর্ষণের জন্যও নানাবিধ উপায় অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। প্রথমতঃ ভক্তি-বীজ বপনের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে। এতদর্থে স্বধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা। মানবজীবন সংগঠন করিতে হইলে, প্রথমেই শিক্ষনীয় বিষয় Discipline অর্থাৎ শৃঙ্খলা। যে ব্যক্তি প্রথম হইতে কোন বিধিমার্গে চলে না,—তাহাতে ব্যভিচার আসিয়া উপস্থিত হয়, বিশৃঙ্খলার আবর্জ্জনা তাহার সারা জীবনে জড়াইয়া যায়,—উচ্ছৃঙ্খলে স্বেচ্ছাচারিতা আইসে, স্বেচ্ছাচারিতা মানুষকে ক্রমে ক্রমে অধোগতির পথে টানিয়া লয়। তাই স্বধর্ম্মাচরণই সাধ্য; কেন না স্বধর্ম্মাচরণ হইতে চিত্তশুদ্ধি হইয়া মানবের ভগবদ্ভক্তির উদয় হয়। যে, যে গুণে

জন্মিয়াছে, সেই গুণোচিত কার্য্যানুষ্ঠানের নামই স্বধর্ম্মাচরণ। স্বধর্ম্মাচরণে সাধকের গুণক্ষয় হইয়া জ্ঞানের বিকাশ হয়। কিন্তু কর্ম্মানুষ্ঠানে যেমন গুণক্ষয় হয়, তদ্রূপ আবার গুণসঞ্চয় হইয়া থাকে; তাই কর্ম্মানুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে "কর্ম্মফল" ভগবানে সমর্পণ করিবার ব্যবস্থা। এই নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়া, বিধিমার্গে চলিয়া অভিমানশূন্য ও তাহার চিত্তচাঞ্চল্য দূরীভূত হয়; কাজেই জ্ঞানের বিকাশ হইয়া থাকে। তখন তাহার জীবন বিধিময় এবং কর্ম্ম ভগবদর্পিত হওয়ায়, আর তাহার দ্বারা সমাজভঙ্গের আশঙ্কা নাই। এখন স্বতন্ত্র-তাই তাহার উন্নতি, আর তাহাকে বিধি-মার্গের গণ্ডীর ভিতর রাখা কর্ত্তব্য নহে। তাই তখন তাহার স্বধর্ম্মত্যাগই ধর্ম্ম। তখন বিশুদ্ধচিত্তে সাধক, শাস্ত্রাদি বিচার দ্বারা, নিত্যা-নিত্যবিবেক দ্বারা, জগতের সৃষ্টি কৌশল দ্বারা জ্ঞানালোচনা করিবে। এই জ্ঞান যখন ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য যাবতীয় বিষয় পরিত্যাগ করিয়া, ইহ-মূত্রার্থফলভোগে বিরাগ জন্মিয়া একমাত্র ভগবানকে আশ্রয় ও অবলম্বন করিবে, তখন ভগবানের প্রতি যে অনুরাগের বা আসক্তির সঞ্চার হয়, তাহাই জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি। প্রকৃত ভক্তির ইহাই প্রথম স্তর। এই ভক্তিতে স্তব-স্তুতি থাকে, প্রার্থনা-মিনতি থাকে, আরাধনা-উপাসনা সকলই থাকে। কাজেই ইহার নাম সাভক্তি। তখন ক্রমশঃ সাধকের চিত্ত ভগবানে একত্র হয়—ভক্তির কোলে আত্মসমর্পণ করিয়া, তাহার স্নিগ্ধ তনুস্পর্শে সংসার কোলাহল ভুলিয়া, যখন সমগ্র হৃদয়বৃত্তির সহিত সাধক তাহাতে মজে, তখন জ্ঞানের বন্ধন খুলিয়া যায়। জ্ঞানশূন্য হইলে ভক্তি তদ্গতা—স্বার্থচিন্তা থাকে না, বিচার থাকে না, উদ্দেশ্য থাকে না,—বোল আনাই তুমি। জ্ঞানশূন্যা বিশুদ্ধা ভক্তির সাধনায় ক্রমশঃ ভগবানের মহিমজ্ঞান দূরে যায়, অর্থৎ ভগবান্ সর্ব্বশক্তিমান, পাপ-পুণ্যের দণ্ডদাতা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান দূরীভূত হইয়া প্রেমের সঞ্চার হয়। তখন সে আমার প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ, মাত্র এই জ্ঞানে পুত্রের ন্যায়, ভৃত্যের ন্যায় প্রেম-পূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের সেবা করিতে বাসনা জন্মে। এইখানে রাগানুগাভক্তি প্রকৃত-পক্ষে ভাবভক্তিতে পর্য্যবসিত হইল। ভাবের মোহে বিভোর হইতে পারিলে ভগবান্ আপনার হয়েন,—নিকটে আসেন। সাধনায় দাস্যভাব পুষ্ট হইয়া দাস্যের সঙ্কোচ দূরে যায়, তখন ভগবানে প্রাণের প্রেম—সখীত্ব অর্পিত হয়। সখাপ্রেমের ক্ষীরধারায় ভগবান্ পরিতৃপ্তি লাভকরিয়া আনন্দিত ও প্রীত হয়েন। সখাভাবে ভক্ত ও ভগবান্ এক হইয়া যান। তখন ব্রজের রাখালবালকগণের ন্যায় অসঙ্কোচে ভগবানের সহিত খেলা,—কাঁদে চড়াচড়ি, একত্র শয়ন-ভোজন, নব পল্লবে ব্যজন, বনফুল মালায় বিভূষণ প্রভৃতি করিয়া ভক্ত বিভোর হইয়া যান। তাঁহার অভাবে চারিদিক শূন্য দেখেন। এই সখ্য-ভাব পরিপুষ্ট হইলে বাৎসল্যভাবের সঞ্চার হয়। তখন সাধক, ভগবান্‌কে নিজ অপেক্ষাও ক্ষুদ্র বোধ করিয়া থাকেন। ভক্ত নিজে পিতামাতা হইয়া, ভগবানকে শিশুপুত্রের ন্যায় আদর যত্ন করিয়া থাকেন। নিজের স্বার্থ ভুলিয়া—বাসনা কামনা বিসর্জ্জন দিয়া একমাত্র পুত্রের সেবাই জনক জননীর ধ্যান-

জান, পুত্রের নিকট পিতামাতা কিছুই চাহেন না; আপনা ভুলিয়া,— সর্ব্বস্ব দিয়া পুত্রের সুখ—স্বাস্থ্যের জন্য ব্যস্ত। এইরূপ ভাব ভগবানে জন্মিলে, তাহাকে বাৎসল্যভাব কহে। নন্দ যশোদার বাৎসল্যভক্তিতে ভগবান্ বালক সাজিয়া যশোদার স্তন্যপান ও নন্দের বাধা মাথায় বহন করিয়াছিলেন। বাৎসল্যভাবের পরিপাকদশায় যখন ভক্ত আত্মহারা হইয়া যান—তাঁহার সমস্ত দেহ-মন-বুদ্ধি ভগবানে সমর্পিত হইয়া যায়, তখনই কান্তাভাব বলা যায়। স্ত্রী যেমন স্বামীকে ভালবাসে, সেইরূপ প্রাণ দিয়া, জীবন যৌবন দেহভার সমর্পণ করিয়া ভগবান্কে ভালবাসিলে, তখন, তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাই সাধ্যের শেষ অবস্থা। ভাবভক্তির ইহাই উৎকৃষ্ট অবস্থা। * ভক্ত তখন সর্ব্বপ্রকার বেদবিহিত কর্ম্ম ও লোকধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিয়া কেবল প্রেম-কারুণ্য-কণ্ঠে গাহিয়া থাকেন;—

তপঃ জপ আর আহ্নিক পূজন,
মূলমন্ত্র আমার তুমি একজন,
তব নাম গান শ্রবণ কীর্ত্তন
সাধন ভজন আমার হে;—

গয়া গঙ্গা বারানসী বৃন্দাবন,
কোটী তীর্থ আমার ও রাঙ্গাচরণ,
তব সম্মিলনে এই সামান্য ভবন;
নন্দন কানন সমান আমার।

সতী যেমন পতি বিনা কিছু জানে না, ভগবানে সেইরূপ ভাব জন্মিলে তাহাকে কান্তাভাব বলা যায়। কিন্তু প্রেমিক-ঋষি প্রেম-ভক্তিতত্ত্বে শুধু. কান্তাপ্রেম দেখাইয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, স্বকীয়া কান্তা স্থলে পরকীয়া কান্তাভাব গ্রহণ করিয়াছেন। কেন না, পতিপত্নীর সম্বন্ধেও যেন একটু দূরভাব আছে। পত্নী, পতিকে খুব নিকটে দেখেন বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রভুভাবে দেখেন। কেবল যে ললনা লুকাইয়া অপর পুরুষের অনুরাগিণী হন, তাঁহার প্রেমে সে প্রভুতার দূরভাব নাই। তাই কান্তাপ্রেমে পরকীয়াভাবই গৃহীত হইয়াছে। যিনি এই মধুরভাবে ডুবিয়াছেন, তাঁহার আর বাহিরের ধর্ম্ম কর্ম্ম থাকে না। তিনি 'বেদবিধি ছাড়া'। তিনি প্রীতি-সুরাপানে মত্ত হইয়া লজ্জাভয় ত্যাগ করেন, জাতি-কুলের অভিমান চিরদিনের জন্য সাগরের অতল জলে নিক্ষেপ করেন। ব্রজগোপিগণের কামগন্ধহীনপ্রেম মধুররসের পরম আদর্শ। গোপিগণ শ্রীকৃষ্ণ বিরহে জর জর; কখনও কৃষ্ণকে "নির্দ্দয়" "কঠোর" বলিয়া সম্বোধন

* শ্রীমৎ নিগমানন্দ পরমহংস প্রণীত "ব্রহ্মচর্য্য-সাধন" নামধেয় পুস্তকের নিয়মানুসারে ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে চিত্তশুদ্ধি হইবে, তখন মনঃস্থির করিবার জন্য "যোগী-গুরু" পুস্তকের লিখিত আসন মুদ্রা প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যোগোক্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে এবং জ্ঞানী-গুরু পুস্তকের লিখিত জ্ঞানালোচনা করিবে। তৎপরে "যোগী-গুরু" বা "জ্ঞানী-গুরু" পুস্তকোক্ত সাধনায় সম্যক্‌ভাবে ব্রহ্মোপলব্ধি কিম্বা "তান্ত্রিক-গুরু" পুস্তকোক্ত স্থূল সাধনায় ভগবৎ-সাক্ষাৎকার করিবে। তদনন্তর "প্রেমিক গুরু" পুস্তকের লিখিত সাধনায় গোপিকানিষ্ঠ প্রেমময় স্বভাব লাভকরতঃ ভগবানের অসমোর্দ্ধ লীলারস মাধুর্য্যে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া যাইবে। সুতরাং তাঁহার পুস্তক কয় খানিতে সমগ্র হিন্দুশাস্ত্রের সার সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক কয় খানিতে পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকল অভাব পূর্ণ করিবে।

করিতেছেন; কখনও অভিমানে স্ফীত হইয়া "তাঁহার নাম লইব না" বলিয়া দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছেন; কিন্তু প্রাণের উচ্ছ্বাস থামাইয়া রাখিবার সাধ্য নাই, তাই আবার কখনও হৃদয়ের আবেগে সমস্ত ভুলিয়া "দেখা দাও" বলিয়া হাহাকার করিতেছেন। এ অবস্থায় বিরহে বিষের জ্বালা, মিলনে অনন্ত অতৃপ্তি। বিরহে বিষের জ্বালা হইলেও প্রাণের ভিতরে অমৃত ঝরিতে থাকে। এ সময়ের প্রাণের ভাব ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। তখন ভগবান্‌কে—হৃদয়বল্লভকে বুক চিরিয়া হৃদয়ের ভিতর পুরিয়া রাখিলেও পিয়াস মিটে না। ভগবানের সঙ্গে বুকে বুকে মুখে মুখে থাকিয়া ভক্ত, তদীয় সম্ভোগ সুধাপানে আত্মহারা হইয়া যান। তাঁহার বিশ্বময় ঈশ্বর-স্ফূর্ত্তি ও ঈশ্বরানুভব হইয়া থাকে—তিনি আপনার অস্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে প্রিয়তমের অস্তিত্বে নিমজ্জিত করিয়া ভগবত্তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এইরূপ ভক্তের সুখের ইয়ত্তা নাই, তিনি ধন্য, তাঁহার কুল ধন্য, তাঁহার অধিষ্ঠানভূমি ধন্য।

এই গোপিকানিষ্ঠ মধুরভাব ক্রমশঃ প্রেমবিলাস-বিবর্ত্তে পুষ্টহইয়া মহাভাবে পর্য্যবসিত হইয়া প্রৌঢ় দশায় প্রেমভক্তি আখ্যা প্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় ভক্ত নিরন্তর ভগবানের অনির্ব্বচনীয় প্রেমরসার্ণবে পরমানন্দে সন্তরণ করিয়া থাকেন। অনন্তর প্রেমময় স্বভাব লাভ করিয়া দেহান্তে রাধা-শ্যামের মহারাসের মহামঞ্চে মিলিয়া, তদীয় লীলারস মাধুর্য্যের আনন্দে অনন্তকালের জন্য নিমগ্ন হইয়া, এক হইয়া যান।

কস্যচিৎ-পরিব্রাজকস্য।

———:0:———

সাধক-সঙ্গীত

[১১]

কিসে যাবি সহস্রার।
স্বাহা স্বধা বষট্ বৌষট্ ফট্‌কার যোগে,
দারুণ ষটচক্র হতে নার্ব্বি পার॥
মূলাধার ভোগবতীপুরী প্রায়,
সাপিনী প্রহরী দ্বারে নিদ্রা যায়,
স্বাধিষ্ঠানে বাদী, অপার বারিধি,—নাহি তথা তরী কর্ণধার॥
(ও মন) যাবি কার সাহায্যে, মণিপুর রাজ্যে,
অগ্নিময় দুর্গ ভয়ঙ্কর;
নিদ্রা তৃষ্ণা ক্ষুধা ক্লান্তি আর আলস্য, পাঁচের ক্রিয়া তথা নিরন্তর;—
অনাহতপুরে বহে অস্থির বায়ু,

প্রতিক্ষণে তথা পরীক্ষা হয় আয়ু,
বিশুদ্ধ তার শেষ, শূন্যময় দেশ,
আধার আশ্রয় জ্যোতির নাই সঞ্চার।
(ও মন) আজ্ঞাচক্রের বামে, পিতৃযান নামে,
চন্দ্রলোক স্বর্গ কাশীর স্থান;
দক্ষিণে দেবযানে, সোঽহং-তত্ত্ব যানে,—
কে না জানে যোগী জনে যান;—
গোবিন্দ কয় মন, যাও যদি সেই পথে,
কর আরোহণ প্রণব পুষ্প রথে,
নইলে রে অজ্ঞান মিছে ধ্যান জ্ঞান,
মিছে যম জয়ের অহঙ্কার।

———:0:———

একখানা চিঠি।

স্নেহময়ী মা আমার,

আজ তোর চিঠিখানা পাইয়া কি আনন্দ যে পাইয়াছি তা' কেমন করে বুঝা'ব মা, লিখিবার মত ভাষা নাই, তা না হ'লে লিখিয়াই জানাইতাম। তোর অমৃতমাখা চিঠীখানা পড়িতে পড়িতে বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহার প্রতি ছত্রে ছত্রে—প্রতি অক্ষরে অক্ষরে অমৃতের ধারা ছুটিতেছে। তোর সুধামাখা চিঠীখানা পুনঃ পুনঃ পড়িলাম, যতই পড়িতে লাগিলাম ততই আমার স্নেহময়ী—প্রেমময়ী—আনন্দময়ী জননীর করুণা উপলব্ধি করিতে লাগিলাম। আমি আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলাম। মা! মা, বলনা মা, সত্যই কি আমি শিশুর মত গালভরা হাসিমুখে মধুর স্বরে মা, মা, ডাকিতে ডাকিতে তোদের কোলে ঝাপাইয়া পড়িতে পারিব? মাগো! আমার কি এমন দিন হবে, যেদিন শিশুর মত তোদের স্তন্য-পীযুষধারা পান করিয়া মর-জগতে অমরত্ব লাভকরতঃ নিজকে ধন্য মনে করিতে পারিব। মা, জগতে আমার আর কিছুই প্রার্থনীয় নাই, আমি চাই শুধু আমার আমার স্নেহময়ী—প্রেমময়ী—আনন্দময়ী জননীর করুণা! তা'হলেই আমি সব পা'ব মা! তোরা আমায় আশীর্ব্বাদ কর মা, আমি যেন শিশুর মত সরল—শিশুর মত মাতৃপ্রেমে আত্মহারা—শিশুর মত একমাত্র মায়েরই পক্ষপাতী হইতে পারি—শিশুর মত যেন শুধু মাকেই চিনি—মাকেই আমার বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি—শিশুর মত যেন মা ভিন্ন কিছুই বুঝি না। সরল শিশুর অমল মুখের বিমল হাসি কত সুন্দর—কত সুখদায়ক

মা। সে গালভরা মধুরহাসি দেখিলে কার না প্রাণ জুড়ায়?—কার না তাপিত প্রাণ শীতল হয়? সে দেবশিশুর গালভরা হাসিমুখে কার না চুমোখেতে সাধ যায়?—কার না সাধ যায় সে সরল শিশুকে বুকে তুলিয়া নিতে? তোর আশীর্ব্বাদ যেন সত্য হয়; আমি যেন শিশুর মত সরল হইতে পারি, আমা হইতে যেন কুটিলতা, কপটতা, সরিয়া যায়, আমি যেন নিখুত হইতে পারি; ঘৃণা লজ্জা, মান, অভিমান, কাম-ক্রোধ, ভয়মোহ সব যেন দূর হইয়া যায়। মা! তোরা আশীর্ব্বাদ কর, আমার বাসনা পূর্ণ হ'বে। মা, তোরাই ত আমার প্রেমময়ী—স্নেহময়ী—আনন্দময়ী মা! আমি যেন প্রত্যেক রমণীতে আমার আরাধ্যা জননীর বিকাশ দেখিতে পাই মা! তোদের সমষ্টি ভাবই ত আমার মায়ের রূপ সুতরাং তোদের ভিতর আমার প্রেমময়ী জননীর বিকাশ দেখিতে না পাইলে—না দেখিলে আর কোথায় পাইব—কোথায় দেখিব মা!

মা! আর ভুলাইস্‌না, এ যাবৎ কেবল ভুলই করিয়া আসিতেছিলাম; জীবনে মাতৃ-স্নেহ অনুভব করিবার সুযোগ পাই নাই, শৈশব হইতে ঘটনাস্রোতে মায়ের কোল হইতে দূরে পড়িয়াছি; কাজেই মাকে চিনি নাই—মাকে জানি নাই, কিম্বা জানিতে চেষ্টাও করি নাই। স্বভাবের দোষে—সংসর্গের দোষে মাকে ভুলিয়া কামিনী দেখিতেছিলাম—দেবীর সিংহাসনে দানবীকে বসাইতে ছিলাম, এমন সময় জানি না জন্মজন্মান্তরীন কোন পুণ্যের-ফলে—কোন মাহেন্দ্রক্ষণে অহেতুক-কৃপাসিন্ধু জগদ্গুরু গুরুবেশে দেখা দিলেন, শুভ-মুহূর্ত্তে—শুভলগ্নে মত্তমাতঙ্গের শিরে অঙ্কুশা-ঘাত পড়িল—প্রবল স্রোতের মুখে বাধা পড়িল, জীবন-প্রবাহের গতি ফিরিয়া গেল। জীবনের ভুল বুঝিতে পারিলাম—অমানিশার ঘন মেঘ কাটিয়া গেল—আকাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইয়া উঠিল—মধ্যাকাশে জীবনের ধ্রুবতারা দেখা দিল—জীবনের লক্ষ্য—জীবনের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিলাম। মায়ের স্নেহ-মাখা মুখখানি মানসমুকুরে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল—অল্প অল্প করিয়া সম্পূর্ণরূপে মায়ের কথা মনে পড়িল। মায়ের সাড়া পাইয়া একদিকে যেমন দানবীমূর্ত্তি অন্তর্হিতা হইতে লাগিল, অন্যদিকে তেমনি মা, ধীরে ধীরে হৃদয়-সিংহাসনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ধন্য গুরুদেবের অনন্তলীলা—ধন্য তাঁর অপার করুণা, তাঁরই কৃপায় আজ মাকে ডাকিতে আরম্ভ করিয়াছি। মায়ের কোল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া কোন রমণীকে মা বলিয়া ডাকি নাই, কিম্বা মা বলিয়া ডাকিতে সাধ হয় নাই। আজ শ্রীগুরুর কৃপায় মা ডাকের স্বাদ পাইয়াছি, তাই আকুলকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া ডাকিতেছি মা, মা, মা, মা, মা। এমনদিন আমার কবে হবে, যেদিন সতী হউক, অসতী হউক, সুরূপা হউক, আর কুরূপাই হউক আকুলকণ্ঠে ব্যাকুলপ্রাণে মা, মা, ডাকিয়া তাহা হইতে মায়ের মাতৃত্ব কড়ায় গণ্ডায় আদায় করিয়া নিতে পারি। আমার মা ত সর্ব্ব-ব্যাপিনী, তবে যেখানে—যেভাবে হউক না কেন—তাঁকে ডাকিলেই ত পাব মা! আমায় একবার তেমনতর ডাক শিখাইয়া দে না মা, যে ডাকে তোদেরে জন্মের মত বাঁধিয়া রাখিতে পারি। এ সংসারে জননীর আদর নাই, রমণীর আদর—মায়ের অঙ্গের আর

সে ভুবনমোহন জ্যোতি নাই—অধরে আর সে মধুর হাসি নাই—নয়নে আর সে স্নেহমাখা দৃষ্টি নাই—পরিধানে আর সে দিব্য বস্ত্র নাই—মায়ের সে দীর্ঘবেণী আলুলায়িতা, তৈলাভাবে রুক্ষা—দেহ জীর্ণ শীর্ণ, মলিনবেশ পরিহিতা—নয়নপল্লব অশ্রুভারাক্রান্তা—দৃষ্টি করুণ! মায়ের এ বেশ দেখিলে পাষাণ হৃদয়ও গলিয়া যায়—মনোদুঃখে পুত্রবৎসলা মা আমার আজ বন-বাসিনী—তাই বুঝি মায়ের সন্তান, নির্জ্জনে—গিরিগুহায়—নিবিড় অরণ্যে একাকী মায়ের সাধনা করিয়া থাকে।

মা! তুই ত আমাকে ছেলে বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিস্, কিন্তু বল দেখি মা! সাম্‌নাসাম্‌নিভাবে কি আমায় ছেলে ব'লে কোলে তুলিয়া নিতে পারিবি? মা! তখন ত লজ্জা আসিবে, সমাজের নিন্দা গঞ্জনা সহিতে হইবে। কাজ নাই মা কাছে আসিয়া—কাজ নাই মা কাছে গিয়া। হৃদয়ের ধন—গোপনের ধন গোপনেই থাক। তুই মা, আমি ছেলে, মায়ের কাছে ত ছেলের লজ্জা নাই মা! কাজেই আমি তোর কা'ছে লজ্জা করিব না। আমি কেবল আকুলকণ্ঠে মা, মা বলিয়া ডাকিব, ইচ্ছা হয় ত দেখা দিস্। তোরা আমার মা—আমি তোদের ছেলে,—একথা আমি জগৎকে জান্‌তে দিব না। আমি আমার আরাধ্যা প্রেমময়ী—স্নেহময়ী—আনন্দময়ী জননীর দেবীমূর্ত্তি গোপনে হৃদয়-রাসমন্দিরে মনোময় রত্নসিংহাসনে বসাইয়া মনের মত সাজাইয়া মানসফুলে মাকে পূজা করিব—সাধ মিটাইয়া মাকে একাকী দেখিব—কাহাকে দেখাব না—কি দেখিতে দিব না; কেন না মা যে আমার আদরের—বড় যতনের ধন। মা! মা! একবার দেখা দে মা! আমি যে শুধু জনমের সাধ তোকে একবার দেখ্‌তে চাই মা! আমার গণা দিন যে ফুরিয়ে এল, আয়ু-সূর্য্য যে অস্ত যায় মা! আর ত সময় নাই, কবে দেখা দিবি মা! আমার মনোময় মূর্ত্তিতে আয় মা! নয়নভরে একবার দেখে নিই মা! কই মা! এখনও এলি না; মা! মা! ওমা! তোর কানে কি আমার ডাক পঁহুছায় না? একবার চেয়ে দেখ মা! তোর ছেলে যে কাদাধূলা মেখে আছে মা! তাকে ধুয়ে পুছে একবার কোলে তোলে নে না মা। মা! মা! আর ত ডাক্‌তে পারি না মা। কণ্ঠ যে রোধ হয়ে এল মা! কণ্ঠরোধ না হলে দেখা দিবি না, তা ত বুঝেছি—শুধু মুখের ডাকে কিছু হবে না। তুই চাস্ প্রাণের-প্রাণের ডাক। তা শিখাইয়া দে না মা। আমি ত জানি না কেমন ক'রে তোকে ডাক্‌তে হয়। আমি শুধু অবোধ শিশুর মত উচ্চৈস্বরে আকুলকণ্ঠে ব্যাকুল-প্রাণে মা, মা বলিয়া ডাক্‌ব—মাথা খুড়্‌ব—চোখের জলে বুক ভাসাব—দেখ্‌ব দেখা না দিয়া পারিস্ কি না। মা! তোকে নিশ্চয়ই দেখা দিতে হ'বে—আমার মনোময়ী মূর্ত্তিতে তোকে অবশ্যই আস্‌তে হ'বে। এখনও দেখা দিবার সময় হয় নাই, তাই বুঝি মা আসিস্ না। আচ্ছা মা, আমি সময়ের অপেক্ষায় রহিলাম, কিন্তু তাই বলিয়া মা ডাকা আর ভুল্‌ব না; যাবৎ তোমাকে আমার মনোময়ী মূর্ত্তিতে না পাব তাবৎ কেবল আকুলকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া উচ্চৈস্বরে ডাক্‌ব—

মা! মা! মা! মা! মা!* আর মনের সাধে গাইব :—

এবার আমি যাব ছুটে মা' মা বলে মায়ের কোলে।
দেখ্‌ব এবার মা আমার করে কি না করে কোলে॥
বিষয় খেলানা দিয়ে, ভুলায়ে রেখেছে মোরে,
আমি খেলা করিতেছি, কাচ লয়ে মণি ফেলে।
যত কাঁদি মা, মা বলে, তত দেয় খেলানা তোলে,
মোহন খেলানা পেয়ে, আমি মাকে আছি ভুলে॥
এবার আমার ভুল ভেঙ্গেছে, খেলেনায় আর ভুল্‌ব না কো,
কাঁদব কেবল মা' মা বলে, যাবৎ কোলে না লয় তোলে।
খেলা না সবদূরে ফেলে, চেয়ে তাঁর মুখ পানে,
দুইহাতে মুঠা করে, ধরব জোরে তাঁর আঁচলে॥
মা' মা বলে উচ্চৈস্বরে, ভাস্‌ব আমি নয়ন জলে,
দেখ্‌ব এবার ছেলের দুঃখে মায়ের পরাণ কত গলে।
কাদ ধুলা মাখা গায়, ডাকিতেছি মাকে আমার,
জানি না তো সে কি আমায় ধুয়ে পুছে নিবে কোলে॥
শুনিয়াছি লোক মুখে, মা আমার করুণাময়ী—
মা' মা বলে কাঁদলে নাকি, ধুলা ঝেড়ে নেয় কোলে।
উমেশ তো সেই ভরসায় ডাকিতেছে মা' মা বলে,
যতদিন না আদর করে, মা তারে নেয় কোলে॥

———:0:———

উপদেশ-সংগ্রহ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিত অংশের পর)

১৩১। পরীক্ষায় যে উত্তীর্ণ হয় সে-ই বড়।

১৩২। সংসারে খাটিতে আসিয়াছ অনাসক্তভাবে খাটিয়া যাও, ইহাই পূর্ণত্বের লক্ষণ।

১৩৩। এ দেহ আমার নয়, পথে পাওয়া ধন; যত পার খাটাইয়া তাহার সদ্ব্যবহার কর, কি জানি কখন—যাহার জিনিস তিনি ফিরাইয়া নেন।

১৩৪। এবার যদি দেহকে খুব খাটাও তাহা হইলে সে আবার ভয়েই তোমার কাছে ঘেসিবে না—সুতরাং তুমিও মুক্ত হইবে।

১৩৫। তোমা হইতে যে নীচে অর্থাৎ পতিত তাহার বোঝা তোমার ঘাড়ে নিয়া তাহাকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া লও, তাহাকে পথ দেখাইয়া দেও, তবে না তোমার মহত্ব, তবে না তোমার উচ্চত্ব।

১৩৬। জীবের জীবত্ব স্বাভাবিক আর দেবত্ব অস্বাভাবিক, তাই জীবত্বের স্থানে দেবত্বের প্রতিষ্ঠা করা মানব জীবনের লক্ষ্য; সেইজন্যই ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম, ক্রোধ সহজেই আসে, আবার দয়া, ভক্তি, প্রেম ইত্যাদি জোর করিয়া আনিতে হয়।

১৩৭। দেহ, মন, প্রাণ পরের জন্য উৎসর্গ কর, আত্মসুখের জন্য যে যত্ন করে, সে স্বার্থপর; তাহার মুক্তির আশা সুদূরপরাহত।

১৩৮। ফল পাকিলে আপনা হইতেই বৃক্ষচ্যুত হয়, সেইরূপ সাধনার পরিপক্বাবস্থায়ও সহজে সংসারবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

১৩৯। চোরের সঙ্গে থাকিয়া চোর হওয়া যত সহজ সাধুসঙ্গ করিয়া সৎ হওয়া তত সহজ নহে! উপর হইতে নীচে নামা অতি সহজ, কিন্তু নীচ হইতে উপরে উঠিতে হইলে অনেক যোগাড়যন্ত্র কলকৌশল করিতে হয়, তবে উঠা যায়; নতুবা নহে।

১৪০। যাহা করিবে নীরবে করিয়া যাও, ঢাক ঢোল বাজাইও না; তাহাতে কাজ ত হবেই না, বরং শ্রম পণ্ড হইবে মাত্র। যে মেঘের গর্জ্জন বেশী তাহার বর্ষণ বড় কম, অনেক স্থলে বর্ষণই হয় না।

১৪১। দেবতায় কণ্টকক্ষেত্রেও মেঘ বর্ষণ করিয়া থাকেন।

১৪২। যদি দীননাথকে পেতে চাও, তবে দীনহীন কাঙ্গাল সাজ, নতুবা তাহাকে পাবার যো নাই; যে সম্পূর্ণরূপে তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিতে পারিয়াছে, সেই প্রকৃত দীনহীন, সুধু লেংটী পরিয়া ভিক্ষুক সাজিলে হবে না।

১৪৩। পরের দোষ দেখিতে পাইলে নিজের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিও তুমিও সেই দোষে দোষী কি না।

১৪৪। "আত্মতত্ব লাভ হ'ল না" "জীবনে কিছু হ'ল না" বলে চীৎকার কেন? বিশ্বাস ও ধৈর্য্যসহকারে এগিয়ে যাও, সময়ে আপনিই সব হবে; মধ্যরাত্রে সূর্য্য দেখিতে চাহিলে কি দেখা যায়? প্রভাতে আপনিই সূর্য্যের উদয় হইবে।

১৪৫। সাধুসঙ্গ জ্ঞানলাভের জন্য, যদি মায়া মোহেই আবদ্ধ রহিলে তবে সাধুসঙ্গে কি লাভ? তাই আত্মানুসন্ধান করিয়া দেখিও কতটুকু পাশ কাটিয়াছে।

১৪৬। গুরুকে একস্থানে সীমাবদ্ধ করিয়া রাখিও না, গুরু অখণ্ডমণ্ডলাকারে চরাচর ব্যাপ্ত; যখন সর্ব্বত্র গুরুর বিকাশ উপলব্ধি করিতে পারিবে, তখনই গুরুলাভ বা গুরু-দর্শন হইবে।

১৪৭। জীব-সেবাই প্রধান ধর্ম্ম, ইহা প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ।

১৪৮। "আমিত্ব"কে স্থূলদেহের সঙ্গে জড়াইও না, তাহা হইলে জড় হইয়া যাইবে। "আমিত্বে"র বিকাশ দেখিতে চাও ত স্থূলদেহ ভুলিয়া যাও।

১৪৯। চরিত্র সংশোধন হইতে পারে, কিন্তু স্বভাব পরিবর্ত্তন বড় কঠিন; কেন না স্বভাব স্ব-ভাব। ইহা জন্মান্তরের সংস্কারের ফল।

১৫০। কুকুরকে আদর কর, ঘাড়ে চড়িবে। দেহকে যত সুখ দিবে, ততই সে তোমাকে জুড়িয়া বসিবে—দেহ তোমার নয় হাতে পাইয়াছ, পরার্থে যত পার খাটাইয়া নেও।

১৫১। কাজ দিয়া জীবনের দীর্ঘতা; অল্পজীবনে যে যত বেশী কাজ করে সেই দীর্ঘ-জীবী; যেমন শঙ্করাচার্য্য।

১৫২। পশুজীবন লাভকরতঃ বেশী দিন বাচিয়া থাকা অপেক্ষা—কর্ম্মময় ক্ষণস্থায়ী জীবন ধন্য।

১৫৩। যদি বড় হইতে চাও ত আগে ছোট হও।

১৫৪। গুরুকে স্ত্রী কি পুরুষ ভাবিও না—গুরু যে কি, উপলব্ধি করিতে না পারিলে তাহা ভাবায় বুঝান যায় না; যিনি বুঝিয়াছেন তিনিই জানেন যে গুরু কি ধন।

১৫৫। না বুঝিয়া সাধু মহাপুরুষের অনুকরণ করিও না, আগে বুঝিতে চেষ্টা কর পরে যা খুসী তা করিও।

১৫৬। যদি ত্যাগই করিতে হয়—যদি নাশই পাইবে, তবে সৎকাজে ত্যাগই শ্রেয়; তাই "সন্নিমিত্তে বরং ত্যাগো বিনাশে নিয়তি সতি।"

১৫৭। আপন হাতে বিচারের ভার নিলে আর বিচারকের প্রয়োজন কি? যদি নিজেই সব করিলে তবে আবার ভগবানে ভরসা কেন?

১৫৮। ঈশ্বর পবিত্র ও সর্ব্বসুখদাতা, মানব অনেক সময়ে পথ প্রদর্শক, এজন্য সাধনরাজ্যে মানব অতি অমূল্য সঙ্গী।

১৫৯। জগতে যাহারা মহাজন, তাহাদের সম্পর্কান্বিত ব্যক্তিগণের ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। তাঁহারা জগৎকে সেবার জন্য আত্মবলিদান করেন। সেই বলি দ্বারা প্রথমে তাঁহাদের আপন হৃৎপিণ্ড উৎপাটিত হয়, পরে তাঁহাদের সম্পর্কিত নর নারীর দুঃখ সংঘটিত হয়।

১৬০। সাধন ভজনে ব্যস্ত হইয়া জগৎকে উপেক্ষা ধর্ম্ম নহে, কিন্তু দয়াময়ের ভালবাসার আদর্শে যদি জগৎকে—জীবকে ভালবাসা যায় তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম। সংসার ত্যাগে ধর্ম্ম নহে, আত্ম-ত্যাগেই ধর্ম্ম।

(ক্রমশঃ)

———:0:———

আর্য্য-জাতি।

(আবার-সেই)

জগৎকারণ জগদীশ্বরের সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান। তিমির সহচরী বিভাবরীর অবসানে, আলোকাধার আনন্দদায়ক ভানুর আবির্ভাব। শুক্ল পক্ষান্তে কৃষ্ণপক্ষ; কৃষ্ণ পক্ষান্তে শুক্লপক্ষ; আবার কৃষ্ণপক্ষ। এইরূপ কালস্রোতে সকলের আবির্ভাব ও তিরোধান, সুতরাং নিত্য পরিবর্ত্তনশীল। জাতি ধর্ম্ম, সমাজ, রীতি, নীতি, প্রবৃত্তি, নাম, ধাম প্রভৃতি সকলেরই পরিবর্ত্তন আছে। প্রাচীন ইন্দ্রপ্রস্থ অধুনা দিল্লী নামে অভিহিত; পাটলিপুত্র—পাটনা, কুরুক্ষেত্র—কর্ণাল, পাঞ্চাল—রোহিলখণ্ড নামে বিখ্যাত। সুতরাং সমালোচনার চক্ষে দেখিতে গেলে—নাম যে লোকপতিত,—লোকানুমোদিত ও লোকের ইচ্ছাবশতঃ পরিবর্ত্তিত হয়, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বোধহয় সকলেই একবাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন যে, অতি প্রাচীনকালে বেদ-ভেদ ও জাতিভেদ-প্রথা ছিল না, সকলেরই এক জাতি এক বেদ এক ধর্ম্ম ছিল। কাল ধর্ম্মে রুচিভেদ জন্মিল,

এক জাতি বহু জাতি হইল, এক সনাতন আর্য্যধর্ম্ম বহু ধর্ম্মে পরিণত হইল। লোকের রুচি সব সময়ে সমান থাকে না। আজ যাহা সুন্দর বলিয়া মনে হয়, কাল তাহা কুৎসিতে পরিণত, আজ যাহা খাদ্য, কাল তাহা অখাদ্য; আজ যাহা ব্যবহার্য্য, কাল তাহা অব্যবহার্য্য বলিয়া পরিত্যক্ত।

ধন্য রুচি! তোমার কি মহীয়সী শক্তি! যে জাতিভেদ-প্রথা একদিন লোকে সাদরে গ্রহণ করিয়াছে, আজ সে জাতিভেদ প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার জন্য কত শতসহস্র লোক একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিতেছে তাহার ইয়ত্তা নাই। অনেকেই চেষ্টা করিতেছে, অনেকে অনেক পথ অবলম্বন করিতেছে বটে, কিন্তু কোন পথ অবলম্বন করিলে যে বিভিন্ন জাতি-সমূহ একীভাবাপন্ন হইতে পারিবে এপর্য্যন্ত তাহা কেহই নির্ণয় করিতে সক্ষম হয়েন নাই। এবার আশাকরি পথ নির্ণয় হইবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কতদূর অগ্রসর হওয়া যায় তাহা ভবিষ্যতার ক্রোড়ে নিহিত। যে মহাপুরুষ জাতিভেদ প্রথা প্রণয়ন করিয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য সৎ ছিল। বিশেষতঃ তিনি লোকের আচারব্যবহার, ক্রিয়াকলাপ, রীতি-নীতি, কার্য্যতঃ নিরীক্ষণ করিয়া জাতিভেদ প্রথা প্রণয়ন করিয়াছেন। যাঁহারা সত্বগুণা-ধিক্যবশতঃ কেবল ধর্ম্মকর্ম্মপুরঃসর বেদপাঠ ও উপাসনাদি কার্য্যে রত থাকিয়া পরহিতব্রতে সতত ব্রতী থাকিতেন—যাঁহারা মানসিক বলে বলীয়ান্ ছিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ আখ্যা প্রাপ্ত হয়েন। আর যাঁহারা শারীরিক বলে বলীয়ান ছিলেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয়; ব্যবসায়ে পটু বৈশ্য, সেবায় দক্ষ শূদ্র; এই চারি বর্ণের সৃষ্টি হয়। আবার কিছুদিন পরে বর্ণশঙ্কর নামে এক জাতির সৃষ্টি হয়। তাহার মধ্যেও ধোপা, নাপিত প্রভৃতি নানা জাতি। ইহা-রাও কার্য্যতঃ ভিন্ন ভিন্ন নামে বিখ্যাত। শূদ্র মধ্যে আবার যাহারা শিক্ষায় কতক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, তাহারা বৈদ্য ও কায়েস্থ নামে পরিচিত। ইহারাও কার্য্যানুসারে খ্যাত, যাহারা চিকিৎসাবিদ্যায় পরিদর্শিতা লাভ করিয়াছিল—তাহারা বৈদ্য; যাহারা রাজ-কার্য্যে লেখাপড়ায় দক্ষতা লাভ করিয়াছিল—তাহারা কায়েস্থ। এসম্বন্ধে নানা জনের নানা মত আছে; সে সকল মতের বিচার করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের বর্ণনাস্থল নয়। অতএব সে সকল মতের সমালোচনা না করিয়া কেবল হিন্দু দিগের মধ্যে যে নানা জাতি আছে তাহা প্রদর্শিত হইল এবং সকল জাতি যে কার্য্যানু-সারে খ্যাত তাহা জানান গেল। অনেকে সমাজ-সংস্কার-মানসে ইহা বলিয়া থাকেন যে পুনরায় কার্য্যতঃ চতুর্ব্বর্ণের সৃষ্টি হউক।

প্রস্তাবটী সুন্দরই বটে, কিন্তু ক্রিয়াকাণ্ড-বিহীন ব্রাহ্মণাদি বর্ণগণ কিছুতেই স্ব স্ব কার্য্যে সংসারক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে পারিবেন না। কার্য্যতঃ জাতির সৃষ্টি না হইয়া নামে মাত্র জাতির সৃষ্টি হইলে প্রকৃতপক্ষে সমাজের উন্নতি নাই। যদি আমরা কার্য্যতঃ ব্রাহ্মণ হইতে না পারি—যদি আমরা কার্য্যতঃ ক্ষত্রিয় হইতে না পারি—যদি আমরা কার্য্যতঃ বৈশ্য এবং শূদ্র হইতে না পারি তাহাহইলে ব্যাধিস্বরূপ উপাধিতে কাজ কি? আজ কাল দেখা যায় সকলেই সকল কার্য্য করিতেছে, কাহারও কার্য্যের সীমা নাই—আচার ব্যবহারের সীমা নাই,—গমনাগমনের সীমা নাই,—যার যাহা

ইচ্ছা তাহাই করিতেছে। আমরা যতই না কেন নামে মাত্র ব্রহ্মচারী হই, যতই না কেন নামে মাত্র ক্ষত্রিয় হই; যতই না কেন নামে মাত্র বৈশ্য হই, কিছুতেই এই প্রবল স্রোতের পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভবপর নয়। তত্রাচ এভাবে থাকিলে উন্নতির আশাও সুদূরপরাহত। অতএব যদি আমরা উন্নতি চাই—যদি আমরা সমাজের মঙ্গল আশা করি—যদি আমরা মৃতপ্রায় আর্য্যসমাজের পুনরুদ্ধারের কামনা করি—তাহা হইলে আদৌ আমাদিগকে সমাজ হইতে—ভারত হইতে—জগৎ হইতে জাতি-ভেদের মূল ব্রাহ্মণাদি নামগুলি উন্মূলিত করিতে হইবে। সমাজে সম্প্রতি নানা গোল উপস্থিত। ব্রাহ্মণগণ গুণের সম্মান না চাহিয়া বংশের—কুলের সম্মান চাহিতেছেন, আবার কায়স্থগণ নামে মাত্র ক্ষত্রিয় হইয়া ব্রাহ্মণবৎ কলঙ্কের বোঝা মাথায় নিতে চাহিতেছেন, কোন কোন জাতি বৈশ্য হইতে ইচ্ছা করিতেছেন, এই-রূপ ভাবে সমাজে নানা উপদ্রব উপস্থিত। অতএব সমস্ত হিন্দুগণ আধুনিক হিন্দু নামের পরিবর্ত্তে পুনরায় পূর্ব্ববৎ আর্য্য নামে অভি-হিত হউক; সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম সকলের ধর্ম্ম থাকুক, সকলে আর্য্য নামে পরিচিত হউক; ব্রাহ্মণাদি নাম জগৎ হইতে বিলুপ্ত হউক; তৎপরিবর্ত্তে এক সুবিশাল জাতির পুনরভ্যুত্থান হউক।

আর্য্যজাতির ধর্ম্ম সম্বন্ধে অনাবশ্যক বিবেচনায় আমি তৎসম্বন্ধে কোন সমালোচনা করিতে চাহি না। যদি কোন দিন আমার প্রস্তাব কার্য্যকরী হয়,—যদি কোন দিন সমস্ত হিন্দুজাতি আর্য্য নামে অভিহিত হয়—সেই দিন—সেই আমাদের জাতীয় উন্নতির দিন—সেই সুখের দিন ধর্ম্মের সমালোচনা করা যাইবে; সেই গুরুতর সমস্যার সমালো-চনায়—ভারতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী ও শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মত নেওয়া হইবে। এখন আচার ব্যবহার ও সম্বন্ধাদি নির্ণীত হওয়া বিধেয় বিবেচনায় যাহাতে সমাজের বিশেষ আলোচনার চক্ষে না পড়ে সেইরূপ ভাবে আর্য্যজাতির সম্বন্ধাদি গঠিত করা হইল। ক্রমান্বয় ভিন্ন কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। এখন ব্রাহ্মণকে চণ্ডালান্ন ভোজন করিতে বলিলে তাহা শারদীয় মেঘাড়ম্বরের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। বিশেষতঃ সমাজে একটা হুলস্থুল উপস্থিত হইবে,—হিতে বিপরীত হইয়া দাড়াইবে।' অতএব আর্য্যজাতিকে সম্প্রতি কিছু দিনের জন্য ১ম, ২য়, ও ৩য় পর্য্যায়ভেদে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইল।

১ম শ্রেণীতে সমস্ত ব্রাহ্মণ অর্থাৎ রাঢ়ীয়, বারেন্দ্র, বৈদিক ও নিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ ১ম শ্রেণীর আর্য্য মধ্যে পরিগণিত হইল। ২য় শ্রেণীতে সমস্ত জলাচরণীয় জাতি; অর্থাৎ বৈদ্য, কায়েস্থ, শূদ্র, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, গোয়ালা ও বারুই প্রভৃতি জাতি সমূহ ২য় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইল। ধোপা, যুগী, সাহা প্রভৃতি অন্যান্য জাতির, ৩য় শ্রেণীর অন্তর্গতঃ, স্থান নির্দ্দেশ করা হইল। স্ব স্ব শ্রেণীতে সকলের বিবাহাদি সম্বন্ধ হইবে এবং স্ব-শ্রেণীস্থ সকলের হাতে সকলে খাইতে পারিবে ইহাতে সমাজ বাধা দিতে পারিবে না। প্রবৃত্তি অনুসারে সকল শ্রেণীর বাটীতে সকলে খাইতে পারিবে। কিন্তু ৩য় শ্রেণীর স্পৃষ্ট পানীয় বা আহার্য্য অন্য শ্রেণীর আর্য্যগণ পান ভোজন করিবে না। যাহারা কার্য্যতঃ ধার্ম্মিক

হইবেন, তাঁহারা স্ব স্ব শ্রেণীতে ধর্ম্মকর্ম্ম ক্রিয়াকাণ্ড করিতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর আর্য্যগণের মধ্যে যাঁহারা কার্য্যতঃ ধার্ম্মিক হইবেন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণীতেও ক্রিয়াকাণ্ড করিতে পারিবেন। যে কোন শ্রেণীর আর্য্যদিগের মধ্যে যাঁহারা সংসারত্যাগী হইয়া অর্থাৎ বিবাহাদি বন্ধনে সংসারে আবদ্ধ না হইয়া কেবল ক্রিয়াকাণ্ড ও উপা[illegible]দি ধর্ম্মক[illegible] সতত রত থাকিয়া পরহিত[illegible] জীবন সার্থক করিবেন, তাঁহা[illegible] শ্রেণীর ক্রিয়াকাণ্ড করিতে পারিবে[illegible] স[illegible]লে সকল ব্যবসা করিতে পারিবে, এমন কি প্রথম শ্রেণীর আর্য্যমধ্যে যদি কেহ ধোপার কার্য্যও করে, তাহা হইলে সমাজ তাহাতে বাধা দিতে পারিবে না। আর্য্যদিগের বাহিক লক্ষণ সকলের একরূপ থাকিবে। ব্রাহ্মণাদি জাতীয় উপাধি উচ্ছেদ করাই উক্ত প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য, কারণ উপাধি ধ্বংস হইলে স্বভাবতঃ সৎ প্রকাশ পায়।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ কাব্যরত্ন।
হেড্‌পণ্ডিত।
আড়াইহাজার হাইস্কুল।

—:0:—

তুমি যে আমার।

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
তোমা বিনা এ জগতে কেবা আপনার॥
স্নেহরূপী মাতাপিতা, প্রেমময় ভগ্নীভ্রাতা,
দিয়ে পুত্র পরিজন, আত্মীয় বান্ধবগণ,
তুমিই বুঝায়ে দেছ তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
দশদিকে দেখি আমি প্রমাণ তাহার॥
সুন্দর নীলিমাকাশ, রবি শশী পরকাশ,
অগণন গ্রহ তারা, শস্যপূর্ণা বসুন্ধরা,
রচিয়ে জানায়ে দেছ তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
রেখেছ করিয়ে বিশ্ব সুখের আগার॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি, তোমার মহিমা দেখি,
গিরি নদী বনস্থল, ফুল ফল তরুদল,
বলিয়া দিতেছে মোরে তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
ক্ষুদ্র অণু পরমাণু দেছে সাক্ষ্য তার॥
শারদা চন্দ্রমা নিশি উজলিয়া দশদিশি,
কাননে কুসুম ফুটে, মলয় পবন ছুটে,
নীরব ভাষায় বলে তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
ভাষায় বুঝাতে মোর নাহি অধিকার॥
মেঘেতে বিজলী হেসে, বিহগ কূজন ভাষে,
হিমালয় উচ্চশিরে ধবল চূড়াটী পরে,
ইঙ্গিতে জানায়ে দেছে তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
তোমার সমান দাতা কেবা ভবে আর॥
অনিত্য বিভব দিয়ে পুরেণা (ই) তোমার হিয়ে,
নিত্য ধন করে দান, করিয়াছ ভাগ্যবান্,
জীবনে মরণে নাথ তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
তোমার তুলনা দিতে কেহ নাহি আর॥
মায়া মোহে যদি ভুলে, যাই গো বিপথে চলে,
বিবেক বাশরী তানে, লও গো সুপথে টেনে,
সম্পদে বিপদে নাথ তুমি যে আমার॥

তুমি যে আমার নাথ তুমি যে আমার।
তব সম আপনার কে আছে আমার॥
ঘুচাতে আমার ক্লেশ, ধরিয়ে গুরুর বেশ,
আমাকে আপন বলে, হৃদয়ে নিয়েছে তুলে,
অমূল্য রতন নাথ তুমি যে আমার॥

———:0:———

বিশেষ-দ্রষ্টব্য।

বঙ্গাব্দ ১৩১৯ সালটী অপ্রতিহত কাল-প্রবাহে ভাসিয়া চলিল। সর্ব্বগ্রাসী কাল জীবের একবর্ষ আয়ু গ্রাস করিলেন। কালের অনুশাসনেই আমাদের "আর্য্য-দর্পণ" ১৩২০ সালের বৈশাখ মাসে ৬ষ্ট বর্ষে পদার্পণ করিয়া গ্রাহকবর্গের সমীপে সমুপস্থিত হইবে। এইখানিই ৫ম বর্ষের শেষ সংখ্যা। আজি গ্রাহকগণের ৫ম বর্ষের অগ্রিম দেয় মূল্য পরিশোধ হইল। আমাদের সহৃদয় পুরাতন গ্রাহকবর্গ—যাঁহারা ৩য় বর্ষে টাকা দিয়া বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিলেন,—পত্রিকার পুনঃপ্রচারের আশা নাই ভাবিয়া দুঃখ প্রকাশ-পূর্ব্বক পত্র দ্বারা সহানুভূতি দেখাইয়াছিলেন,—যে দুই চারি জন গ্রাহক দেয় মূল্য সম্বন্ধেও বিশ্বাস হারাইয়াছিলেন; আজি আমরা তাঁহাদিগের ঋণমুক্ত হইতে পারিয়া আনন্দ

অনুভব করিতেছি। আরও সুখের বিষয় এই যে, বিগত কয় বর্ষ অপেক্ষা এই বৎসরে আমরা অধিক সুশৃঙ্খলার সহিত পত্রিকা-পরিচালনে সক্ষম হইয়াছি। মাসের প্রথম সপ্তাহেই প্রতি সংখ্যা গ্রাহকগণের সমীপে প্রেরণ করিতে পারিয়াছি। জগদ্গুরু জগদীশ্বরের কৃপায় আগামীবর্ষেও আমরা যথারীতি পত্রিকার কার্য্যে ব্রতী হইয়া সনাতন ধর্ম্মসেবায় নিযুক্ত থাকিব।

মানুষ যায় নাম থাকে, নদী যায় খাত থাকে, ক্ষত ভাল হয় দাগ থাকে, সবই যাইবে কেবল ঘোষণা থাকিবে। তবে আমরা কোপীন-মাত্রেকসম্বল ভিখারী হইয়া কোন্ স্বার্থে গ্রাহকবর্গের ক্ষতির কারণ হইব? সুখের বিষয় আমাদের অধিকাংশ গ্রাহকবর্গের আমাদের উপর সে বিশ্বাস আছে; তাঁহারা আর্য্য-দর্পণকে সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিয়া স্বধর্ম্মে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। তাই আমরা যথেষ্ট বিড়ম্বনা ও ক্ষতিস্বীকার করিয়াও "আর্য্য-দর্পণ" প্রচার করিতেছি। দেশের লোক মাসিকপত্রিকাগুলিকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন না। তাহার কারণ, এই শ্রেণীর পত্রিকাগুলির অত্যধিক আবির্ভাব,—আবার শৈশবেই তিরোধান। আমাদের পত্রিকাখানি সেই শ্রেণীভুক্ত হইয়া দেশবাসীর অবিশ্বাস ও অশ্রদ্ধার মাত্রা বর্দ্ধিত না করে, এই কারণে আর্থিক লাভের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকিলেও দেশের মঙ্গলার্থ ইহার প্রচার বন্ধ করিতে পারিতেছি না। বিশেষতঃ শিক্ষিত ও সজ্জন গ্রাহকবর্গ "আর্য্য-দর্পণ" যাহাতে বন্ধ না হয়, তজ্জন্য সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র তাঁহাদের উৎসাহে প্রোৎসাহিত হইয়া আমরা ৬ষ্ঠ বর্ষের "আর্য্য-দর্পণ" প্রচার করিতে সংকল্প করিলাম। অতএব গ্রাহকগণ ৬ষ্ঠ বর্ষের অগ্রিম মূল্য দুই টাকা চৈত্রমাসের মধ্যে প্রেরণ করিবেন।

আমরা নূতন বর্ষের জন্য যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়াছি, তাহা নিশ্চয়ই গ্রাহকবর্গের চিত্তাকর্ষণ করিবে। নূতন বৎসরে "পাগলের দর্শন" শীর্ষক প্রবন্ধে গভীর গবেষণাপূর্ণ দার্শনিকতত্ত্ব বাহির হইবে। নানাবিধ যোগশাস্ত্র ও সাধু মহাত্মা হইতে বিনাঔষধে কেবল সামান্য সামান্য যোগপ্রক্রিয়া দ্বারা দুরারোগ্য রোগ আরোগ্যের যে সকল কৌশল সংগৃহীত হইয়াছে, ৬ষ্ঠ বর্ষে তাহা ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। "প্রেমের-সাধনা" শীর্ষক বৃহৎ প্রবন্ধে ক্রমশঃ প্রেমতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা হইবে। গ্রাহকগণ যেমন একদিকে সাধুভক্তের অমৃতময়ী লেখনীর মধুরাস্বাদে তৃপ্ত হইবেন; তেমনি তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থে অন্যদিকে দরিদ্র-নারায়ণসেবার পুণ্য সঞ্চয় করিবেন। আমাদিগের উভয়দিকেই সেবাব্রতের সার্থকতা হইবে। গ্রাহকগণের যেন স্মরণ থাকে তাঁহাদিগের অনুগ্রহের উপরেই আর্য্য-দর্পণের উন্নতি ও স্থায়িত্ব নির্ভর করিতেছে। সুতরাং তাঁহারা যথাসাধ্য বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে ইহার প্রচার এবং গ্রাহক সংগ্রহ করিয়া দিয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিবেন। আশাকরি কোন গ্রাহকই আমাদিগের এই অনুরোধ উপেক্ষা করিবেন না। পরিশেষে আমাদিগের—

নিবেদন

এই যে, এই শেষ সংখ্যার সহিত আমরা ৫বর্ষের "সূচী" গ্রাহকগণকে দিতে পারিলাম না। অতএব গ্রাহকবর্গ এই সংখ্যা প্রাপ্তিমাত্রেই ৫ম বর্ষের আর্য্য-দর্পণ না বাঁধাইয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক একমাস অপেক্ষা করিবেন; আগামী বৈশাখ সংখ্যার সহিত সূচী প্রেরিত হইবে। এই সংখ্যা প্রাপ্তি-মাত্রেই গ্রাহকগণ ৬ষ্ঠ বর্ষ আর্য্য-দর্পণের অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ দুইটাকা অত্র কার্য্যালয়ে কার্য্যাধ্যক্ষের নামে প্রেরণ করিবেন। চৈত্রমাসের মধ্যে যাঁহাদিগের অগ্রিম মূল্য না পাইব, বৈশাখের প্রথম সপ্তাহে তাঁহাদিগের নিকট নূতন বৎসরের ১ম সংখ্যা ভিঃ পিঃতে প্রেরণ করিব। যাঁহাদিগের ভিঃ পিঃ গ্রহণ করিতে কোন প্রকার আপত্য আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়া চৈত্র মাসের

মধ্যে একখানি কার্ড লিখিয়া জানাইবেন; নতুবা ভিঃ পিঃ ফেরত দিয়া দরিদ্র পত্রিকাকে অকারণ ক্ষতিগ্রস্থ করিবেন না। আশাকরি কোন গ্রাহকই এই সামান্য অনুরোধ রক্ষা করিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। যেন গ্রাহক-মাত্রেরই স্মরণ থাকে, এই পত্রিকা কাহারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে—ইহার সমস্ত আয় দরিদ্র ও অনাথ-নারায়ণগণের সেবায় ব্যয়িত হয়। কিমধিক বিস্তারেণ—

প্রকাশক—"আর্য্য-দর্পণ"

পোঃ কোকিলামুখ।

(যোরহাট।)

—:0:—

সংবাদ ও মন্তব্য।

সুখ-সংবাদ। সর্ব্বজনপ্রিয় আমাদের মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ভগবানেচ্ছায় আরোগ্য লাভ করিয়া নূতন রাজধানী দিল্লী আগমন করিয়াছেন। গত ১৫ই ফাল্গুণ বৃহস্পতিবার তজ্জন্য অত্র শান্তি-আশ্রমে পূজা, পাঠ ও কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। আমরা ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করি, তিনি অচিরে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া শান্তি ও স্বাস্থ্য-পূর্ণ জীবনে ভারতসাম্রাজ্য পরিচালনা করুন।

প্রচার-সংবাদ। আশ্রমাধিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দ সরস্বতীদেব ঢাকা, ময়মনসিংহ, ও উত্তরবঙ্গ পরিভ্রমনকরতঃ গত ১২ই ফাল্গুণ আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত তিনি এই আশ্রমেই অবস্থিতি করিবেন।

বিগত ৯ই পৌষ দুইজন সেবক সহ শ্রীমৎ পরমহংসদেব আশ্রম পরিত্যাগকরতঃ আসামবেঙ্গল রেলপথে বদরপুর ও চাঁদপুর হইয়া ঢাকা উপস্থিত হন। তথায় দশ পনর দিন অবস্থিতির কথা ছিল; কিন্তু ভক্তবর্গের আগ্রহাতিশয্যে ও কাতর প্রার্থনায় প্রায় মাসাধিক কাল ঢাকায় কাটিয়া যায়। এই সময়ে নারায়ণগঞ্জ, বারদী, রঘুনাথপুর প্রভৃতি স্থানেও তাঁহাকে যাইতে হইয়াছিল।

২০শে মাঘ রাত্রে ঢাকা হইতে ময়মনসিংহের ডাকগাড়ীতে রওনা হইয়া প্রাতে জামালপুর ষ্টেশনে অবতরণ করতঃ ঘোড়ার গাড়ীতে সাহাবাজপুর উপনীত হন। তথাকার জমিদারী কাছারিতে আসন নির্দ্দিষ্ট হয়। ইহার তিন চারি দিন পূর্ব্বে এই গ্রামের প্রায় পঞ্চাশ জন ভদ্রলোক হরিসংকীর্ত্তন করিতে করিতে ষ্টেশনের দিকে প্রায় তিন মাইল গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন নানা কারণে ঢাকা ত্যাগ করিতে পারেন নাই। ২৩শে মাঘ কাছারি হইতে ৮সংকীর্ত্তন করিতে করিতে প্রায় শতাধিক লোক সহ আমরা উকীল শ্রীযুক্ত হরেন্দ্রপ্রসাদ দাস মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হই। গমনকালে স্থানীয় যুবকবৃন্দ পরমহংসদেবের গাড়ী প্রায় এক মাইল সাগ্রহে টানিয়া লইয়া গিয়াছিল। ঐ দিন তথায় একটী হরিসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। পরমহংসদেব স্বয়ং তাহার উদ্বোধন করিয়া "ভক্তি" সম্বন্ধে একটী বক্তৃতা করেন এবং যুবকবৃন্দকে দরিদ্র-নারায়ণ সেবার উপকারিতা বুঝাইয়া দেন।

[illegible] শাহাবাজপুর অবস্থিতি করতঃ নান্দিনা ষ্টেশন [illegible] সন্ধ্যার গাড়ীতে রওনা হইয়া জগন্নাথগঞ্জ, ফুলছড়ি, বোনারপাড়া ও পার্ব্বতীপুর হইয়া ২১শে ফাল্গুণ সরস্বতীপূজার দিন-সন্ধ্যাকালে দিনাজপুর উপনীত হন। দিনাজপুরের অন্যতম প্রসিদ্ধ উকিল শ্রীযুক্ত মধুসূদন রায় মহাশয়ের গাড়ী ষ্টেশনে অপেক্ষা করিতেছিল; পরমহংসদেব তাহাতে আরোহনকরতঃ কালীতলা তাঁহার বাটীতে গমন করেন। দিনাজপুরবাসিগণের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকে তথায় সাত দিন অবস্থিতি করিতে হইয়াছিল। প্রত্যহ সন্ধ্যা ও প্রাতে বহুতর ভদ্রলোক সমবেত হইয়া পরমহংসদেবের সহিত নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিতেন,—সংকীর্ত্তন করিতেন। শেষ দিন স্থানীয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভুবনমোহন কর মহাশয়ের সেবাব্রত দেখিতে তদীয় দাতব্য ঔষধালয়ে গমন করেন। আমরা সেই অশীতিপর বৃদ্ধের আড়ম্বরশূন্য সেবাকার্য্য দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি। এমন পরার্থপ্রেমিক নরদেবতা আমরা অল্পই দেখিয়াছি। সে দৃশ্য দেখিলে চক্ষু সার্থক হইবে—হৃদয় পবিত্র হইবে—প্রাণাধারে ভক্তির উৎস উৎসারিত হইবে। আমরা প্রবন্ধান্তরে তাঁহার বিষয় সমাক আলোচনা করিব।

৫ই ফাল্গুণ-আমরা দশটার গাড়ীতে রওনা হইয়া বেলা বারটার সময় রায়গঞ্জ উপনীত হই। স্থানীয় প্রধান উকিল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার রায় মহাশয়ের বাসায় পরমহংসদেবের আসন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। স্থানীয় শিক্ষিত ভদ্রলোকগণ তাঁহাকে লইয়া তিন দিন মহানন্দে কাটাইয়াছেন। আমরা তিন দিন তথায় অবস্থিতি করিয়া ৮ই ফাল্গুণ তথা হইতে রওনা হই। দিনাজপুর ষ্টেশনে গাড়ী আসিলে স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ভদ্রলোক আর এক দিন দিনাজপুর অপেক্ষা করিয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। কিন্তু সময়াভাবে সে অনুরোধ রক্ষিত হইল না। ইতিপূর্ব্বে বালুরঘাট, আলিপুরদুয়ার ও কাটিহার হইতে লোক আসিয়া তথায় লইয়া যাইবার প্রার্থনা করিয়াছিলেন, সে অনুরোধও রক্ষা করিতে পারেন নাই। সময়ান্তরে আসিবেন বলিয়া সকলকে বিদায় করেন। যাহাহউক ঐ দিন সন্ধ্যাকালে তিস্তা ষ্টেশনে নামিয়া একদিন বিশ্রামকরতঃ ১০ই প্রাতের ট্রেনে রওনা হইয়া সন্ধ্যাকালে গৌহাটি এবং প্রাতে লামডিং উপনীত হন, দিনটা তথায় বিশ্রামকরতঃ সন্ধ্যার পর গাড়ীতে উঠিয়া পরদিন যথাকালে আশ্রমে পৌঁছিয়াছেন।

শ্রীমৎ পরমহংসদেব আশ্রম পরিত্যাগের কিছুপর অত্র শ্রীগৌরাঙ্গ-অনাথনিকেতনের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট শ্রীমৎস্বামী বোধানন্দ সরস্বতী মহারাজ—তাঁহার সহিত মিলিত হইয়া গমন করেন। সাহাবাজপুর কাছারীর কর্ম্মচারিগণ, দিনাজপুর ও রায়গঞ্জবাসিগণ অনাথ সেবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছেন, এজন্য আমরা কৃতজ্ঞতাপূর্ণহৃদয়ে তাঁহাদিগকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। দিনাজপুর ও রায়গঞ্জের মধুবাবু ও অক্ষয়বাবু এসম্বন্ধে বিশেষ ধন্যবাদার্হ। তাঁহাদিগের ন্যায় বিশ্বাস-ভক্তিপরায়ণ শিক্ষিত ধার্ম্মিকব্যক্তিকে আমরা মুখের ভাষায় আর কি কৃতজ্ঞতা জানাইব। বিশেষতঃ তাঁহারা আমাদিগের ন্যায় তুচ্ছ জীবের প্রশংসার কাঙ্গাল নহেন। তাঁহাদিগের বাটীতে আমরা আপন বাটীর ন্যায় অসঙ্কোচে বাস করিয়া আসিয়াছি। প্রার্থনা করি, তাঁহারা শান্তি ও আনন্দের অধিকারী হইয়া দিন দিন আধ্যাত্মিক—উন্নতির উচ্চ সোপানে অধিরোহন করুন।

———:0:———

শ্রীযুত অশ্বিনীকুমার সেন	১৲	শ্রীযুক্ত বেণীমাধব	৫৲
,, দ্বারকানাথ চৌধুরী	॥০	,, ব্রজেন্দ্রকুমার সেন	১৲
,, ভরতচন্দ্র সিংহ	॥০	শিখা সমিত	৩৲
,, রমেশচন্দ্র দত্ত	॥০	জনৈক সেবক	৫৲

(ক্রমশঃ।)

বিজ্ঞাপন।

পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎস্বামী নিগমানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

১। প্রেমিক-গুরু বা প্রেমভক্তি ও সাধন পদ্ধতি।

গ্রন্থকারের হাপটোন [illegible]সহ মূল্য ১৸০ একটাকা বারআনা মাত্র।

২। যোগী-গুরু (২য় সংস্করণ) মূল্য ১॥০ দেড়টাকা।

৩। জ্ঞানী-গুরু (দ্বিতীয় বার মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ হইয়াছে) মূল্য ২।০ সোয়া দুইটাকা।

৪। ব্রহ্মচর্য্য-সাধন মূল্য ।০ আটআনা।

৫। তান্ত্রিক-গুরু মূল্য ১৸০ একটাকা বারআনা।

এই পুস্তক গুলি ২০১ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা শ্রীযুক্ত গুরুদাস চট্টোপাধ্যায়ের দোকানে, [illegible] নবাবপুর, ঢাকা—আশ্রম-সেবক, ডাক্তার শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র রায়ের নিকটে, [illegible] লাইব্রেরীতে এবং নিম্নলিখিত ঠিকানায় আমার নিকট পাওয়া যাইবে। [illegible] নিম্নের ঠিকানায় অনুসন্ধান করিবেন।

অ[illegible] আশ্রমা[illegible] শ্রীমৎ পরমহংসদেবের হাপটোন ফটো এবং আর্য্য-দর্পণের পুরাতন সংখ্যা গুলিও এখানে পাওয়া যাইবে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সহ ২৲ দুইটাকা প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য [illegible] আনা। শ্রীকুমার চিদানন্দ কার্য্যাধ্যক্ষ, "আর্য্য-দর্পণ"। পোঃ কোকিলামুখ শান্তি-আশ্রম (যোরহাট।)

উপদেশ-সংগ্রহ

বা

মহাজন বাক্য।

ইহাতে সাধু মহাপুরুষদিগের ধর্ম্ম, নীতি, জ্ঞান ও ভক্তি বিষয়ক উপদেশাবলী সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুস্তকখানা অতি উপাদেয় ও সময়োপযোগী হইয়াছে, কেননা বর্ত্তমান সময়ে দেশে ধর্ম্মের স্রোত ফিরিতে আরম্ভ হইয়াছে; ইহা দ্বারা ধর্ম্মপিপাসুগণ বিশেষ উপকার পাইবেন, মূল্য ৵০ দুই আনা। চিঠি লিখিলে বা দশ পয়সার টিকিট পাঠাইলে ডাকে পাঠান যায়। আর্য্য-দর্পণ কার্য্যালয়ে প্রাপ্তব্য। ভিঃ পিঃ পার্শ্বেলে ।০ আনা; অন্য পুস্তকের সঙ্গে লইলে দুই আনায় পাইবেন।